আসা-যাওয়ার মাঝখানে

নলিনীকান্ত সরকার



মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭১

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ ৭৩ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও পূর্বোদয় প্রেস, ১০ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

সোদরোপম সফল সাহিত্যিক
শ্রীমান্ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
করকমলে

নিবেদন

'আসা-যাওয়ার মাঝখানে'র প্রথম পর্ব প্রকাশিত হ'লো। এর আগে আমার তিনখানা স্মৃতিকথা-গ্রন্থ বেরিয়েছে—'হাসির অন্তরালে', 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' আর 'দাদাঠাকুর'। স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে লেখা হ'লেও দাদাঠাকুর মুখ্যত আমার স্মৃতিকথা। 'আসা-যাওয়ার মাঝখানে' লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে আমার পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের দুটি একটি ঘটনার পুনরুল্লেখ করতে হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বেও হয়তো পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির কোনো কোনো ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন হতে পারে। এজন্যে পাঠকপাঠিকাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আমাকে নানাভাবে আনুকূল্য করেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক ও সাহিত্য-তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, বঙ্গবাসী কলেজের দু'জন অধ্যাপক—ডক্টর রমেন সেনগুপ্ত ও ডক্টর সৌম্যেন গঙ্গোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-পরিদর্শক ব্রজনাথ ঘটক, পূর্ব রেলওয়ের প্রাক্তন কর্মী কমলকুমার গুপ্ত, শ্রীঅরবিন্দ লাইব্রেরির অন্যতম পরিচালক অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, নিমতিতার জমিদার-বংশোদ্ভব রাধানাথ চৌধুরী, মনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত), শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের প্রেসিডেন্ট হিমাংশুকুমার নিয়োগী এবং মিত্র ও ঘোষের কর্মী বন্ধুরা। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থে একাধিকবার আমার 'সাহিত্য-সংস্কার' রচনাটির উল্লেখ আছে। কৌতূহলী পাঠকপাঠিকাদের জন্যে সেটি গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট করা হ'লো।

গ্রন্থকার

আসা-যাওয়ার মাঝখানে

ভাই গজেন,

আমার দিনটি ঠিকই আছে। ইহলোকে এসেছিলাম ১২৯৬ সালের ১৩ই আশ্বিন; ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে। পরলোকে যাবার দিনটিও একজন দৈবজ্ঞ হিসেব করে কোষ্ঠীতে লিখে দিয়েছিলেন; পয়ষট্টি বছর বয়সে সেই মারাত্মক দিনটিকে ডিঙিয়ে কায়ক্লেশে এতদূর চলে এসেছি।

জন্মেছিলাম মাতুলালয়ে, মুর্শিদাবাদ জেলার জগতাই গ্রামে। স্থানটি বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম নিমতিতার সংলগ্ন। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ছাপ-ঘাটির মোহানা—এখানে গঙ্গা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে দুদিকে বয়ে চলেছে। পদ্মারূপে চলেছে রাজসাহী অভিমুখে আর ভাগীরথীরূপে চলেছে জঙ্গিপুরের কোল দিয়ে কলকাতার দিকে। অবশ্য এখন ফরাক্কা থেকে খাল কেটে গঙ্গার স্রোত অন্যপথে অনেকটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফরাক্কা আমাদের জগতাই গ্রাম থেকে মাইল আষ্টেক পথ।

আমার পিত্রালয় মালদহ জেলার কালিয়াচকে। সেখানে আমি মাত্র একবার গেছি আট-ন' বছর বয়সে।

আমাদের এই জগতাই-নিমতিতা অঞ্চলটি মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি-সমশের-গঞ্জ থানার অন্তর্গত। চারটি জেলার সীমান্ত এর চারদিকে। মুর্শিদাবাদ ছাড়া উত্তরে মালদহ, দক্ষিণে বীরভূম আর পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা। কোন জেলার ব্যবধানই ছ'সাত মাইলের বেশি নয়।

কোন সময়ে বাংলাদেশের বাইরে থেকেও কিছু উদ্বাস্তু হয়ত কোনও কারণে এসে পড়েছে এ অঞ্চলে। চামার, চাঁই, গাড়োলি, শুঁড়ী—এরা কেউ হয়ত বিহারের, কেউ-বা উত্তরপ্রদেশের। এদের মাতৃভাষা আমাদের গ্রাম্য বাংলা-ভাষার সঙ্গে মিশে একরূপ মিশ্রভাষায় দাঁড়িয়ে গেছে। এদের ভাষার প্রভাবও যে আমাদের স্থানীয় কথ্যভাষার উপর পড়েনি, এমন কথাও বলা যায় না। পরে স্থানীয় বাংলাভাষার দু-চারটে দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

কায়স্থপ্রধান এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। গ্রামটি ছিল বিভিন্ন পাড়ায় সুবিন্যস্ত ও বিভক্ত। গাড়োলিপাড়া, শুঁড়িপাড়া, রাজবংশীপাড়া, গোয়ালপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি। গাড়োলিরা হয়ত উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে থাকবে। চামার, চাঁই, শুঁড়িরা বোধ হয় এসেছে বিহার থেকে। ভেড়ার

লোমের কম্বল ও আসন ছিল গাড়োলিদের উপজীবিকা। ভেড়া পুষতও অনেকে। এই ভেড়ার লোম থেকে হত কম্বল-আসন। এ ছাড়া উত্তরপ্রদেশ থেকেও ভেড়ার লোম আমদানি করত তারা। ভেড়ার নাম গাড়োল বলেই এরা গাড়োলি।

এখানকার ভেড়ার লোমের কম্বল ও আসন হত উচ্চশ্রেণীর। ভেড়ার বাচ্চার লোমের কম্বল ও আসনের একটা আভিজাত্য ছিল। কালো কুচকুচে লোমের চওড়া পাড় দেওয়া কম্বল ও আসনগুলির যেমন ছিল কদর তেমনি ছিল দর। এক-একজন কারিগরের হাতের কাজের নৈপুণ্যও ছিল অসাধারণ। মনে পড়ে, কাশিমবাজারের বাগ্লেটিয়া এগ্‌জিবিসনে একজন ওস্তাদ গাড়োলি বাচ্চার লোমের একটি গায়ের কোট বুনে পাঠিয়েছিল। কোটটির বিশেষত্ব ছিল—গলা বুক পিঠ কোমর হাতা পকেট—কোনখানেই জোড়া দেওয়া হয়েছে বলে বোঝবার উপায় নেই। যেন তাঁতে কম্বলের সুতো বসিয়ে সমগ্র কোটটাই বুনে তোলা হয়েছে। কোথাও সেলাই করে জোড় মেলানোর চিহ্নমাত্র নেই।

শুঁড়িরা মৎস্যব্যবসায়ী। গঙ্গায় মাছ ধরে পাইকারদের কাছে বিক্রী করাই তাদের প্রধান উপজীবিকা। আমাদের বাড়ির এলাকার মধ্যে ২০।২৫ ঘর শুঁড়ির বসতি ছিল। এরা হিন্দু—বিহার থেকে কোন কালে এসেছিল। এই শুঁড়ি প্রজাদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়জনোচিত সম্বন্ধ ছিল। কেউ বা দাদা, কেউ বা দিদি, মামা-ভাগ্নে সম্বন্ধও ছিল কারও কারও সঙ্গে।

রাজবংশীরা নিছক কৃষিজীবী। কোন কোন পরিবারের গৃহস্থ ব্যক্তিরা গৃহসংলগ্ন জমিতে উৎপন্ন তরিতরকারি বিক্রী করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন।

মুসলমানেরা সকলেই কৃষিজীবী। এঁদের মধ্যে কয়েকজন অর্থশালী গৃহস্থও ছিলেন। নিজের জমি নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিজের লাঙল-বলদ দিয়ে চাষ করাতেন। অধিকাংশ কৃষিজীবী মুসলমানের লাঙল-বলদ থাকলেও নিজস্ব জমি ছিল না। অন্যের জমি আধাআধি ফসলের শর্তে চাষ করতেন তাঁরা। আমাদেরও কয়েকজন ভাগীদার মুসলমান চাষী ছিলেন। এঁদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়-জনের মত সম্পর্ক ছিল—অধিকাংশ চাষীই ছিলেন আমার মামু। তাঁরাও ভাগ্নে বলে সম্বোধন করতেন, কখনও নাম ধরে ডাকতেন না।

আমাদের গ্রামে সূক্ষ্ম হাতের কাজের জন্যে ছুতোর মিস্ত্রীদের বেশ খ্যাতি ছিল। মনে পড়ে একজন বৃদ্ধ মিস্ত্রীর তৈরি একটি কানখুস্কির কথা। কানের ময়লা বের করবার জন্য কাঠের একটা পুরো হাতী : চারটি পা, শুঁড়, ল্যাজ, মায় দাঁত পর্যন্ত। হাতীর ল্যাজটি ধরে শুঁড়টি কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হত।

আর সেই শুঁড়ের ডগা দিয়ে বের করতে হত কানের ময়লা। এই বুড়ো মিস্ত্রির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঐ সূক্ষ্ম কারুকার্যেরও মৃত্যু হয়েছে।

২

সাঁওতাল পরগণা তথা বিহার প্রদেশ ঘেঁষা অঞ্চল বলে আমাদের এখানকার স্থানীয় জনসাধারণের কথা ভাষাও অদ্ভুত ধরনের—অদ্ভুত উচ্চারণভঙ্গী, একটা বিশেষ সুরের টান থাকে উচ্চারণের মধ্যে। আমাদের এই গ্রাম্য ভাষায় লেখা আমার একখানা পুস্তিকা আছে—'কাঞ্চনতলার কাপ'। ছড়ার আকারে লেখা একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার বিবরণ। বাংলা ভাষায় রচনা কিন্তু কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের বাঙালীদের কাছে দুর্বোধ্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় আমাদের এ অঞ্চলের ভাষার অনেকগুলি শব্দ আছে। আমাদের অঞ্চলের উত্তুরে বাতাস তারাশঙ্করের লাভপুরের উপর দিয়ে বয়ে যায় যে।

শোন। এবারে আমাদের ভাষায় দু-চারটে কথা তোমাকে শোনাই।

তোমাদের শিঙাড়া আর আমাদের শিঙাড়া, তোমাদের নিম্‌কি আর আমাদের নিম্‌কিতে আকাশপাতাল তফাত। তোমাদের শিঙাড়া থাকে খাবারের দোকানে আর আমাদের শিঙাড়া থাকে জলের মধ্যে। তোমাদের নিম্‌কিও থাকে খাবারের দোকানে। আমরাও নিম্‌কি খাই বটে কিন্তু তোমাদের মত খালি-পেটে খাই নে, খাই ভরা-পেটে, খাবার শেষে। আমাদের শিঙাড়াকে তোমরা বল পানিফল আর আমাদের নিম্‌কি তোমাদের কাছে লেবুর আচার।

তোমরা যাকে ঢ্যাঁড়স বল, আমাদের হাটে-বাজারে তার নাম রামপটল। তোমাদের কাঁচালঙ্কা আমাদের গাছমরিচ, তোমাদের থোড় আমাদের কেঁজ্যাল, তোমাদের যজ্ঞডুমুর আমাদের থোকসা, তোমাদের গাঁদাল পাতা আমাদের গন্ধ-ভাদুলে, তোমাদের আখ আমাদের কুশোর, তোমাদের রান্নার মসলা রাঁধুনিকে আমরা বলি চন্দনী—এই রকম অনেক কথা আছে আমাদের গ্রামাঞ্চলে তোমরা শুনলে মানে বুঝতে পারবে না।

এবার এস আমাদের মাছের বাজারে। জালমাছ দেখেছ? তোমাদের বাজারের চিংড়ি আমাদের বাজারে নাম নিয়েছে জালমাছ। তোমাদের শিঙী এখানে জিওল, তোমাদের ল্যাটা আমাদের গোটকুন। তোমরা বড় বড় রুই মাছকে পোনা বল, আর যে-মাছ সদ্য ডিম থেকে বেরিয়েছে, সেই সব মাছের বাচ্চাকে আমরা বলি পোনা। আমাদের বাচা, উরোল তোমাদের বাজারে

মেলে না।

তুমি বোধ হয় আমাদের সেকালের যজ্ঞিবাড়ির কোন খবর রাখ না। আমাদের গ্রামাঞ্চলের জমিদার বাড়িতে তোমাদের শহরের বড়মানুষদের বাড়ির মতোই মহাসমারোহে পুজোপার্বণ, সামাজিক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হত। খাদ্য-বস্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে আকারে ও প্রকারে অনেক বড়।

তোমাদের লুচি আমাদের লুচির কাছে শিশু। আমাদের লুচির আকার বড় বড় পদ্মপাতার মত। তোমরা অবশ্য তাকে লুচি বলে আমলই দেবে না, বলবে ও তো পুরী। আমাদের দেশে তখন পুরী বলে কোন খাদ্যবস্তু ছিল না। আটাই ছিল না। সবই ময়দা। ময়দা ছিল দু'রকমের। সাদা ময়দা আর লাল ময়দা। লাল ময়দাকে তোমরা আর পশ্চিমারা বলো আটা। আর ঐ লাল ময়দা অর্থাৎ আটার তৈরি লুচিকে তোমরা বল পুরী। গাওয়া ঘিয়ে ভাজার সময় লুচির গন্ধে দূর থেকেই যজ্ঞিবাড়ির ঠিকানা পাওয়া যেত।

সন্দেশের কথা শুনে তোমরা হয়ত হাসবে। কেউ নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে পেট পুরে খেয়ে ফিরছেন, যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর—কি রকম খাওয়ালে?

তিনি পরম উৎসাহে বলবেন—সন্দেশই ছিল চার রকম: কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, বুঁদিয়া আর জিলাপী। আমাদের গ্রামাঞ্চলে মিষ্টান্ন মানেই সন্দেশ—পান্তুয়া, গজা, মিহিদানা, খাজা, মোণ্ডা—সবই সন্দেশ। তোমাদের হালুয়া আমাদের মোহনভোগ।

৩

তোমরা ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলার প্রতিযোগিতা দেখে থাক। পালোয়ানদের কুস্তির লড়াইও হয় তোমাদের কলকাতা শহরে। কিন্তু গরু-ভেড়ার লড়াই দেখেছ তোমরা? আমরা সেকালে আমাদের গ্রামে দেখেছি। এখন হয় কি না জানি নে।

সেকালে গাড়োলিরা লড়ুয়ে ভেড়া পুষত। সে-সব ভেড়ার চেহারাও ঐ কাল্লু-কিঙ্কর সিং মল্লবীরদের মতই। আকারে বেশ বড়, মাংসল দেহ, মাথার উপরে দুদিকে দুটো পাক দিয়ে বাঁকানো মোটা মোটা শিং—লোহার মত শক্ত। চোখ দুটিতে সব সময় যুদ্ধং দেহি ভাব। লড়াই হত এই জাতীয় এক এক জোড়া ভেড়ার মধ্যে। শুনতাম লড়ুয়ে ভেড়াকে লড়াইয়ের আগে গুটিকতক ঝাঁঝালো পেঁয়াজ খাইয়ে আনা হত আরো সতেজ করবার জন্যে। কোন চওড়া রাস্তায় বা মাঠের দুটি প্রান্তে ভেড়া নিয়ে দুই মালিক দাঁড়াতেন। মাঝে চল্লিশ-পঞ্চাশ

গজ ব্যবধান। ভেড়া দুটিকে সজোরে ধরে থাকতেন মালিকেরা। তাদের আর যেন সবুর সয় না। দুটি ভেড়ারই উত্তেজনায় চোখ ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে। একটা অর্ধস্ফুট স্বরে গজরাচ্ছে তারা। এই সমরসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে একটা সঙ্কেতধ্বনি দিয়ে মালিকেরা ভেড়া দুটিকে ছেড়ে দেওয়ামাত্র দুই প্রান্ত থেকে দুই মল্লবীর বিদ্যুৎগতিতে ছুটে ঠিক মাঝখানটিতে এসে পরস্পরকে শৃঙ্গাঘাত করলে। দর্শকরা হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা পিছিয়ে গ্রীবাভঙ্গী করে আবার পরস্পরের প্রতি শৃঙ্গাঘাত। আবার পাল্লা নেওয়া, আবার শৃঙ্গাঘাত। অন্তত দশ-পনরো মিনিট লড়াইয়ের পর একপক্ষ পরাজিত হতে বাধ্য হল। আবার এল আরেক জোড়া যোদ্ধা। এই ভেড়ার লড়াইয়ে যেমন জানোয়ারদের উত্তেজনা, তেমনি দর্শকদেরও।

গরুর লড়াইয়ের কথা তোমরা বোধ হয় শোনওনি।

গোবর্ধনযাত্রার পরদিন স্থানীয় গোয়ালাদের এটি একটি বার্ষিক উৎসব। উৎসবের নাম—পাছুরখ্যালা। তোমাদের ফুটবল খেলার মতই এটি একটি ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা। তফাত শুধু—ফুটবলের বদলে একটি শুয়োর-বাচ্চা। প্রতিযোগী এক পাল গরু। সেই গরুর পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় শুয়োর বাচ্চাটিকে। শুয়োরটিকে দেখামাত্র গরুগুলো ক্ষেপে যায়। পা দিয়ে খুঁচিয়ে, শিং দিয়ে গুঁতিয়ে শুয়োরটিকে মারবার চেষ্টা করে। গোয়ালারা অভিনিবিষ্ট হয়ে দেখেন—শুয়োরটা কখন মরে। মরবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে গিয়ে শুয়োরটিকে তুলে নেয় আর হত্যাকারী গরুটিকে ধরে ফেলে।

সেই গরুটি নাকি পয়মন্ত আর গরুর মালিক গোয়ালাটি নাকি ভাগ্যবান।

আমি যখন জন্মেছিলাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাংলার দুই মহামনীষী—সশরীরে বর্তমান। কিন্তু দুটি চন্দ্রই তখন অস্তাচলের অভিমুখে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। আর পূর্বাকাশে প্রদীপ্ত রবি চলেছেন স্বাভাবিক আহ্নিক গতিতে দিঙ্‌মণ্ডল উজ্জ্বল করে।

ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত হলেন ১৮৯১ সনের ২৯শে জুলাই, বুধবার। বাংলা হিসেবে ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, রাত্রি আড়াইটায়। আমি তখন দু'বছরের শিশু।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে কেবল নিমতলা শ্মশানক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র বাঙালী-জাতির প্রাণে চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল। অনেক শোকার্ত শ্মশানযাত্রী এই মহামানবের মহাপ্রয়াণের বিশদ বিবরণ আমাদের জন্যে রেখে গেছেন।

স্বর্গগামী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহাযাত্রার একটি অলৌকিক কাহিনী শুনিয়েছেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁর শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থে।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শিষ্যবর্গ নিয়ে ঢাকায়, তাঁর গেণ্ডারিয়া আশ্রমে। কুলদানন্দ লিখছেন:

"১৪ই শ্রাবণ, বুধবার। মধ্যাহ্নে প্রায় একটার সময়ে ঠাকুর (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিলেন এবং খুব ব্যস্ততার সহিত ঘরের পশ্চিম দিকের দরজার ভিতর দিয়া পশ্চিম-উত্তরে আকাশপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—'আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!! কি সুন্দর!!! হলুদ রংয়ের কত পতাকা উড়ছে, আহা! সমস্ত আকাশ আজ হলুদরংয়ের উজ্জল ছটায় একেবারে ঝলমল করছে। চারিদিকে কত সুন্দরী সুন্দরী দেবকন্যাগণ! দেবকন্যারা চামর নিয়ে বীজন করছেন, অপ্সরাসকল নৃত্য-গান করছেন। আহা কত আনন্দ! আজ গুণের সাগর বিদ্যাসাগরকে নিয়া আকাশ-পথে সকলে আনন্দ করতে করতে যাচ্ছেন। মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চল্লেন। হরিবোল! হরিবোল!!'

* * *কিছুক্ষণ পরেই খবর পাইলাম, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর দেহত্যাগ করিয়াছেন!"

যুক্তিবাদী জড়বিজ্ঞানীর কাছে এই অলৌকিক বিবরণ অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। কারণ, এইরূপ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একাধিক মহাত্মার সঙ্গ ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই মহাত্মাদের কথাও আমি যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করবো।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরোক্ষ পরিচয় শৈশব থেকেই। বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয়। তাঁর বোধোদয়ের আনুকূল্যে আমার বোধোদয়। ব্যাকরণ কৌমুদীর স্নিগ্ধ আলোকে আজও তিনি আমার অন্ধকার-পথে দিশারী হয়ে আছেন।

১৮৯৩ সন। আমার বয়স চার বৎসর।

এই ১৮৯৩ সন অধ্যাত্ম-ভারতের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতের তথা বিশ্বের মুক্তিসাধনার পুণ্যব্রত নিয়ে প্রতীচ্য থেকে প্রাচ্যভূমিতে এলেন শ্রীঅরবিন্দ, আর এই বৎসরেরই ১৩ই মে অধ্যাত্ম-ভারতের মর্মবাণী নিয়ে প্রাচ্যভূমি থেকে প্রতীচ্যে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই বৎসরেরই সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো ধর্মসভায় তাঁর উদাত্ত আহ্বান—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

এর পরের বৎসর—১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে পরলোকগমন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অনতিকাল পরে বোম্বাই-এর 'ইন্দুপ্রকাশ' সাপ্তাহিকে নিজের নাম গোপন রেখে **'By a Bengali'** উল্লেখ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লিখলেন শ্রীঅরবিন্দ। ১৮৯৪ সনের ১৬ই জুলাই থেকে ২৭শে অগস্ট পর্যন্ত পর পর সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল 'ইন্দুপ্রকাশে'। এই প্রবন্ধগুলি থেকে বোঝা যায় বিলেতে থাকতেই শ্রীঅরবিন্দ বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন, কামিনী সেন (রায়), স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি বহু সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের। কোন কোন ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে উচ্চে স্থান দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। কেবল বঙ্কিমচন্দ্রই নন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভার প্রতিও তিনি যোগ্য সমাদর প্রদর্শন করেছেন।

'ইন্দুপ্রকাশে' প্রকাশিত সাতটি প্রবন্ধের সর্বশেষ রচনা—**Our hope in the future**। এই প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন সম্বন্ধে বলেছেন—

Bankim and Madhusudan have given the world three noble things. They have given it Bengali literature, a literature whose princelier creations can bear comparison with the proudest classics of modern Europe. They have given it the Bengali language. The dialect of Bengal is no longer a dialect but has become the speech of Gods, a language unfading and indestructible which cannot die except with the death of the Bengali nation ; a people spirited, bold, ingenious and imaginative, high among the most intellectual races of the world, and if it can but get perseverance and physical elasticity, one day to be high among the strongest. This is surely a proud record. Of them it may be said in the largest sense that they, being dead, yet live. And when Posterity comes to crown with her praises the Makers of India, she will place her most splendid

laurel not on the sweating temples of a place-hunting politician nor on the narrow forehead of a noisy social reformer but on the serene brow of that gracious Bengali who never clamoured for place or power, but did his work in silence for love of his work, even as nature does, and, just because he had no aim but to give out the best that was in him, was able to create a language, a literature and a nation.

"বঙ্কিম ও মধুসূদন জগৎকে তিনটি অমূল্য অবদান দিয়ে গেছেন। তাঁরা গ'ড়ে দিয়ে গেছেন এই বাংলা সাহিত্য, যার অমর সৃষ্টিগুলি আধুনিক ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে সমান পর্যায়ে দাঁড়াতে পারে। তাঁরা দিয়ে গেছেন এই নতুন বাংলা ভাষা। বাংলা এখন আর প্রাদেশিক বুলি মাত্র নয়, এ হ'ল এক দেবভাষা যা আবহমানকাল পর্যন্ত অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে। বাঙালী জাতি যদি ম'রে না যায়, তাহলে এরও আর মৃত্যু নেই। এই জাতির মধ্যে উদ্দীপনা আছে, তেজস্বিতা আছে, প্রচুর কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনাশক্তি আছে, এরা জগতের বুদ্ধিমান জাতিগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। কেবল যদি এদের যথেষ্ট অধ্যবসায় ও সহনশীলতা থাকে তাহলে এরা একদিন জগতের বরেণ্য জাতিদের মধ্যে স্থান ক'রে নেবে। এটা কম কথা নয়। উপর থেকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, এরা মরে মরেও এতকাল বেঁচে আছে। ভবিষ্যকাল যখন ভারতের স্মরণীয়দের জন্যে বরমাল্য নিয়ে আসবে, তখন সে কোনো পদলোলুপ রাজনৈতিক বা সংস্কারককে বেছে নেবে না, সে বেছে নেবে সেই নিরহঙ্কার বাঙালীকে যিনি নামযশের জন্যে কিছুই করেননি, কেবল কাজকে ভালোবেসে নীরবে তাঁর কাজই ক'রে গেছেন, বিনা স্বার্থে জগৎকে নিজের অন্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নরাজি বিতরণ ক'রে গেছেন, আর নতুন রকম ভাষা ও নতুন রকম সাহিত্যের সৃষ্টি ক'রে একটা জাতির প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়ে গেছেন।"

—বঙ্কিমচন্দ্র, পশুপতি ভট্টাচার্য

৫

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর বছরেই (১৮৯৪) মৃত্যু হয় আমার মাতামহ নবদ্বীপচন্দ্র নন্দীর। আমার বয়স তখন পাঁচ। দাদামশায়ের এই বৃদ্ধ বয়সের ছবি আজও আমার মানসপটে অম্লান হয়ে আছে। আমি তাঁকে ভুলিনি।

দাদামশায়ের একমাত্র পুত্র জ্যোতির্ময় নন্দী, তাঁর জীবদ্দশাতেই পরলোক-

গমন করেছিলেন। আমিই তখন দাদামশায়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী। মাসীমারাও নিঃসন্তান ছিলেন।

দিদিমা, মা ও মাসীমায়েদের কাছে শুনেছিলাম—দাদামশাই সুরসিক, সুগায়ক ও সুলেখক ছিলেন। তবু তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাইনি। পরে দেখলাম —নাট্যকার তিনি। বাড়িতেই দেখলাম তাঁর লেখা 'তিলোত্তমা' নাটক। এই নাটকখানি থেকে দাদামশায়ের আরও অনেক গুণের কথা জানতে পারলাম।

'তিলোত্তমা' সংবৎ ১৯৩১ অব্দে রাজসাহী প্রেসে 'মুদ্রিত'। গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠায় নাট্যকার বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছেন—অভিনেতৃগণ মাস্টার চাইলে তিনি সাহায্য করতে পারেন। দৃশ্যপটের প্রয়োজন হলেও তিনি এঁকে দিতে পারেন। বিজ্ঞাপনের শেষে তাঁর নাম, ঠিকানা এবং তারিখ : বৈশাখ, ১২৮১।

দাদামশাই আমার কাছে বিস্ময়।

১২৮১ সাল হচ্ছে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ। ঐতিহাসিকেরা বলেন, পূর্বে কলকাতার কয়েক জায়গায় শৌখিন অভিনয় হলেও ১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দিয়েই বাংলা রঙ্গালয়ের সূচনা। এই সময় থেকে দাদামশায়ের 'তিলোত্তমা' নাটকের প্রকাশকালের ব্যবধান মাত্র দুটি বৎসর। এই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি থিয়েটারের দক্ষ অভিনেতা, দৃশ্যপট-অঙ্কনশিল্পী হয়ে উঠলেন কেমন ক'রে? সেকালের মুর্শিদাবাদ জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী তিনি। কলকাতার সদ্য-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকার কথাও কখনও শুনিনি। অথচ তিনি থিয়েটারের যাবতীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন কিরূপে? বিস্ময়ের কথা বৈকি। তখনও কি জগতাই-নিমতিতায় থিয়েটার ছিল?

নিমতিতার জমিদার-বাড়িতে একটি থিয়েটার ছিল। নাম—হিন্দু থিয়েটার। আমি সে-থিয়েটারে অভিনয় করেছি। যতদূর জানি—সে-থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা তদানীন্তন জমিদারবাবুদের তরুণ সন্তানেরা : সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। তিনজনের মধ্যে মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন সর্বাপেক্ষা উৎসাহী এবং উদ্যোগী। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু ভূমিষ্ঠ হন 'তিলোত্তমা' নাটক প্রকাশের কয়েক বছর পরে। 'তিলোত্তমা' প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালে, মহেন্দ্রবাবুর জন্ম ১২৮৫-তে।

দাদামশায়ের 'তিলোত্তমা' নাটক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার মধ্যে সুরক্ষিত আছে।

৬

এবারে দিদিমার কথা একটু বলি।

দিদিমাকে পরমা সুন্দরী বলা যেতো যদি তাঁর চোখ দুটি স্বাভাবিক হ'তো। এ যেন আমাদের দেশের মানুষের চোখ নয়। এ-চোখ চীনেদের চোখের চেয়েও ছোট। কেবল দিদিমা নন, আমার মা, মাসীমা, মাসতুতো ভাই—সবারই ঐ চোখ। দিদিমার পিত্রালয়ের তিন-চারজনকে দেখেছি—ঐ অতিক্ষুদ্র চোখ সকলেরই মুখমণ্ডলে।

অনেক কাল পরে একদিন দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) এসেছেন আমার বাড়িতে। দিদিমা তখন বেঁচে। দিদিমার প্রথম দর্শনেই দাদাঠাকুর তাঁকে হঠাৎ বলে বসলেন—

"দিদিমা, বেণীমাধব চাকী আপনার কেউ হতেন ?"

দিদিমা বললেন—"আমার বাবার নাম বেণীমাধব চাকী।"

দিদিমাই কেবল নন, আমরাও বিস্মিত। দাদাঠাকুর আমার দিদিমার বাবার নাম জানলেন কেমন ক'রে ?

আমাদের বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থা দেখে দাদাঠাকুর বলতে আরম্ভ করলেন :

"দিদিমার চোখ দেখেই বুঝেছি—এ চোখ হুবহু বেণীমাধব চাকীর চোখ। আমি তখন খুবই ছোট। প্রাথমিক স্কুলে পড়ি। সেই সময় আমাদের অঞ্চলের স্কুল সাব্ ইনস্পেক্টার ছিলেন বেণীমাধব চাকী। ঠিক দিদিমার মতো চোখ। দিদিমার বাবা কিন্তু বেশ মজার লোক ছিলেন। সেকালে ইনস্পেক্টাররা স্কুল-পরিদর্শনে এসে ছেলেদের বই পুরস্কার দিতেন। অবশ্য সবাইকে নয়—যারা ভালো ছেলে, তাদের। বেণীমাধব চাকী কিন্তু বই নিয়ে আসতেন না। আসতেন রসগোল্লা নিয়ে। সঙ্গে একজন আর্দালী থাকত। তার কাছে থাকত রসগোল্লার হাঁড়িটি। ক্লাসে তিনি যেতেন আর আর্দালীটি হাঁড়িটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেত। ক্লাসে গিয়ে ছেলেদের নানারকম প্রশ্ন করতেন। যে-ছেলে উত্তর দিতে পারত, তাঁর নির্দেশে আর্দালীটি তার হাতে একটি রসগোল্লা তুলে দিত। যারা উত্তর দিতে পারত না, তারা বিরস বদনে বসে বসে অন্য ছেলেদের রসগোল্লা খাওয়া দেখত শুধু। এ যে কত বড় শাস্তি, তোমরা বুঝবে না।"

দিদিমার দেহে আর একটি খুঁত ছিল। দুটি হাতের আঙুলগুলো চাঁপার কলির মত, কিন্তু বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটি ছাড়া। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটি বিবর্ণ, নখটিও। আঙুলটির চামড়া কোঁচকানো—কেমন যেন অদ্ভুত আকারের।

কিন্তু এই কদাকার আঙুলটি দিদিমার গর্বের বস্তু। এই আঙুলটি উঁচু করে তুলে ধরে তিনি পাড়ার বৌ-ঝিদের বলতেন—"জানিস, এটি সতী সাবিত্রীর আঙুল। বুড়ো বয়সে তোদের দাদু পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা—আমি নষ্ট মেয়েমানুষ। বাড়িতে কোনো পুরুষমানুষ দেখলেই সে ভাবত, লোকটি আমার কাছে এসেছে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে। রাস্তা দিয়ে পথ-চলতি কোনও লোক হাঁচলে কি কাসলে ভাবত আমাকে ইশারা করছে। একদিন রাতে একজন লোক গান গাইতে গাইতে পথ দিয়ে চলেছে। বুড়ো বললে—'গান গায়, ওটি কে?' আমি 'জানি না' বলতেই ক্ষেপে আগুন। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল—'জানো না? শয়তানি! দেখি, তুমি কত বড় সতী। এক্ষুনি পরীক্ষা করবো।' এই কথা বলে কোত্থেকে এক টুকরো ন্যাকড়া কুড়িয়ে এনে, সেটিকে কেরোসিনে ভিজিয়ে আমার এই কড়ে আঙুলে বেশ ক'রে জড়িয়ে বেঁধে দিলে। বললে—'আজ সতীর অগ্নিপরীক্ষা। দেখি, চোখ দিয়ে জল পড়ে কি না।' এই কথা বলে দেশলাই জেলে ঐ কেরোসিনে ভেজা ন্যাকড়া জড়ানো আঙুলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে আমার চোখের পানে চেয়ে রইল। দেখতে দেখতে ন্যাকড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেল; পুড়ে ঝলসে গেল আঙুলটাও। চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল পড়ল না দেখে বুড়ো আমার পিঠ চাপড়ে বললে—'ঠিক হ্যায়।' জানিস, অগ্নি-পরীক্ষায় পাস করা সতী আমি।"

৭

আমার বাবার নাম—নিকুঞ্জবিহারী। মা—রাইকমলিনী। বাবা থাকতেন তাঁর পৈতৃক বাড়ি—মালদহের কালিয়াচকে। মাঝে মাঝে শ্বশুরালয় জগতাই-এ এসে আমাদের খোঁজখবর নিয়ে ফিরে যেতেন। কিন্তু আমার মাতামহের মৃত্যুর পরে বাবার এই আসা-যাওয়ার গতি-পরিবর্তন হ'লো। বাবাই তখন আমাদের একমাত্র অভিভাবক। আমাদের দেখাশোনার জন্য অধিকাংশ সময়ই তাঁকে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হ'তো। মালদহের কোন একটি জমিদারী এস্টেটের মামলা-মোকদ্দমার তত্ত্বাবধান করতেন তিনি। ছেড়ে দিলেন সে কাজ। মালদহের বাড়িতে রইলেন আমার ঠাকুমা ও বিধবা পিসীমা।

ঐ সময় পাঁচ বছর বয়সে আমার হাতেখড়ি হ'লো। পুরুতঠাকুর আমার হাতটি ধরে কোনো একটি পাত্রের উপর কী যেন লিখিয়েছিলেন। হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের এইটুকুই মাত্র মনে আছে।

হাতেখড়ির পরদিনই আমার পাঠশালায় প্রবেশ। পাঠশালার পণ্ডিত আমার

মেসোমশাই দীনবন্ধু নিয়োগী। আমাদের বাড়ির পাশেই মেসোমশাইয়ের বাড়ি। বাড়ির বাইরের দিকের বারান্দা ঘিরে মেসোমশাইয়ের পাঠশালা। সেই ঘেরা বারান্দার উঁচুদিকে আড়াআড়িভাবে একটা বাঁশের কড়ি। আর ঐ বাঁশের কড়ির মাঝখানে ঝোলানো একটা দড়ির বালা। এখনকার ব্যায়াম-অনুশীলন-কেন্দ্রে লোহার রডের মাঝখানে যেমন রিং থাকে, সেই ধরনের একটা রিং। এটি কিন্তু স্বাস্থ্যসাধনার উপকরণ নয় পরন্তু শাস্তিবিধানের একটি অনুষঙ্গ। পাঠশালার এই বস্তুটির নাম টিকটিকি। গুরুতর অপরাধী ছাত্রকে এই টিকটিকিতে তোলা হয়। একদিন এই টিকটিকির শাস্তি স্বচক্ষে দেখলাম। দেখে হৃৎকম্প হ'লো। একটি আট-দশ বছরের ছেলেকে পণ্ডিতমশাই ঐ রিং-এ ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটির দুটি হাতের দশটি আঙুল এমনভাবে সন্নিবদ্ধ, যেন ঝুলন্ত অবস্থায় ঐ রিং থেকে হাত খুলতে পারা না যায়। বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে ডান হাতের তর্জনী, বাঁ হাতের মধ্যমা ও অনামিকার ফাঁকে ডান হাতের মধ্যমা আর ডান হাতের অনামিকা বাঁ হাতের অনামিকা আর কনিষ্ঠার মধ্যস্থলে। শূন্যে ঝুলে আছে ছেলেটি। দেহের ভারে দশ আঙুলের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়েছে। বেচারা ছাত্রের এই ভয়াবহ অসহায় অবস্থার মধ্যে প্রাণপণ চীৎকারে কান্নাই উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন। এই কান্না শুনে পণ্ডিতমশাইয়ের চিত্তে করুণার উদ্রেক হলে, ভবিষ্যতে আর এমন অপরাধ করবে না—এক একটি বেত্রাঘাতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়ে ছাত্রের মুক্তি। দুটি বয়স্ক ছাত্র ঐ অর্ধমৃত দেহটিকে নামিয়ে নিলে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে আরও অনেক রকম দণ্ডবিধান ছিল মেসো-মশাইয়ের পাঠশালায়।

টিকটিকিতে ঝোলানোর দৃশ্য দেখার পরদিনই আমি জেদ ধরলাম—পাঠ-শালায় যাব না। মা মেসোমশাইকে ডেকে এনে আমার কথা বেশ বুঝিয়ে বললেন। আমার গায়ে তিনি হাত দেবেন না বলে মাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বইপত্র, খাতা, পেনসিল পাঠশালায় নিয়ে যাবার অধিকার তখন আমার জন্মায় নি। খালি-হাতেই যেতাম। মেসোমশাই অর্থাৎ পণ্ডিতমশাই অঙ্গুলিপরিমাণ একটি কাঠখড়ি দিতেন। তখন খড়িমাটি ছিল দুরকম—কাঠখড়ি আর ফুলখড়ি। এখন কাঠখড়ি বড় একটা দেখা যায় না। ফুলখড়ির চেয়ে শক্ত আর ঘিয়ে রঙের খড়িমাটি হচ্ছে কাঠখড়ি। পাঠশালার মেঝের উপরে পণ্ডিতমশাই কতকগুলি অক্ষর লিখে দিতেন, ব'সে ব'সে তারই উপর দাগা বুলোতে হ'তো। এর কিছুদিন পর প্রমোশন পেলাম বর্ণবোধে আর স্লেট-পেনসিলে। বর্ণবোধ থেকে উত্তরণ বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগে, তারপর দ্বিতীয় ভাগ। এ-সময় স্লেট-পেনসিল ছাড়া লেপ-

বার আরও উপকরণ পেয়েছি ; মাটির দোয়াত, খাগের কলম আর একতাড়া তালপাতা। কুমোররা এই মাটির দোয়াত তৈরি করত। লেখবার কালি তৈরি হ'তো বাড়িতেই। কালির একটা নামও ছিল—কষকালি। ত্রিফলা অর্থাৎ আমলা, বহেড়া আর হরীতকী এক কড়া জলে ফেলে জ্বাল দিয়ে তৈরি হ'তো এই কষকালি। খানিকটা ভূষো ফেলে দিয়ে কালির রং গাঢ় কালো করা হ'তো।

এই ফাউন্টেন পেন আর বল্-পেনের যুগে খাগের কলম বস্তুটির সঙ্গে এখনকার ছেলেমেয়েদের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকবারই কথা। খাগের কলমকে কেউ কেউ খাঁকের কলমও বলত। উলুখাগড়ার শর থেকে এই কলম তৈরি হ'তো বলেই হয়ত খাগের কলম নামকরণ হয়েছিল। খাগের কলমের রং লালচে। বিঘত-প্রমাণ খণ্ড খণ্ড ক'রে এক-একটি কলম তৈরি হ'তো। এক-একটি খণ্ডের এক প্রান্ত বেড়ে লেখবার উপযোগী করা হ'তো কলমটিকে। তখনকার কালে পেনসিল বা কলমের মুখ কাটার নাম ছিল বাড়া।

লিখতে হ'তো তালপাতার উপরে। তালপাতার মাঝের শিরদাঁড়ার কাঠিটা ফেলে দিয়ে লেখবার উপযোগী করা হ'তো। স্লেটের উপরকার লেখা ধুয়েপুঁছে পরিস্কার করে আবার যেমন নতুন ক'রে লেখার উপযোগী করা হয়ে থাকে, তালপাতার লেখাও ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে পাতাগুলিকে বারংবার ব্যবহার করা চলত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের সংগ্রহশালায় এখনও অনেক তালপাতার প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষিত আছে, দেখতে পাওয়া যায়।

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগের পর 'শিশুবোধক' হলো পাঠ্যপুস্তক। এখনকার কালের মত সুদৃশ্য না হলেও শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যে 'শিশুবোধক' ছিল সচিত্র। এই সঙ্গে এলো অঙ্ক শেখার পালা। গোড়ায় ধারাপাত, পরে শুভঙ্করী। ধারাপাতের প্রথমেই শতকিয়া। সাধারণে যাকে "শটকে" বলে। তারপর কড়া, গণ্ডা, পণ, চোক, নামতা। রবীন্দ্রনাথের একটা প্রবচন আছে—"কড়ায় কড়া, কাহনে কানা"। ধারাপাতে এই কড়া আর কাহনের হিসাব দেওয়া আছে। চার কড়ায় এক গণ্ডা, কুড়ি গণ্ডায় এক পণ আর ষোল পণে এক কাহন। পাঠশালার শেষঘণ্টায় সব ছাত্র একত্র হয়ে ধারাপাতের এক-একটি বিষয় প্রতিদিন সুর ক'রে আবৃত্তি করতো। মূল গায়েনের মতো প্রথমে একটি ছেলে সুর ক'রে একটি লাইন আবৃত্তি করত, আর তার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দোয়ার দিত বাকি ছেলেরা। কারও কথায় কেউ সায় দিয়ে গেলে লোকে ঠাট্টা ক'রে বলে—গণ্ডায় আণ্ডা দেওয়া। কথাটি সৃষ্টি হয়েছে পাঠশালার ধারাপাতের গণ্ডাকিয়া আবৃত্তি থেকে। প্রথম ছেলেটা যখন আবৃত্তি করতো একপণ গণ্ডা এক পণ এক গণ্ডা,

তখন ওই বাকি ছেলেদের কোরাসে শেষের গণ্ডা শব্দটির আওয়াই সব চেয়ে জোর ধ্বনিত হ'তো। ধারাপাতের সর্বশেষ বিষয়টিই ছিল সবচেয়ে দুরূহ। কড়াকিয়া গণ্ডা-কিয়ার মতো নামতা মুখস্থ রাখা অতো সহজ নয়। পণ্ডিতমশাইয়ের বহু বেত্রাঘাত সাশ্রুনেত্রে পরিপাক ক'রে আয়ত্ত করতে হ'তো দুই থেকে কুড়ির ঘর নামতা।

এর পরের ধাপ শুভঙ্করী। মানসাঙ্ক শেখার একখানি অমূল্য গ্রন্থ। অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় ভৃগুরাম দাস নামে একজন গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের রাজাদের মন্ত্রীও ছিলেন তিনি। এই ভৃগুরাম দাসই শুভঙ্করীর রচয়িতা। শুভঙ্কর তাঁর ছদ্মনাম। ছোট ছোট কবিতা বা আর্যা রচনা ক'রে শুভঙ্কর এই মানসাঙ্ক শেখার প্রণালী লিপিবদ্ধ করেছেন।

শুভঙ্করের সময় কেবল টাকা আনা গণ্ডাই নয়, মুদ্রা আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত ছিল। কড়া-গণ্ডার কথা বলছি। কড়ারও অনেক অংশ ছিল, যথা—কুড়ি বিন্দুতে এক ঘুণ, চার ঘুণে এক রেণু, চার রেণুতে এক তিল, কুড়ি তিলে এক কাক, চার কাকে এক কড়া। আবার হিসাবের প্রকারভেদও ছিল—তিন যবে এক দন্তী, তিন দন্তীতে এক ক্রান্তি, তিন ক্রান্তিতে এক কড়া।

এখনকার মেট্রিক পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েদের এ-সব হাঙ্গামা পোহাতে হয় না। বাল্যকালে আমাদের কিন্তু কায়ক্লেশে এই কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।

জমির পরিমাণ, জিনিসের দর, মাসের বা বছরের বেতন—এই সব নির্ণয় করবার পদ্ধতি আবিষ্কার ক'রে শুভঙ্কর ছন্দে গেঁথে আর্যায় পরিণত করেছিলেন। কাঠাকালি-বিঘাকালির আর্যাতে জমির, মণকষা-সেরকষাতে জিনিসের দরের আর মাসমাহিনা-বৎসরমাহিনার বেতনের হিসাব থাকত আর্যাগুলিতে। যেমন—কাঠাকালি-বিঘাকালির আর্যা—

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্যে।
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্যে ॥
কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ।
বিশ ধুলে কাঠার প্রমাণ ॥
ধূল বাকি থাকে যদি কাঠা নিলে পর।

'কুড়ো' মানে বিঘা, 'লিজ্যে' (হিন্দি—লি+জিয়ে) মানে লও, 'সারা' মানে কালি অর্থাৎ ক্ষেত্রফল।

আর্যাটির মানে: বিঘাকে বিঘা দিয়ে গুণ করলে কালির বিঘা হয়; কাঠাকে বিঘা দিয়ে গুণ করলে কালির কাঠা হয়; কাঠাকে কাঠা দিয়ে গুণ

করলে ধূল হয়। কুড়ি ধূলে এক কাঠা। ধূলকে কাঠায় পরিণত ক'রে যদি ধূল অবশিষ্ট থাকে, তাহলে অবশিষ্ট ধূলকে ষোল দিয়ে গুণ ক'রে কালির গণ্ডা ধরতে হয়।

মাসমাহিনা-বৎসরমাহিনা, মণকষা-সেরকষা প্রভৃতিরও এই ধরনের আর্যা আছে।

মাসমাহিনার আর্যা—

মাসমাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত,
তঙ্কা প্রতি দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি।
আনা প্রতি দুই কড়া দুই ক্রান্তি।
পাই প্রতি দুই ক্রান্তি, বলে গেল ধূলদন্তী॥

'পাই' এখানে পয়সা। ৩০ দিনে মাসের হিসাবের আর্যা এটি।

শুভঙ্করীর আর্যা ছাড়াও আমরা অঙ্ক পেয়েছি কবিতায়। কবিতায় একটি অঙ্কের কথা এখনও মনে আছে—

আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন।
ক্রোধে জলে ফেলে দিল পবননন্দন॥
অর্ধেক পঙ্কেতে তার, তেহাই সলিলে।
দশম ভাগের ভাগ শেহালার দলে॥
উপরে বাহান্ন গজ দেখ বিদ্যমান।
করহ সুবোধ শিশু দেউল প্রমাণ॥

একটা মন্দির দেখে পবননন্দনের মনে কেনই বা ক্রোধের উদ্রেক হ'লো আর কেনই বা তিনি মন্দিরটাকে তুলে জলের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন, তা তিনিই জানেন। তার জন্যে পাঠক-পাঠিকার বা লেখকের কোন মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা ছাত্রের। একটা মন্দিরের অর্ধাংশ পাঁকের মধ্যে, এক-তৃতীয়াংশ জলে আর শেওলার দলের মধ্যে এক-দশমাংশ; মাত্র বাহান্ন গজ উপরে জেগে আছে। এই দুর্বোধ অঙ্কে বলা হয়েছে—"করহ সুবোধ শিশু দেউল প্রমাণ।" বলা আবশ্যক—আমাদের মধ্যে সুবোধ শিশুও ছিল। দেউলের সঠিক পরিমাপ যাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

৮

সেকালে আমাদের প্রাতরাশ ছিল ভাত; বিকেলে মুড়ি। তখন আমাদের গ্রামে চা, সিঙাড়া, কচুরি, নিমকির প্রচলন ছিল না। পাড়াতে ছিল রামজয় সাহার মিষ্টির দোকান। তার দোকানের অমৃতির অমৃতস্বাদ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

তখন আমাদের গ্রামে পাথরকয়লারও প্রচলন ছিল না। রান্না হ'তো কাঠের জ্বালানীতে। কাঠ কিনতে হ'তো না। বাড়ির আম জাম কাঁঠাল গাছের বাগান থেকেই শুকনো কাঠ মিলত।

নিরামিষ রান্না রাঁধতেন দিদিমা। দিদিমাই সকালে আখায় (উনুনে) আগুন ধরাতেন। ভাতের সঙ্গে আলু, কাঁঠাল-বিচি, বেগুনপোড়া কিংবা ডাল-সিদ্ধ। যেদিন যেটা ইচ্ছা। আমরা সিদ্ধই বলতাম। কলকাতার মত আলু-ভাতে, বড়ি-ভাতে ইত্যাদি 'ভাতে' বলার রীতি আমাদের গ্রামাঞ্চলে ছিল না। কাঁঠাল-বিচি সিদ্ধ খাওয়ার রেওয়াজ কলকাতায় বড়-একটা নেই। ভাত রান্না হ'তো নিজেদের জমির ধান থেকে উৎপন্ন চালে। ঘরেই ঢেঁকি। সেই ঢেঁকিতে চাল ছাঁটাই হ'তো। মোটা চাল। চালের রং লালচে। আউস ধানের চাল। মোটা চাল হলেও এই ঢেঁকিছাঁটা লাল চালের ফ্যানে-ভাতে খুবই সুস্বাদু ছিল। ভাতের সঙ্গে থাকত ঘি। ঘরে তৈরি ঘি। বাড়িতে গরু ছিল। সেই গরুর দুধের সর থেকে মাখন তুলে ঘি তৈরি হ'তো। গরুর দুধ দেওয়া বন্ধ হলে দুধ ঘি সবই কিনতে হ'তো গোয়ালাদের কাছ থেকে। গ্রামেই ছিল গোয়ালপাড়া। সেখানে এক টাকায় ষোল সের দুধ। গোয়ালাকে দশ-পাঁচ টাকা অগ্রিম দিলে টাকায় আধ মণ দরেও দুধ পাওয়া যেত। ঘি আট আনা দশ আনা সের, বড় জোর বারো আনা।

ধান-ভানা হ'তো ঢেঁকিতে কিন্তু চিড়ে-কোটা হ'তো ওখোল-সামাটে। কলকাতা শহরের লোকেরা বোধ হয় ওখোল-সামাট চোখেই দেখেনি। সংস্কৃত ভাষায় ওখোল হচ্ছে উদূখল। ডমরুর আকৃতি, কাঠের তৈরি বেশ বড় আকারের হামানদিস্তার মত। দণ্ডটিও কাঠের। এই দণ্ডটির নাম সামাট। ওখোলের খোলের মধ্যে ধান রেখে সামাটের ঘা দিয়ে চিড়ে কোটা হ'তো। সময়ে সময়ে প্রয়োজন মতো দুটি মেয়ে দুটো সামাট নিয়ে পর্যায়ক্রমে একের পর অন্যে ওখোলের মধ্যে ঘা দিয়ে দিয়ে চিড়ে কুটতো। দেখবার মতো একটা দৃশ্য!

যাদের কিছু জমিজায়গা ছিল, তাদের ক্ষেতের ফসলেই গৃহস্থালির অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কলাই, মুগ, মসুর, বুট (ছোলা) নিজের জমিতেই

জন্মাত। জমির সরষে গ্রামেরই এক তেলীর ঘানিতে পিষিয়ে তেল করা হ'তো। (অর্থাৎ কলুর ঘানিতে সরষে পিষিয়ে তেল বার করা হ'তো)। সেই তেলেই বেশ কিছুদিন রান্না চলত।

৯

বয়স একটু বেড়েছে। পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ ক'রে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। নিমতিতার জমিদারবাবুদের মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়—মাইনর স্কুল যাকে বলে।

স্লেট-পেনসিল এখানেও রইলো। তালপাতার তাড়া আর মাটির দোয়াত ও খাগের কলম বইতে হ'লো না এখানে। খাতায় কাগজের উপরে কুইলের কলম দিয়ে লেখার অধিকার এখানে পেলাম। কুইলের কলম হচ্ছে পাখীর পালকের কলম। রাজহাঁস অথবা ঐ জাতীয় পাখীর পালকের থেকে তৈরি।

এই মাইনর স্কুলটি ছিল জমিদার-বাড়ির এলাকার মধ্যেই। জমিদার-বাবুদেরই একজন ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারি। হেডমাস্টার—কৃষ্ণনারায়ণ সিংহ। হেডপণ্ডিত বাণীকান্ত রায়চৌধুরী। হেডমাস্টারমশাই ছিলেন মৃতদার। তাঁর দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। মেয়ে দুটি ছোট। আট-দশ বছরের। ছেলে দুটি ভাগলপুরে থেকে পড়াশোনা করতেন। বড় ছেলেটির নাম রাধাশ্যাম সিংহ, ছোটটি নিতাইসুন্দর।

হেডমাস্টারমশাই ধার্মিক বৈষ্ণব ছিলেন—নিরামিশাষী। দুবেলাই জমিদার-বাড়ির বিগ্রহদেবতা গোবিন্দজীর প্রসাদ খেতেন। খাওয়াতে একটা অভিনবত্ব ছিল। ডাল, ভাত, তরকারি (ভাজা, সুক্তো, ডালনা, অম্বল, দই, মিষ্টান্ন) সবই একসঙ্গে মিশিয়ে একত্র করে পরম পরিতোষসহকারে আহার করতেন। কোনো ব্যঞ্জনের পৃথক আস্বাদন তিনি পছন্দ করতেন না।

পুত্র দুজন বছরে দু-একবার ভাগলপুর থেকে নিমতিতায় বাবার কাছে আসতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাশ্যাম সিংহ বি.এ. পাস ক'রে এলেন নিমতিতায়। তাঁর বাবা তার অনতিকাল পরে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। রাধাশ্যাম সিংহ হলেন নিমতিতা মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

আমি তখন স্কুল থেকে বেরিয়েছি। আমাদের নিয়ে রাধাশ্যামদা কল্যাণী সমিতি নাম দিয়ে একটা সংস্থা গড়ে তুললেন। দেশহিতব্রত কল্যাণী সমিতির উদ্দেশ্য।

১০

বহুকাল পরের একটি ঘটনা এখানে বললে হয়ত নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯২৩-২৪ সন। আমি তখন কলকাতায় 'বিজলী' সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় দপ্তরে। কোন কার্য উপলক্ষে শিয়ালদহ অঞ্চলে গেছি। শিয়ালদহ স্টেশনে যাবার রাস্তা আর আপার সার্কুলার রোডের (এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) সংযোগস্থলে একটি লোক দাঁড়িয়ে। পরনে হাঁটু পর্যন্ত পরা একখানি খদ্দরের ধুতি। গায়ে খদ্দরের চাদর। হাতে একটি টিনের ছোট বাক্স। পথচারীদের প্রত্যেকের কাছে মাত্র একটি পয়সা ভিক্ষা চাইছেন। একটিমাত্র পয়সা তো। অনেকেই দিচ্ছে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি। এক-একবার মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকটিকে যেন কোথায় দেখেছি। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই তিনি বললেন, "নলিনী না? তুই কলকাতায় আছিস শুনেছি। দেখা যখন হ'লো, একটা পয়সা দে।"

একেবারে 'তুই'। কাছে গিয়ে দেখি, আমাদের সেই রাধাশ্যামদা।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, "রাধাশ্যামদা? আপনি? আপনি এ অবস্থায়?"

রাধাশ্যামদা হাসছেন: "তুই আমাকে চিনতে পারিসনি কিন্তু আমি তোকে ঠিকই চিনেছি। তুই তেমনিই আছিস। আমিই বদলেছি।" আবার বললেন, "একটা পয়সা দে ভাই!"

"তা দিচ্ছি। একটা কেন ষোলটা পয়সা দিচ্ছি। কিন্তু কেন?"

রাধাশ্যামদা বললেন, "না, আমি কারও কাছ থেকে এক পয়সার বেশি নিই নে। একটা পয়সার যে কত দাম, সেইটে আমি পরীক্ষা ক'রে দেখছি। তুই একবার কসবায় যাবি? কসবাতেই আমি থাকি। কসবার চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের বাড়িতে আমি থাকি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বছর দু-তিন হ'লো স্কুলটির ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। আমার এই এক পয়সার ইস্কুল। তিন-চার বছর ধরে কলকাতার নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে পথ-চলতি লোকেদের কাছ থেকে একটি ক'রে পয়সা নিই। সকলেই দেয়।"

"আপনি একাই এই কাজ করেন, না আরও লোক আছে?"

"একা। সম্পূর্ণ একা। আর কেউ নেই। একদিন আয় কসবায়।"

"যাব একদিন।"

"কবে, কখন যাবি বল। যে কোন দিন যে কোন সময়ে গেলে হয়ত আমাকে নাও পেতে পারিস। আমি তো সব সময় সব দিন বাড়িতে থাকি না। দেখতেই তো পাচ্ছিস, এই কাজেই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই দুবেলা।"

দিনক্ষণ স্থির হ'ল। একদিন গেলাম কসবায়। দেখলাম রাধাশ্যামদার চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের প্রথম পর্যায়। রাধাশ্যামদা ওই স্কুল-বাড়িতেই তখন থাকেন একটি ঘরে।

সেইখানেই শুনলাম রাধাশ্যামদার বর্তমান জীবনের ইতিহাস। নিমতিতো স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বি. এল. পাস করে তিনি ভাগলপুরে ওকালতি করতেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দেশের কাজ করবার পরামর্শ দেন, কিন্তু রাজনীতি তাঁর স্বধর্ম নয় বলে তিনি এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করবার ব্রত গ্রহণ করলেন। নিঃসম্বল হয়ে নেমেছিলেন। এক-একটি পয়সা সংগ্রহ করে তিনি প্রতিদিনই আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। স্থানীয় ভদ্রলোকেরাও তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

দেখলাম একটি পয়সার অবিশ্বাস্য শক্তি। অলৌকিক বাস্তব বিগ্রহ।

১১

আমাদের গ্রামাঞ্চলে তখন হিন্দু-মুসলমানে বেশ সদ্ভাব ছিল। হিন্দুর দুর্গা-প্রতিমা দেখতে মুসলমান ছেলেমেয়েরা এসেছে। মহরমের সময় দেখেছি—একই উঠোনে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই যুবকেরা একত্রে লাঠিখেলা তলোয়ার-খেলা দেখাচ্ছেন। মহরমের শেষের কটি দিন আমাদের মতো ছোট ছেলেদের খুবই উদ্দীপনার মধ্যে অতিবাহিত হ'তো। এক-একটা দল আসতো কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে, আমরা তাদের পিছনে পিছনে বাড়ি বাড়ি ঘুরতাম। সব চেয়ে সাড়া জাগাতেন গুলজার সেখ। লোকে বলতো গুলজার ডাকাত। গুলজার ডাকাতের তলোয়ার-খেলা দেখবার মতো। একসঙ্গে তিনটি তলোয়ার নিয়ে খেলতেন তিনি। দুটি হাতে দুটো তলোয়ার আর তৃতীয় তলোয়ারের মাঝখানটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে নানা ভঙ্গীতে তিনি খেলা দেখাতেন।

বিকেলবেলা তাজিয়া বেরতো। গ্রাম্য রাস্তার দু'পাশে আমবাগান। এই রাস্তার উপর দিয়ে যাবে তাজিয়া। এবং যাবে মাথা উঁচু রেখে, মাথা নোয়াবে না। বাগানের যে-সব ডাল রাস্তার উপরে ঝুঁকে তাজিয়া যাবার পথে বাধা সৃষ্টি করতো, সেই ডালগুলি কেটে ফেলে তাজিয়া যাবার পথ সুগম করা হ'তো। বলা বাহুল্য, বাগানগুলি হিন্দুর। বাগানের হিন্দু মালিকেরা বিনা আপত্তিতে

গাছের ডালকাটায় সহযোগিতা করতেন। এই সব তাজিয়া নানা পথ অতিক্রম ক'রে সমবেত হ'তো কালীগঞ্জের মাঠে। সেখানে একটি মেলাও বসত। আমরা দল বেঁধে যেতাম মেলা দেখতে।

১৮৯৭ সনে এই মহরমের দিনে একবার এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমার বয়স তখন আট। বাবার সঙ্গে তাজিয়ার মেলা দেখতে যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি এমন সময় সারাদেহে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। পা টলছে, উঠোনে কাপড় শুকোবার বাঁশের খুঁটি ছিল, সেই খুঁটি ধরে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। খুঁটি জড়িয়ে ধরে আত্মরক্ষা করছি বটে কিন্তু খুঁটিও টলছে। পাড়ায় সব বাড়িতে শাঁখের আওয়াজ হরিধ্বনি। হরি রক্ষা করলেন। অল্পক্ষণ পরেই অবস্থা শান্ত হ'লো। শুনলাম—এর নাম ভূমিকম্প।

আমাদের বাড়ির সম্মুখেই ক্ষিতীনদের বাড়ি। ক্ষিতীন ছুটে এসে বললো, তাদের বাড়িতেও ভূমিকম্প হয়েছে।

এর পরের বছরে (১৮৯৮), আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো: পূর্ণগ্রাস সূর্য-গ্রহণ। সূর্যের আলো একেবারে নিভে গেল, যেন অসময়ে সন্ধ্যা নেমে এল পৃথিবীর বুকে। বাড়ির গিন্নিরা পুরোনো হাঁড়িকুড়ি ফেলে দিলেন, গ্রহণকালে খাওয়াদাওয়া, শৌচাদি নিষিদ্ধ, গঙ্গাস্নান, গঙ্গাতীরে ডোম-চণ্ডালদের দক্ষিণা-দান ইত্যাদি পুণ্যকর্ম সেরে গৃহে প্রত্যাবর্তন।

১২

বাল্যবন্ধুরা একে একে প্রায় সকলেই পরলোকে। সকলের শেষে চিরবিদায় নিয়েছে ক্ষিতীন। স্বনামখ্যাত চিত্রাঙ্কনশিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। ক্ষিতীন আমার প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু। বছর দুয়েকের ছোট। জগতাই গ্রামেরই অধিবাসী, সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাবরেজিস্ট্রার কেদারনাথ মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষিতীন। নিমতিতা মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়া শেষ ক'রে সে ভর্তি হ'লো পাকুড় হাই-স্কুলে। স্কুলের পড়ায় তার মন বসলো না। প্রসুপ্ত প্রতিভার জাগরণ শুরু হয়েছে পাকুড় স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই। লেখাপড়ার চেয়ে ছবি আঁকার দিকে তার প্রবল প্রবণতা দেখে অভিভাবকেরা তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতায় সে শিষ্যত্ব গ্রহণ করল শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে। ছ'বছর একনিষ্ঠ হয়ে শিক্ষাগ্রহণের পর অবনীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে ক্ষিতীন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরূপে যোগদান করলো। স্বল্পকাল পরেই

উন্নীত হ'লো উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে। এই সময় থেকেই ক্ষিতীনের ছবি সমাদর লাভ করে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের কাছে। এই সময়েই (বৈশাখ, ১৩২০) 'প্রবাসী'তে তার 'বিজলী চমকে' ছবি প্রকাশিত হয়। ক্ষিতীন নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব। বৈষ্ণব-ভাবসমৃদ্ধ ছবিই সংখ্যায় বেশি ক্ষিতীনের। সে-সব ছবিতে ভক্তির ব্যঞ্জনা রূপপরিগ্রহ করেছে ভক্তের নিপুণ তুলিকায়। প্রতিটি ছবি শিল্পীর রসোত্তীর্ণ রচনা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যলীলার ছবিগুলিতে ক্ষিতীন একটা অনন্যসুলভ স্থান অধিকার করে নিয়েছে তদানীন্তন শিল্পীদের মধ্যে। মনে পড়ে ক্ষিতীনের একটি অসাধারণ ছবির কথা: শ্রীকৃষ্ণভ্রমে শ্রীরাধার তমাল-তরু আলিঙ্গন। কাণ্ড-শাখা-পত্র-পল্লব সমন্বিত তমালতরুটি এমনই নিপুণভাবে আঁকা, দূরে থেকে দেখলে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের নয়নাভিরাম মূর্তি। জগাই-মাধাই-উদ্ধার ক্ষিতীনের আর একটি ভাবসমৃদ্ধ ছবি। এই সুন্দর ছবিটি বেরিয়েছিল ১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'নারায়ণ' পত্রিকায়।

ললিতকলাবিশেষজ্ঞ সমালোচক অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ক্ষিতীনের ছবির। ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ, বাংলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে (পরে লর্ড জেটল্যাণ্ড), রোদেনস্টাইন প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিরা ক্ষিতীনের ছবি কিনে গুণীর গুণের মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। কলকাতার পরে ক্ষিতীন এলাহাবাদ বিশ্বালয়ের চিত্রাঙ্কন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরূপে বাইশ বছর অতিবাহিত করে কর্মজীবন থেকে অবসর নেয় ১৯৬৪ সনে। এলাহাবাদেই ১৯৭৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ৮৩ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করে ক্ষিতীন—সার্থক শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

ক্ষিতীনের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা বাকি রইলো। প্রসঙ্গক্রমে সে সব কথা যথাস্থানে নিবেদন করা যাবে।

ক্ষিতীন চ'লে গেল। এখন একটিমাত্র বাল্যবন্ধু বর্তমান আছে—অবনী। অবনীভূষণ দাস। এখন সে লেখে অবনীভূষণ বসু দাস। নিমতিতার তখনকার ডাক্তার মহিমচন্দ্র দাসের পুত্র অবনী। ডাক্তার দুর্গাবিলাস ধরের ভাগিনেয়। একসঙ্গে এক শ্রেণীতে না পড়লেও অবনী আমার ছাত্রজীবনের বন্ধু, পরবর্তী জীবনেও পরম সুহৃদ। আমার জীবনের বহু ঘটনার সঙ্গে অবনী সংযুক্ত। জাতীয় জাগরণের প্রথম পর্বে, কল্যাণী সমিতির কর্ম প্রসঙ্গে, ফুটবল খেলার মাঠে আড্ডায় মজলিসে সর্বত্র অবনী। ক্ষিতীনেরই সমবয়সী অবনী।

অবনী কৈশোরে বেশ ভোজনপটু ছিল। কী একটা উপলক্ষে জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে অবনী গিয়েছিল পাকুড়ে। সেখান থেকে ফিরে এলে বন্ধুদের কাছে শুনলাম—অবনী পাকুড়ের এক হোটেলওয়ালাকে বিব্রত করে তুলেছিল। হোটেলের চার্জ জনপ্রতি চার আনা। পেট পুরে খাওয়া। খদ্দেরদের চাহিদা মতো ব্যঞ্জনাদির যে কোনো বস্তু বিনা আপত্তিতে যোগান দেওয়া। সব আমুদে ছেলেদের ভাল ক'রে খাওয়াবেন বলে হোটেলওয়ালা স্বয়ং খাবার ঘরে ব'সে তদবির তদারক করছেন। ছেলেদের খেতে উৎসাহ দিচ্ছেন। প্রয়োজন হ'লে কোন ব্যঞ্জন একাধিক বার চাইতে কেউ যেন দ্বিধা করে না—ব'লে বদান্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি উপকরণ ছিল—হাঁসের ডিমের ডালনা। অবনী মন্তব্য করলে—চমৎকার হয়েছে ডিমের ডালনাটি। আর একটি হবে কি? হোটেলওয়ালা পরিবেশককে হেঁকে দিয়ে যাবার হুকুম করলেন। একের পর আর। বারংবার ডিম চায় অবনী। ক্রমেই হোটেলওয়ালার নেত্রযুগল বিস্ফারিত হ'তে থাকে। পরিশেষে পরিবেশক এসে হোটেলওয়ালাকে বললে—"আর ডিম নেই। সব ফুরিয়ে গেছে।" সেদিন অবনী বারোটা হাঁসের ডিম খেয়েছিল। বলা প্রয়োজন—যাবতীয় আহার্য স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে তার পাকস্থলী কোন রকম অসহযোগ করেনি।

অবনীদের বাড়িতে থাকতেন তার নিকট আত্মীয় আদিনাথ ভৌমিক। আমাদের চেয়ে উঁচু ক্লাসে পড়তেন আদিনাথদা। বয়সে বড় ব'লে আমরা আদিনাথদাকে মান্য ক'রে চলতাম। আদিনাথদাও একজন ভোজনপটু ব্যক্তি ছিলেন। যথাস্থানে সে কথা বলবো।

১৩

স্কুলে পড়বার সময়েই ভারতসম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হলো ১৯০১ সনের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে। পরের দিনই সিংহাসনে বসলেন সপ্তম এডোয়ার্ড।

সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে তখন সকলে বলতো কুইন ভিক্টোরিয়া। স্কুলের ছুটি হলো। ছুটি পেলেই ছেলেদের আনন্দ। ছুটির পরের দিন হেডমাস্টার মশাই হুকুম দিলেন—শিক্ষক, ছাত্র সকলকেই শোকচিহ্ন ধারণ করতে হবে। প্রত্যেকের জামার ডানহাতের হাতার উঁচুদিকে দু'ইঞ্চি চওড়া কালো ফিতে

সেঁটে দিয়ে শোকচিহ্ন ধারণ করতে হ'লো আমাদের। চুপি চুপি বলি—এই শোকচিহ্ন ধারণের অঙ্গসজ্জাতে আমরা আনন্দই অনুভব করেছিলাম। ছেলেদের মনে যাই হোক না কেন, কুইন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে বয়স্করা অনেকেই ব্যথিত হয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়া নাকি প্রজাহিতৈষিণী ছিলেন। তখনকার কবিরা তাঁকে মাতৃসম্বোধন করে কবিতাও লিখতেন। নীলকরদের অত্যাচারের সময়ে কবিতায় কেঁদে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—

কোথা রৈলে মা বিক্টোরিয়া মাগো মা
কাতরে কর করুণা।

বলেছিলেন—

মা, কুইন তোমার ইণ্ডিয়া ধাম
রুইন কোরোনাকো।

ঐ খেদোক্তির সঙ্গেই ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিলেন—

'চোরে খেকো দোয়া গরু'
এমন কোথাও পাবেনাকো।

ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে সপ্তাহকাল আমাদেব জামা ঐ শোকচিহ্ন ধারণ ক'রে রেখেছিল।

এর পর সপ্তম এডোয়ার্ডের করোনেশন বা রাজ্যাভিষেক। করোনেশন অনুষ্ঠিত হ'লো ১৯০২ সনের ৯ই আগস্ট তারিখে। এবারে আমাদের সত্যিকার আনন্দোৎসব। মাইলটাক দূরে কালীগঞ্জের কুঠি। পাকুড়ের রাজার স্থানীয় জমিদারীর সদর-দপ্তর। সপ্তম এডোয়ার্ডের করোনেশন উপলক্ষে রাজ এস্টেটের ম্যানেজার আমাদের স্কুলের ছেলেদের খাওয়াবার নিমন্ত্রণ করলেন। ঠিক দিনটিতে ঠিক সময়ে গেলাম আমরা শ'দেড়েক ছাত্র।

কালীগঞ্জ কুঠির বিরাট অট্টালিকার বারান্দায় সারি সারি আসন ও কলাপাতা পাতা। রাজারাজড়ার ব্যাপার,—ভূরিভোজনের আয়োজন। প্রত্যেকটি উপকরণের মধ্যেই রাজকীয় আভিজাত্যের পরিচয়। পদ্মপাতাসদৃশ বিরাট লুচির পাশে মানানসই একটি বেগুনভাজা। একটি বেগুনকে লম্বালম্বি চিরে বোঁটাসুদ্ধ ছাঁকা তেলে ভাজা। নানাজাতীয় আমিষ ও নিরামিষ ব্যঞ্জন। নানাপ্রকারের মিষ্টান্ন, দই, ক্ষীর প্রভৃতি। তত্ত্বাবধান করছেন স্বয়ং ম্যানেজার বাবু। খাওয়াশেষের দিকে ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞাসা ক'রে চলেছেন—"কী চাই ভাই তোমাদের?" এক প্রান্ত থেকে আদিনাথদা গোপনে তাঁর পার্শ্ববর্তী একটি

ছেলেকে ব'লে দিলেন—"সবাই মিলে বেগুনভাজা চাও।" দেড়শ' ছেলের মধ্যে চুপি চুপি এ কথা প্রচার হয়ে গেল। প্রত্যেকেই চায় বেগুনভাজা। ম্যানেজার বাবু প্রমাদ গণলেন। ছেলেদের বারংবার বলতে লাগলেন—"এত ভালো ভালো খাবার থাকতে বেগুনভাজা খাবে তোমরা?"

আদিনাথদা একপ্রান্ত থেকে বললেন—"বড় ভালো হয়েছে আপনাদের বেগুনভাজা।"

ম্যানেজার সলজ্জকণ্ঠে বললেন—"বেগুনভাজা ফুরিয়ে গেছে ভাই, তোমরা আর কি চাও, বলো?"

আর কেউ কিছু নিলে না। শোনা গেল, আদিনাথদা একাই খেয়েছিলেন পঞ্চাশটি বেগুনভাজা।

১৪

স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তো সকলের সব বিষয়ে সমান দক্ষতা থাকে না। আমাদের স্কুলে কোনো একটি বিষয়ে ফেল করলে সে ছেলেকে পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া হ'তো না। অমূল্য ছিল আমাদের সহপাঠী বন্ধু। বেচারী অঙ্কতে কাঁচা ছিল। সব বিষয়ে পাস করা সত্ত্বেও অঙ্কে ফেল হবার জন্যে সে পর পর দু'বছর একই ক্লাসে পড়ে রইলো। তৃতীয় বৎসরে অমূল্যকে অঙ্কে পাস করাবার জন্যে একটা ফন্দি আঁটা গেল। পরামর্শ করে ঠিক হ'লো, স্কুলের পিওনকে দুটি-একটি টাকা ঘুষ দিয়ে তার দ্বারা আমাদের কাছে অঙ্কের প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে দেবে. পিওন আবার এসে উত্তরপত্র আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে। স্থান ঠিক হ'লো আমাদের আর একজন বন্ধু যুধিষ্ঠিরের বাড়ি। একমাত্র পিসী-মা ছাড়া যুধিষ্ঠিরের বাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। ঠিক সময়ে পিওন এসে প্রশ্নপত্রটি দিয়ে গেল। আমরা দুজনে প্রশ্নগুলি ভাগাভাগি করে নিয়ে অঙ্ক কষতে বসে গেলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে পিওন এল। আমরা প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে পিওন চলে গেল উত্তরপত্র নিয়ে।

পিওন চলে যাবার পর আমাদের মনে হ'লো, কাজটা কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো করা হ'লো না। সবগুলি অঙ্কের নির্ভুল উত্তর দেখে পরীক্ষক মাস্টারের সন্দেহ হবেই: এর মধ্যে কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে। অমূল্যকে আবার অঙ্কের পরীক্ষা দিতে হয় বা। সব কয়টি অঙ্ক ক'ষে দেওয়া উচিত হয়নি।

পরীক্ষার পর দেখা হ'লো অমূল্যর সঙ্গে। আমরাই তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। অমূল্যকে বললাম—"তোমার উত্তর-পত্র দেখে মাস্টাররা সন্দেহ করতে পারেন। তাঁরা মনে করবেন সবগুলি অঙ্কের নির্ভুল উত্তর দেওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। ফলে, হয়তো আবার অঙ্কের পরীক্ষা দিতে হবে তোমাকে। তুমি কি সবগুলি অঙ্কেরই উত্তর লিখেছো ?"

অমূল্য অম্লানবদনে বললে—"হ্যাঁ।"

আমরা বললাম—"অন্ততঃ গুটি দুই অঙ্ক বাদ দিলে পারতে। তা হ'লে মাস্টারদের সন্দেহ হ'তো না।"

গর্বভরে অমূল্য বললে—"মাস্টারদের সন্দেহ হবে না। আমি প্রত্যেকটি অঙ্কতেই একটু একটু ভুল ক'রে দিয়েছি। উত্তর ঠিকই আছে।"

যা হবার তাই হ'লো। এ-বছরও অমূল্য প্রমোশন পেলো না।

ক্লাসে আমি খুব খারাপ ছেলে ছিলাম না। আমাদের কালে সবচেয়ে উঁচু ক্লাস ছিল ফার্স্ট ক্লাস। তারপরে ক্রমান্বয়ে সেকেণ্ড, থার্ড, ফোর্থ প্রভৃতি। আমি যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি, তখন থার্ড ক্লাসের সমস্ত ছাত্রই আমার কাছে প্রাইভেট পড়তো। স্কুলেই একটা বিশেষ সময়ে আমার এই প্রাইভেট ক্লাসের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হ'তো। শিক্ষকের বেতন ধার্য ছিল ছাত্র প্রতি এক টাকা প্রতি মাসে। স্বয়ং হেডমাস্টারমশাই এ ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। তখন একখানা ইংরেজি গ্রামার ছিল, আয়তন প্রায় দু'শ পৃষ্ঠা। ফোর্থ ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পাঠ্য। আমি ঐ গ্রামারের অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশগুলি সংকলন ক'রে একখানি ছোট এক্সারসাইজ বুকে লিখে ছাত্রদের দিয়েছিলাম। ছাত্রেরা সকলেই নকল করে নিয়েছিল সেই খাতাখানি। হেডমাস্টারমশাই সেই খাতার কথা একজন ছাত্রের কাছ থেকে জানতে পেরে, ক্লাসের মধ্যেই খাতাখানি উল্টে-পাল্টে দেখে মলাটের উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন—'জপমালা'।

অবনী ছিল আমার ছাত্রবন্ধুদের অন্যতম। অবনী এখনও জীবিত। কয়েক বছর পূর্বে আমার জন্মভূমি জগতাই গ্রামে গেলে অবনী অনেককেই এই জপ-মালার গল্প শুনিয়েছিল।

স্কুলের ভিতরে আমি যত ভালোই হই, স্কুলের বাইরে আমি আদৌ ভালো ছিলাম না। তার জন্যে ঘরে-বাইরে দৈহিক নির্যাতন সইতে হ'তো আমাকে। ঘরে মা, বাইরে মাস্টারমশাইরা। বাবা কখনও আমার গায়ে হাত তোলেননি,

সেটা স্বহস্তে তুলে নিয়েছিলেন মা। মমতাময়ী মা আমার শাসনের সময় এমনই নির্মম ছিলেন যে, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, এ-বোধ তাঁর থাকতো না। দিদিমা মধ্যবর্তিনী না হ'লে অনেক সময় আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হ'তো।

অবশ্য আমি এঁচোড়ে পেকেছিলাম। দশ বারো বছর বয়সে দুটি নেশায় বিভোর হয়েছিলাম আমি ঃ ধূমপান আর দাবাখেলা। সিগারেট তামাক চলতো লোকচক্ষুর অন্তরালে, বয়স্কদের অগোচরে, কিন্তু দাবাখেলায় গোপনীয়তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবু লেখাপড়া ছেড়ে ঐ বয়সে দাবাখেলার নেশায় মত্ত হয়ে ওঠা দোষাবহ ছিল বৈ কি।

দাবাখেলার নেশা আমার পৈতৃক অবদান। দাবাখেলায় বাবার খুবই খ্যাতি ছিল। কিন্তু মা অপ্রসন্ন ছিলেন। বলতেন কর্মনাশা খেলা। এহেন মা যে তাঁর পুত্রটির দাবাখেলার প্রতি কিরূপ প্রসন্ন ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

অনেক দুর্দিনের মধ্যে একটি দিনের দুর্ঘটনার কথা বলি ঃ

মা কার কাছ থেকে খবর পেয়েছেন যে, আমি দুদিন স্কুলে যাইনি। কথাটা সত্যি। যথারীতি স্নানাহার সেরে খাতাবই নিয়ে স্কুলে যাবার নাম করে অন্য কোনো স্থানে সারাদিন দাবা খেলে ঠিক স্কুলের ছুটির সময়টিতে এ দুদিন বাড়ি ফিরেছি। এটা নতুন নয়। মায়ের কাছেই নতুন খবর। খবর পাওয়া মাত্র মায়ের উগ্র মূর্তি। আমার উপর স্বীকারোক্তির আদেশ। আমি নীরব। আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হ'লো না। কী একটা বস্তু হাতের কাছে ছিল, কাঠের চ্যালা, না, গাছের ডাল, তাই দিয়ে প্রহারের পর প্রহার। এদিনেও দিদিমাই বাঁচালেন।

মা আর কথা কইলেন না। কাগজ-কলম নিয়ে খসখস করে একখানা চিঠি লিখে সেটি হাতে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। শুনলাম, আমার কীর্তিকলাপ সব জানিয়ে হেডমাস্টারের নামে চিঠি লিখে কোন লোক দ্বারা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে তিনি বেরোলেন।

এদিনে আর স্কুল কামাই করবার উপায় নেই। মায়ের চিঠি গেছে স্কুলে।

স্কুলে গেলাম। হেডমাস্টার তখনও আসেননি। মায়ের চিঠি পড়েছে সেকেণ্ড মাস্টার জানকীবাবুর হাতে। পাঁচটি আঙুলের সঙ্গে একখানি বেত তাঁর হাতে সর্বদা সংলগ্ন থাকতো। শাস্তির মানদণ্ড ছিল ঐ বেত্রদণ্ডটি। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বেত্রাঘাত।

স্কুলে ঢোকামাত্র জানকীবাবুর রোষকষায়িত রক্তিম চক্ষু দুটির সঙ্গে আমার সশঙ্ক নেত্রের দৃষ্টিবিনিময়। বললেন, "খাতাপত্তর ক্লাসে রেখে বাইরে এস।"

আদেশ পালন করলাম। স্কুলের বারান্দায় তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতেই আমার দেহে ধারাবাহিক বেত্রবর্ষণ। তার পর ঐ বারান্দার উপরেই তিনি আমাকে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়ে দিলেন : পা দুটি সোজা সমান্তরাল রইলো ; আর কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত নুইয়ে দিয়ে দুটি হাত ঝুলিয়ে চেয়ে থাকতে হ'লো মাটির দিকে। পিঠটা টেবিলের মতো হয়ে রইলো। এইভাবে কৃচ্ছ্রসাধন করছি। মিনিট দশেক পর আচমকা পিঠের উপর একটি প্রচণ্ড বেত্রাঘাত। চেয়ে দেখি হেডমাস্টারমশাই বেত উঁচিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁকে আর বেত্রাঘাতের সুযোগ না দিয়ে আমি হনহন করে সটান ক্লাসে ঢুকে পুঁথিপত্তর নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেলাম।

বেরোনোর পর দেখি দূরে জমিদারবাড়ির একজন দরোয়ান পোস্টঅফিস থেকে চিঠি নিয়ে আসছে। কী একটা দুষ্টবুদ্ধি মাথায় জাগলো, অদূরে রাস্তার ধারে খাতা বই সব ছড়িয়ে ফেলে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম। দরোয়ান ততক্ষণে আমার কাছে এসে পড়েছে। এসেই আমার গায়ে হাত দিয়ে 'এ বাবু, কা হুয়া' ব'লে কোন সাড়া না পেয়ে দ্রুতগতিতে চলে গেল। অনতিকাল পরে জমিদারের কয়েকজন কর্মচারী, স্কুলের শিক্ষকরা সমবেত হয়েছেন আমার চারি পাশে। ছাত্ররাও এসেছে অনেকে। একজন পদস্থ কর্মচারী আমার দেহ পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। তাঁর আদেশে ভিড় কমে গেল। প্রায় সকলেই চ'লে গেল সেখান থেকে। রইলেন হেডমাস্টার আর দু'একজন শিক্ষক। আমি তখন উঠে বসেছি। হেডমাস্টারমশাই আমার হাত ধ'রে তুলে নিকটবর্তী কার্তিক সাহার দোকানে নিয়ে গিয়ে দুটি রসগোল্লা ও এক গ্লাস জল খাইয়ে দোকানদারের তক্তাপোশের উপর বিশ্রামের সুব্যবস্থা ক'রে চ'লে গেলেন।

এদিকে এ খবর শাখাপল্লবিত হতে হতে যখন আমার বাড়িতে এসে পৌঁছেছে, তখন বোধ হয় সেটা আমার মৃত্যুসংবাদ। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বাবা হন্তদন্ত হয়ে তাঁর পরলোকগামী পুত্রের সন্ধান করতে করতে কার্তিক সাহার দোকানে উপস্থিত হয়ে দ্যাখেন—তাঁর গুণধর পুত্র দোকানের তক্তপোশের উপরে বসে হেঁটমুণ্ডে একাগ্রচিত্তে একজনের সঙ্গে দাবা খেলছে! বাবা আমাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। বাড়িতে এসেই আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম —"স্কুলে আর যাবো না।"

স্কুল ছেড়েছি। লেখাপড়াও শেষ হয়েছে। মন ঝুঁকেছে আর এক দিকে। পাড়ায় দুটি বাড়িতে খবরের কাগজ আসত। দুটিই সাপ্তাহিক—বঙ্গবাসী আর হিতবাদী। ঢাউস আকারের কাগজ। পেতে শোয়া যায়। এ ছাড়া তখন

আরও দু'খানি সাপ্তাহিক ছিল—সঞ্জীবনী আর বসুমতী। এই চারখানি সাপ্তাহিকের মধ্যে সব চেয়ে পুরনো বঙ্গবাসী। বঙ্গবাসীর প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সনে। তারপর ১৮৮৩ সনে সঞ্জীবনী। হিতবাদী বেরোয় আরও পরে—১৮৯১ সনে। এরও পাঁচ বছর পরে, ১৮৯৬ সনে বসুমতী।

বাড়ির কাছে ব'লে আমি বঙ্গবাসী আর হিতবাদী—এই দুটি কাগজই পড়বার বেশি সুযোগ পেতাম। বড়রা যখন পড়তেন, আমি এক প্রান্তে ব'সে তাঁদের আলোচনা ও মন্তব্য শুনতাম। তাঁরা চ'লে গেলে আমি বসতাম কাগজ নিয়ে।

বঙ্গবাসী ছিল রক্ষণশীল হিন্দু পরিচালকদের কাগজ আর সঞ্জীবনী ব্রাহ্মদের। হিতবাদী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কাগজ ছিল না। সঞ্জীবনীর প্রথম পাতায় শিরোনামার নীচে লেখা থাকত—'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'। হিতবাদীর শিরোনামার নীচে নীতিবাক্য—'হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ'।

বঙ্গবাসী আর হিতবাদীর উপর আকর্ষণের একটি বিশেষ কারণ ছিল। বঙ্গবাসীর পঞ্চানন্দ ওরফে পাঁচু ঠাকুরের ব্যঙ্গ রচনা আর হিতবাদীর 'বৃদ্ধের বচন' খুবই উপভোগ্য ছিল আমার কাছে। পঞ্চানন্দ ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন বর্ধমান জেলার গঙ্গাটিকুরির ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর 'বৃদ্ধের বচন'-এর শ্রীবৃদ্ধ ছিলেন চন্দননগরের যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কাগজ প'ড়ে বড়দের তুমুল তর্ক শুনে এক একদিন খুব আমোদ উপভোগ করতাম। সে-সময় (১৯০২) দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজে আর বুয়ারে যুদ্ধ বেধেছে। আফ্রিকার সোনার খনির উপর ইংরেজদের লুব্ধ দৃষ্টি। দক্ষিণ আফ্রিকান বুয়ারেরা তাদের হঠাতে চায়। ইংরেজের অদম্য শক্তি। বুয়াররাও সঙ্ঘবদ্ধ। দারুণ পরিস্থিতি। ইংরেজ খনি দখল করবেই। ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে ইংরেজ আর বুয়ারের মধ্যে। ইংরেজদের সেনাপতি লর্ড কিচেনার তাঁর সৈন্যদল নিয়ে বুয়ারদের সৈন্যাধ্যক্ষ ক্রুগ্নি, বোথা আর স্মাটসের সৈন্যদের সঙ্গে লড়ছেন। খবরের কাগজে এই যুদ্ধের খবর প'ড়ে তর্কযুদ্ধ বেধে যেত আমাদের গ্রামের বড়দের মধ্যে। কান্তকবি রজনীকান্ত এই চিত্রটি চমৎকার এঁকেছেন তাঁর বুয়ার যুদ্ধ গানটিতে। খানিকটা শোনাই :

বুয়ারে ইংরেজে যুদ্ধ বেধে গেছে
নিত্য আসিতেছে খবর তার,—
আজকে এরা ওরে গুঁতলে বেড়ে করে,
কালকে ওরা ধ'রে জবর মার।
ভীষণ কি তুমুল কাণ্ড গোলমেলে!

আমরা করি হেথা যুদ্ধ বোলচেলে,
তর্কে হেরে গেলে মাথায় ঘোল ঢেলে
ধরিয়ে চৈতন করি দেশের বার।

* * *

সোনার খনি নিয়ে বল কি হবে বাবা,
থাকলে ধড়ে প্রাণ অনেক খনি পাবা ;
কেন এ কাটাকাটি, পরাণ বধাবধি ;
কেন এ খোঁচাখুঁচি রক্তে নদানদী ?
অনেক দেশ আছে প্রাণটা যদি বাঁচে
খুঁচিয়ে কেন কর সেটাকে বা'র।
শ্বশুর, শালী, শালা, শাশুড়ী, মাগ, ছেলে
বহুত মিলে যাবে প্রাণটা বেঁচে গেলে ;
পালিয়ে এস চ'লে ও কচু দেশ ফেলে,
দুঃখ যাবে ক'ছিলিম তামাক খেলে,
চেহারা যাবে ফিরে বেরোবে কালশিরে,
ভুঁড়িটে যাবে বেড়ে—চমৎকার !

১৫

বেশ আছি। দিনগুলি খাসা কেটে যাচ্ছে।

এর মধ্যে একটা নতুন আড্ডা জুটলো। গ্রামের এক প্রান্তে হরিশ্চন্দ্র দাসের বাড়িতে একটা গানবাজনার আড্ডা বসত। হরিশ দাস জাতিতে বৈষ্ণব ব'লে লোকে বলত হরিশ দাসের আখড়া। সেখানে সন্ধ্যার পর যারা জুটতো তারা সব সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক। কাজেই ভদ্র সমাজে হরিশ দাসের আখড়ার সুনাম ছিল না। আমি গিয়ে জুটলাম এই আখড়ায়। গলায় সুর ছিল। নিজে মনের আনন্দে গানও গাইতাম। হরিশ দাসের আখড়ায় এসে গানে নতুন নতুন রসের আস্বাদন পেলাম। রোজই যাই।

এই সময় দোলযাত্রার মেলা বসেছে জমিদার-বাড়ির সম্মুখের মাঠে। মেলায় অনেক রকমের দোকান এসেছে। অনেক রকমের আমোদপ্রমোদও। আমি একদিন খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা দুটো নাগাদ মেলায় গেছি। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখি এক জায়গায় হরতন, রুইতন, চিড়িতন, ইস্কাবন, মুকুট আর

পতাকার উপর বাজি ধ'রে জুয়াখেলা হচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। হঠাৎ আমার পিঠের উপর একখানি হাত। পিছন ফিরে দেখি হেডমাস্টারমশাই। চাওয়া মাত্র তিনি বললেন—"এতটা অধঃপাতে গেছিস তুই! জুয়া খেলছিস!"

"না, সার, খেলিনি—দেখছি।"

হেডমাস্টারমশাই সজোরে আমার একটি হাত ধ'রে বললেন—"আয় আমার সঙ্গে।"

কাছেই স্কুল। আমাকে তিনি ধ'রে নিয়ে এলেন স্কুলে। আমার যে সব সহপাঠী বন্ধুরা সেকেণ্ড ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছে, সব ছুটে এল। এলেন কয়েকজন শিক্ষকও। ছেলেদের সরিয়ে দিয়ে ঐ শিক্ষকদের সম্মুখে হেডমাস্টারমশাই আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন,—পাঠ্য বিষয়েরই প্রশ্ন। আমি যথাজ্ঞান উত্তর দিলাম। প্রায় মিনিট পনরো জিজ্ঞাসাবাদের পর হেড-মাস্টারমশাই শিক্ষকদের দিকে চেয়ে বললেন—"বেশ তো উত্তর দিলে। ওকে ফার্স্ট ক্লাসে ভর্তি করে নিই। কি বলেন?"

হেডমাস্টারের সিদ্ধান্তের পর আর কোন শিক্ষক কোন আপত্তি করলেন না, তাঁরাও সম্মতি দিলেন।

সেই দিনই আমি ফার্স্ট ক্লাসে ভর্তি হলাম। আমার কোন্ কোন্ বই আছে এবং নেই, সব জেনে নিয়ে যে বইগুলি নেই সেই বইগুলিও হেডমাস্টারমশাই আমাকে দিলেন। বললেন—"আর স্কুল কামাই করিসনে। চার-পাঁচ মাস নষ্ট করেছিস। মন দিয়ে বাকি কটা মাস পড়। পাস করা চাই।"

বাবা-মা খুশী হলেন। খুশী হ'লো বন্ধুরাও।

ক'টি মাস খেটে পড়লাম। পরীক্ষায় পাসও করলাম।

বাবা জঙ্গিপুর হাই স্কুলে ভর্তি ক'রে দিলেন।

১৬

প্রথিতনামা চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর 'জলসাঘর' ছবির রূপালি পর্দায় নিমতিতার জমিদারবাড়িটিকে রূপায়িত ক'রে সমগ্র সভ্যজগতের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের নয়নগোচর ক'রে দিয়েছেন।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রায়বাড়ি' ও 'জলসাঘর' গল্প নিয়ে এই জলসাঘর ছবি। গল্প দুটি প্রাচীন কালের জমিদারদের প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা,—একে অন্যের পরিপূরক।

চিত্রগ্রহণের স্থান-নির্বাচনের জন্য সত্যজিৎবাবু প্রথমে গেলেন লালগোলার রাজবাড়িটি দেখতে। কিন্তু এই রাজপ্রাসাদটি পছন্দ হ'লো না তাঁর। তারপর গেলেন মুর্শিদাবাদ জেলারই কাঞ্চনতলার জমিদারবাড়ি। এখানেও ছবি তোলা সম্ভব হ'লো না। অবশেষে নিমতিতা। নিমতিতার জমিদারবাড়ি দেখেই পছন্দ হ'লো তাঁর। বাড়িটি গঙ্গার তীরে,—পছন্দ হবার অন্যতম কারণ। জমিদারদের সম্মতি নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে গেলেন।

শোনা যায়—কলকাতায় ফিরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই নিমতিতার জমিদারবাড়ির কথা বলতেই তারাশঙ্কর বিস্মিত হয়ে বলেন—নিমতিতার জমিদারবাড়ি নিয়েই তাঁর গল্প দুটি লেখা। তাঁর জলসাঘর এই বাড়িরই জলসাঘর !

গৌরসুন্দর চৌধুরী আর দ্বারকানাথ চৌধুরী—দুই ভাই-এর হাতেগড়া নিমতিতা। সহোদর নন—জেঠতুতো খুড়তুতো ভাই। গৌরসুন্দর চৌধুরীকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যে বছরে আমি জন্মেছিলাম, সেই বছরেই তিনি পরলোকগমন করেন। দ্বারকানাথ চৌধুরীকে আমি কিশোরকাল পর্যন্ত দেখেছি। চালে-চলনে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, আচারে-ব্যবহারে সেকালের জমিদারদের মতো বৈভববিলাসের কোনও চিহ্ন ছিল না তাঁর মধ্যে। সাধারণ ভদ্রব্যক্তি—অসাধারণ জমিদার।

গৌরসুন্দর চৌধুরীর দুই পুত্র: উপেন্দ্রনারায়ণ আর সুরেন্দ্রনারায়ণ। উপেন্দ্রনারায়ণ 'হরিবাবু' আর সুরেন্দ্রনারায়ণ 'কালীবাবু' নামে পরিচিত সকলের কাছে। বিধাতার নির্মম বিধানে হরিবাবু জন্মোন্মাদ। অত বড় ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারীর পরিধানে বস্ত্র নেই। সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেহ। পরনের কাপড়খানি গুটিয়ে বাঁ হাতের বগলে চেপে ধ'রে রাখেন। সঙ্গী একজন চাকর আর একটি কুকুর। সাধারণ জাতের কুকুর। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বাইরে এসে কাপড়ের একটি প্রান্ত গলার মধ্যে পুরে দিয়ে সমস্ত ভুক্ত বস্তু উদ্গিরণ ক'রে কুকুরটিকে খেতে দিতেন। সব সময়েই শান্ত থাকেন, কেবল দু'একটি বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-ভঙ্গী সহ্য করতে পারেন না। গালাগালি দেন। বেশি উত্তেজিত হ'লে তাড়া ক'রে মারতে যান। কখনো কখনো নিজের হাতের আঙুল কামড়িয়ে উত্তেজনা প্রকাশ করেন। পাগলের প্রলাপের মধ্যে কচিৎ দু'একটি এমন কথাও বেরিয়ে পড়ে, যা আপ্তবাক্যের মত শোনায়। এই সব কথা শুনে ধর্মিষ্ঠ ব্যক্তিরা বলতেন—ইনি পূর্বজন্মের যোগভ্রষ্ট সাধু। আমি তাঁর প্রৌঢ় অবস্থা দেখেছি। আমরা তাঁকে দাদা ব'লে সম্বোধন করতাম।

গৌরসুন্দর চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনারায়ণ ওরফে কালীবাবু ছিলেন অপরূপ সুন্দর কন্দর্পকান্তি পুরুষ। চালচলন, আচারব্যবহার, বেশভূষা ও বিলাস-বৈচিত্র্যে জমিদারসুলভ আভিজাত্যের আধারস্বরূপ ছিলেন তিনি।

দ্বারকানাথ চৌধুরীর দুই পুত্র—মহেন্দ্রনারায়ণ ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ। জ্ঞানেন্দ্র-নারায়ণ স্থানীয় জনসাধারণের কাছে হুটুবাবু নামে পরিচিত। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্র-নারায়ণের শখ ছিল থিয়েটারের। পিতা দ্বারকানাথের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৩০৪ সালে তিনি একটি শখের থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। নাম দেন হিন্দু থিয়েটার। মহেন্দ্রনারায়ণ তখন উনিশ বছরের তরুণ যুবা। কনিষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ কলকাতায় পড়াশোনা করতেন। শখ ছিল খেলাধূলায়। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস তিনটি খেলাই তিনি প্রবর্তন করেন নিমতিতায়। তিনি নিজে টেনিস খেলতেন। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতারও প্রবর্তক তিনি। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্থানের অনেক দল যোগদান করতো। সুরেন্দ্রনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণও এই সব খেলাধূলায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণকে উৎসাহ দিতেন।

১৭

মুর্শিদাবাদ জেলায় বহু জমিদার। নবাব, মহারাজা, রাজার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। লক্ষপতি নিযুতপতি অনেকেই। নিমতিতার জমিদারবাবুদের জমি-দারীর আয় জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু একাধিক পর্ব উপলক্ষে এবং বিবাহাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যয়বাহুল্যের যেরূপ দীপ্যমান দৃশ্য আমরা দেখেছি সেরূপ সমারোহ সচরাচর দেখা যায় না।

জমিদারবাড়িটি রাজপ্রাসাদেরই সমতুল্য। প্রাকৃতিক পরিবেশও সুন্দর। সম্মুখে অনতিদূরে প্রবহমাণা ভাগীরথী। মাঝখানে দুটি খেলার মাঠের পর নদীতীর পর্যন্ত শ্যামল শস্যক্ষেত্র।

প্রাসাদের বহিস্তোরণের সন্নিকটে পূর্ব-পশ্চিমাভিমুখী রাজপথ। বহিস্তোরণ ও রাজপথের মধ্যবর্তী পথিপার্শ্বে দুই দিকে শ্যামল শষ্পাস্তৃত মসৃণ ক্ষেত্র—লন। বহিস্তোরণ থেকে প্রাসাদের প্রবেশপথ পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে দুটি সুরম্য উদ্যান। নানা বর্ণের নানা গন্ধের পুষ্পসম্ভারে উদ্যান দুটি সুরঞ্জিত ও সুরভিত।

দোতলা বাড়ি। দুই মহল। বহির্বাটী ও অন্তঃপুর। বহির্বাটীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে চণ্ডীমণ্ডপ, উচ্চতায় দোতলার সমান। প্রাঙ্গণ

থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে মন্দিরে পৌছতে হয়। প্রাঙ্গণের অন্য তিন দিকে সুপ্রশস্ত বারান্দা। পশ্চিমের বারান্দাটি সুবৃহৎ কাছারি-কক্ষের সম্মুখে। উত্তর-দক্ষিণ দুদিকের বারান্দার পার্শ্বে জমিদারী-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর এবং অন্যবিধ ব্যবহারের জন্য একাধিক কক্ষ। দক্ষিণ-পশ্চিম বারান্দার নৈঋ্ত কোণে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। দোতলাটি একতলার অনুরূপ পরিকল্পনায় নির্মিত। দোতলায়, একতলার কাছারি-কক্ষের ঠিক উপরে মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত একটি সুরম্য প্রকোষ্ঠ। আমরা বলতাম পেইন্টিং হল। চারিদিকের দেওয়াল নয়নাভিরাম রঙে রঞ্জিত ও সুরুচিসম্মত চিত্রাঙ্কনে সুশোভিত। পারস্যদেশীয় গালিচা বিছানো কক্ষতল। বেলোয়ারি কাচের একাধিক ঝাড়লণ্ঠন। খানদানী আভিজাত্যপূর্ণ বাতাবরণ। জমিদারবাড়িতে তখন সর্বত্র কারবাইড গ্যাসের আলো জ্বলত। বেলোয়ারি কাচের ঝুলন্ত দীপাধারগুলি গ্যাসের আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠলে এক অবিস্মরণীয় সুষমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত হলঘরটি। এই হলঘরটিই তারাশঙ্করের গল্পের 'জলসাঘর'।

পূর্বদিকে প্রাসাদসংলগ্ন-মন্দিরে গৃহদেবতা শ্রীগোবিন্দজীর অধিষ্ঠান। মন্দিরের সম্মুখে বিরাট নাটমণ্ডপ। শুচিশুভ্র মর্মরে মণ্ডিত নাটমণ্ডপের তলদেশ। সর্বত্র একটা পরিচ্ছন্ন পবিত্র পরিবেশ।

বাড়ির বহির্ভাগে থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ। কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের আদলে তৈরি।

থিয়েটার-বাড়ির অদূরে ছাপাখানা। নাম—গোবিন্দ প্রেস। গোবিন্দ প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০২ সনে। ছাপাখানার পূর্বদিকে আস্তাবল: ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ির আস্তানা। রাস্তার উত্তরদিকে হস্তীশালা, সেখানে থাকত একটি বৃহদাকার হস্তী।

প্রাসাদের পূর্বপ্রান্তে একটি পুষ্করিণী। বাঁধানো ঘাট। সিঁড়ি বেয়ে জলে নামতে হয়। পুষ্করিণীর চতুর্দিকে রাস্তা। পশ্চিমদিকের রাস্তার অনতিদূরে শস্যভাণ্ডার—নানাপ্রকার শস্যের একাধিক গোলা।

জমিদারবাড়ি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে একটু দূরে একটি সুবৃহৎ বাগান;— আম কাঁঠাল তো বটেই, কতকগুলি দুর্লভ গাছও দেখেছি ঐ বাগানে। আমরা অনেক সময় বাগানে গিয়ে হরীতকী গাছের তলা থেকে ঝ'রে-পড়া হরীতকী ও তেজপাতা গাছের তলা থেকে শুকনো তেজপাতা কুড়িয়ে আনতাম।

বাড়ির পশ্চিমদিকে পাইক-বরকন্দাজদের বাস। ভীষণ আকৃতি এক-একজন বরকন্দাজের: শালপ্রাংশু দেহ—ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ। এদের প্রাত্যহিক ব্যায়াম

—ডন-বৈঠক, মুগুরভাঁজা আমরা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। মাঝে মাঝে এরা লাঠিসোঁটা নিয়ে দল বেঁধে স্থানান্তরে চলে যেত। কোথাও জলে ডোবা শিকস্তি জমি পয়স্তি হয়েছে। পার্শ্ববর্তী জমিদারের লোক সেই জমি জবরদখল করেছে, কোথাও বা প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে স্থানীয় নায়েব-গোমস্তাদের বিপন্ন করবার হুমকি দিয়েছে—এই ধরনের খবর সদরে পৌছলে প্রতিকারের জন্যে পাইক-বরকন্দাজদের যথাস্থানে পাঠানো হত। বিজয়ী হয়ে ফিরে আসতেন তাঁরা।

শোনা গেছে—প্রজাবিদ্রোহের জন্যে কোন জমিদার জমিদারী রক্ষা করা অসম্ভব বোধ করলে গৌরসুন্দর চৌধুরী মহাশয়কে স্বল্প খাজনায় পত্তনি দিতেন সেই জমিদারী। বলা বাহুল্য সেই সব পত্তনি মহালের বিদ্রোহী প্রজাদের আয়ত্তে আনতে গৌরসুন্দর চৌধুরী মহাশয়ের কালবিলম্ব হতো না। এইরূপ পত্তনি-মহাল অনেকগুলি ছিল নিমতিতার জমিদারদের। কাল্পনিক কাহিনী হ'লেও নিমতিতার জমিদারবাড়ির মূল মাটির তলায় প্রচ্ছন্ন রেখে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রায়বাড়ি ও জলসাঘরের শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত রূপসৃষ্টি করেছেন।

নিমতিতার জমিদারদের জমিদারীর অনেক মামলা ইংরেজ সরকারের আদালতে যেতো না। জমিদারের কাছারিতেই এ সব মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালা হতো। স্বয়ং জমিদার দ্বারকানাথ চৌধুরী তাঁর দু'জন সচিব রাধিকালাল চৌধুরী ও আশুতোষ চক্রবর্তী এবং ম্যানেজার কৃষ্ণনাথ মজুমদারের সাহচর্যে এই সব মামলার বিচার করতেন। অপরাধীকে দণ্ড ও নিরপরাধকে মুক্তি দিতেন।

১৮

জমিদারবাড়িতে একাধিক পুণ্যানুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম—সদাব্রত। সমাগত সাধুসন্তদের সেবার জন্যে এই সদাব্রত অনুষ্ঠান। সাধুসন্ন্যাসীর সংখ্যা যতই হোক না কেন—প্রত্যেকেরই আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল জমিদার-বাড়িতে। একটি ধর্মশালা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ সন্ন্যাসী উন্মুক্ত স্থানে ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যান-ধারণা করতেন এবং আহার্য প্রস্তুত করতেন। প্রত্যেক সন্ন্যাসীর জন্যে বরাদ্দ ছিল আটা, ঘি, ডাল আর জ্বালানী কাঠ। শুনতাম চারটি পয়সা প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে দেওয়া হতো গাঁজার জন্যে।

নানা রকমের সাধু দেখেছি আমরা। সব সাধুই ছাইমাখা, হাতে কমণ্ডলু,

চিমটে। কারো বা সঙ্গে কম্বল, হরিণ বা বাঘের চামড়া। কেউ বা কৌপীন-সম্বল, কারও বা আজানুলম্বিত বহির্বাস। আলখাল্লা-পরা বা আগুল্‌ফলম্বিত গেরুয়া-পোশাক-পরা আধুনিক সন্ন্যাসীর সমাগম তখন ছিল না।

একটা ছোটখাটো অন্নসত্রও ছিল জমিদারবাড়িতে। স্থানীয় দুঃস্থ অসহায় মহিলারা, স্কুলের কয়েকজন পরিজনবিহীন শিক্ষক এবং কতকগুলি দরিদ্র ছাত্র দুপুরে ও সন্ধ্যায় দু'বার গোবিন্দজীর অন্নভোগের প্রসাদ পেতেন ঠাকুরবাড়িতে।

নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়-স্বজনদের ভূরি-ভোজনের বন্দোবস্ত থাকত, তেমনি জমিদারবাড়ির বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে কাঙালীভোজনের সময়েও তদনুরূপ খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা হ'তো। কাঙালীদের আমন্ত্রণ জানানো হ'তো গ্রামে গ্রামে ঢোল-শোহরৎ দিয়ে। এই ঢালাও নিমন্ত্রণে কিরূপ জনসমাগম হবে, আগে থেকে তা নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং অপরিজ্ঞাত অভ্যাগতদের জন্যে অফুরন্ত আয়োজন করতে হ'তো গৃহস্বামীকে। কাঙালীরা উদরপূর্তি ক'রে আহার করা ছাড়া সঙ্গে-আনা একটি থলে ভর্তি ক'রে ভোজ্যবস্তু বহন ক'রে নিয়ে যেতেন। (একটি কথা সবিনয়ে বলা আবশ্যক—আমাদের গ্রামাঞ্চলে সেকালে কাঙালীরা দরিদ্রনারায়ণ আখ্যায় উন্নীত হননি)।

নিমতিতার জমিদার-পরিবারে বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে উৎসব-সমারোহ ছাড়া একটি সামাজিক প্রথা দেখেছি—জগতাই-নিমতিতার আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বিতরিত হ'তো একটি পিতলের কলসী ভরা সর্ষের তেল। মিষ্টান্নও থাকতো সেই সঙ্গে।

দুটি বিবাহোৎসবের কথা বলি। গৌরসুন্দর চৌধুরীর পুত্র সুরেন্দ্রনারায়ণ ও দ্বারকানাথ চৌধুরীর পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণের শুভবিবাহ। জেঠতুতো ও খুড়তুতো দুটি ভাইয়ের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল একসঙ্গে। উৎসবানুষ্ঠানও একই সঙ্গে। আমি তখন ছ'বছরের বালক। উৎসবের ঘটার কথা মনে আছে কিন্তু ঘটনার কথা স্মরণে নেই।

স্পষ্ট মনে আছে পরবর্তী বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথা।

দ্বারকানাথ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের বিবাহের উৎসব-আড়ম্বরের দৃশ্য আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমার বয়স তখন তেরো। বিশেষরূপে মনে আছে কলকাতার থিয়েটারের কথা। আমাদের স্থানীয় থিয়েটারের অভিনয় দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। কলকাতার থিয়েটার সেই প্রথম দেখলাম। কলকাতা থেকে স্টার থিয়েটার এলো। চার রাত্রি অভিনয় হ'লো

তিনটি নাটকের: ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'সাবিত্রী', গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য-লীলা' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নাট্যরূপ।

কলকাতার থিয়েটার তখন আমাদের কাছে বিস্ময়। আমাদের স্থানীয় থিয়েটারে নারী-চরিত্র অভিনয় করেন পুরুষেরা—কলকাতার থিয়েটারে দেখলাম নারীচরিত্রে নারীদেরই অভিনয়। বরং পুরুষ-চরিত্রে নারীর অভিনয় দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলাম। চৈতন্যলীলা নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নরীসুন্দরী।

শোনা যায়—চৈতন্যলীলা নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী বিনোদিনীর অভিনয় দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাবসমাধি হয়েছিল। এখানে নরীসুন্দরীর চৈতন্য চরিত্রের অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছিলেন পরম বৈষ্ণব গতিগোবিন্দ রায়। গতিগোবিন্দ রায় নিমতিতার জমিদারদের আত্মীয়। সংসারত্যাগী বৈরাগী। বৃন্দাবনে থেকে ভজনসাধন করেন। জমিদারদের সনির্বন্ধ অনুরোধে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতে তিনি বৃন্দাবন থেকে নিমতিতায় এসেছেন। অধিকাংশ সময় একান্তে মৌনী হয়ে ব'সে মালাজপ করেন। তাঁর অনুরোধে আরও একদিন চৈতন্যলীলার অভিনয় হ'লো।

কলকাতার স্টার থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার অভিনয় আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে: মুগ্ধ হয়েছি 'সাবিত্রী' নাটকে মাণ্ডব্যের ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্রের অভিনয় দেখে। যেমন তাঁর উদাত্তমধুর কণ্ঠস্বর, তেমনি অকৃত্রিম ঐকান্তিক অভিনয়। আর ঐ নাটকেই তুম্বুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় হাস্যরসাত্মক অভিনয়। কথায় গানে সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করেছিলেন তিনি। ভোলবার নয় তাঁর 'তোমায় কি বলে ডাকবো বৌ' গানটি।

এই বিবাহে কলকাতা থেকে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন।

চন্দ্রশেখর নাটকে লরেন্স ফস্টারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অমৃতলাল বসু সকলকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করেছিলেন।

তিনটি নাটকেরই অভিনয় একান্ত উপভোগ্য হয়েছিল।

বিবাহ উপলক্ষে কলকাতা থেকে এসেছিল আতসবাজি। এ জাতীয় আতসবাজিও আমাদের কাছে নতুন। নানা রঙের নানা রকমের বাজি। গগনতলে অগ্নিবরণ নাগনাগিনীর এমন ছোটাছুটি আমরা এর আগে কখনও দেখিনি।

১৯

বহু পূজাপার্বণ হ'তো জমিদারবাড়িতে। সারা বছর ধ'রেই চলতো পূজায়োজন। বৈশাখ মাসে গোবিন্দজীর বিশেষ পূজা, বিশেষ সেবানুষ্ঠান। এই মাসে শীতল ভোগ দেওয়া হ'তো গোবিন্দজীকে। ভোগের শীতল-প্রসাদ অর্থাৎ ভোজ্যবস্তু একটি পরাতে সাজিয়ে জগতাই-নিমতিতার প্রত্যেক বাড়িতে প্রতিদিন সারা মাস ধ'রে বিতরণ করা হতো। ভাদ্রে গোবিন্দজীর ঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী। এ দুটি অনুষ্ঠানে জাঁকজমক না থাকলেও তিথিসম্মত পূজার্চনার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। জন্মাষ্টমীতে নাটমন্দিরে হ'তো নন্দোৎসব।

শরতে শারদীয় দুর্গাপূজা। মাসখানেক আগে থেকেই সাড়া প'ড়ে যায় সমগ্র অঞ্চলে। প্রতিমা গড়বার জন্যে গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর থেকে বিখ্যাত পাল-বংশের বিশিষ্ট কারিগর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আসতেন জমিদারবাড়িতে। পোয়াল দিয়ে প্রতিমার বুঁদিবাঁধা আমরা সাগ্রহে কুতূহলী হয়ে দেখতাম। পোয়াল আর বুঁদিবাঁধা—দুটো শব্দই হয়তো অনেকের কাছে অপরিচিত। একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ধান মাড়াই-এর পর যে ধানগাছগুলি অবশিষ্ট থাকে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে তাকে পোয়াল বলে। ঐ পোয়াল দড়ি দিয়ে বেঁধে তৈরি হয় বিগ্রহের কলেবর—দেহের এক-একটি অঙ্গ। এর নাম বুঁদিবাঁধা। বুঁদিবাঁধা-পর্ব শেষ হবার পর একমেটে দোমেটে ক'রে প্রত্যেকটি প্রতিমূর্তির মুণ্ড বসিয়ে ভাল ক'রে শুকিয়ে গেলে কারিগর সাদা রং দেন তার উপর। তার পর বিশেষ বিশেষ প্রতিকৃতির গায়ে বিশেষ বিশেষ রং। কাঁইবিচির আঠা তৈরি থাকত একটি পাত্রে। কারিগর সেই আঠা মেশাতেন রং-এর সঙ্গে। রং করা হয়ে গেলে তারা-ভুরু চানকানো। তারা-ভুরু চানকানোর পর মূর্তিগুলির দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হ'তো। সম্পূর্ণ হ'তো প্রতিমা গড়া। সঙ্গে সঙ্গে চলে চালচিত্র আঁকা। জন্তু-জানোয়ার গড়তে কৃষ্ণনগরের কারিগররা বোধ হয় অনন্যসাধারণ। গণেশের বাহন ইঁদুরটিকে কে বলবে মাটির ইঁদুর। বেড়ালেরও ভ্রম হ'তে পারে। আর ঐ সিংহের সারা গায়ে আঠা দিয়ে টার্কিশ তোয়ালে সেঁটে তার উপর সিংহের স্বাভাবিক রং লাগিয়ে কারিগর কাচের কৃত্রিম চোখ জুড়ে দিতেন সিংহের চক্ষু-কোটরে। মনে হ'তো ভয়াবহ হিংস্র বন্য সিংহ।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—তিন দিন মহাপূজার বিরাট আয়োজন। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল মহাষ্টমীর সন্ধিপূজা। বিশেষ দর্শনীয় সন্ধিপূজার আরাত্রিক।

প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে বহু ঢাক-ঢোল, কাড়ানাকাড়া, সানাই ও কাঁসি নিয়ে

বাদ্যকেরা প্রস্তুত। ঢাকীদের ঘাড়ে ঢাকের পিছন দিকে পাখির পালকের গুচ্ছ দিয়ে তৈরি পেখমের অপরূপ সজ্জা। প্রাঙ্গণে যন্ত্র নিয়ে যন্ত্রীরা আর মন্দিরের অভ্যন্তরে কাঁসর ও পেটা-ঘণ্টা নিয়ে একাধিক ব্যক্তিরা পুরোহিতের ঘণ্টাধ্বনির জন্যে অপেক্ষমাণ। প্রতিমার সম্মুখে নানাবিধ উপচারে পূজায়োজন, জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ ধুনচিতে ধূনাগুগ্‌গুলের গন্ধবহ ধূমোৎক্ষেপ। সহসা দণ্ডায়মান পুরোহিতের ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণ ও মন্দিরাভ্যন্তর বিবিধ বাদ্যের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠতো। ধুনচির ধোঁয়ায় মন্দির সমাচ্ছন্ন। পুরোহিতের কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ, বামহস্তে অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি, দক্ষিণ হস্তে পর্যায়ক্রমে আরাত্রিকের পূজাসম্ভার—পঞ্চপ্রদীপ, ধূপাধার, ধৌতবস্ত্র, চামর-ব্যজন প্রভৃতির আবর্তন। দেখে মনে হ'তো, এ যেন ললিতকলাসম্মত নীরাজনা। পুরোহিতের শঙ্খধ্বনির সঙ্গে শেষ হত আরাত্রিক।

আমাদের এই বৈষ্ণবধর্মপ্রধান অঞ্চলে দুর্গাপূজায় পশুবলির প্রথা প্রচলিত ছিল না।

বিজয়াদশমীতে প্রতিমানিরঞ্জনের পর দুর্গাপূজা শেষ।

দুর্গাপূজা-সমাপ্তির পর, একাদশীর দিন থেকে আরম্ভ হত গৃহদেবতা গোবিন্দ-জীর নিয়মসেবা। এই একাদশীর দিন থেকে উত্থান-একাদশী পর্যন্ত এক মাস কাল গোবিন্দজীর বিশেষ পূজা। সম্মুখের নাটমন্দিরে লীলাকীর্তনের আসর। শ্রীরাধার পূর্বরাগ থেকে আরম্ভ ক'রে যথাক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার পদাবলী-কীর্তনের পালা গাওয়ার পর মহারাস ও কুঞ্জভঙ্গ গেয়ে এই লীলা-কীর্তনের পরিসমাপ্তি। সমাপ্তির পর ধুলোটে উপসংহার।

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান—আমাদের বাংলাদেশের এই তিনটি জেলাতেই অধিকাংশ প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াদের আবাস। স্থানীয় জনসাধারণও পদাবলী কীর্তনের অনুরাগী। আমরা ছেলেবেলা থেকেই কীর্তন গান শুনতে ভালোবাসতাম। প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াদের নাম আমাদের মুখস্থ ছিল। দূর দূরাঞ্চলে কোথাও কোন স্বনামখ্যাত কীর্তনীয়ার গানের কথা শুনলে আমরা সেখানে ছুটে যেতাম কীর্তন শুনতে। মনে আছে—একবার খবর পেলাম, বীরভূম জেলার বেলেপলসা গ্রামে চব্বিশ প্রহর গানের আসরে কীর্তনীয়া অবধূত বাঁড়ুজ্জে আসবেন। অবধূত বাঁড়ুজ্জে প্রথম শ্রেণীর কীর্তনীয়া। তাঁর নাম শুনেছি, কিন্তু গান শুনিনি। দু'তিনজন বন্ধু বেলেপলসা যাবার জন্য সঙ্কল্প করলাম। কিন্তু বেলেপলসা আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় বারো-তেরো মাইল দূর। গরুর গাড়ি

ছাড়া অন্য যানবাহনে যাবার ব্যবস্থা নেই। আমরা হেঁটেই গেলাম। সেখানে তিন দিন থেকে প্রাণ ভ'রে অবধূত বাঁড়ুজ্জের গানের রসাস্বাদন করে ঘরে ফিরে এলাম।

পরে এই অবধূত বাঁড়ুজ্জের গান এক মাস ধ'রে শুনলাম গোবিন্দজীর নাট-মন্দিরে ব'সে। নিয়মসেবায় বড় বড় কীর্তনীয়ারাই জমিদারবাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। এসেছেন অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমদাস, রাধিকা সরকার, অখিল মিস্ত্রী, রাধাশ্যাম, রাধাবিনোদ প্রভৃতি কীর্তনীয়ারা। অখিল মিস্ত্রী এসেছেন পর পর দু' বৎসরে দু'বার। ভক্ত কীর্তনীয়া এই অখিল মিস্ত্রী। সময়ে সময়ে দেখেছি তাঁর প্রেমাশ্রুধারা। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরও ছিল তাঁর। রাধিকা সরকার ছিলেন বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কীর্তনীয়া। শ্রীমদ্‌ভাগবত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্র থেকে তিনি শ্লোকোদ্ধার ক'রে পদাবলীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতেন। আখরও ছিল অপূর্ব। কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর না হ'লেও ভাবব্যঞ্জনায় তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রে দিতেন। প্রেমদাসের মত মধুর কণ্ঠস্বর সচরাচর শোনা যায় না। কেবল স্বরই নয়, সঙ্গীতের শিল্পকলানৈপুণ্যেও তিনি ছিলেন অসাধারণ।

এই সব প্রথম শ্রেণীর কীর্তনীয়াদের দোহাররাও ছিলেন সকল শ্রেণীর কীর্তন-গানের সুদক্ষ শিল্পী। কীর্তনীয়াদের সঙ্গে যাঁরা খোল বাজাতেন, তাঁরাও প্রথম শ্রেণীর বাদক। এই দোহার ও খোলবাদকেরা কীর্তনের আসর জমিয়ে তুলতেন।

পদাবলী-কীর্তন চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত: গরাণহাটী (বা গড়েরহাটী), মনোহরসাহী, রেনেটি ও মন্দারিণী। আমাদের মার্গসঙ্গীত ধ্রুপদের সঙ্গে গরাণ-হাটী তুলনীয়। বিলম্বিত লয়ের গান। ধ্রুপদাঙ্গ গানের তালের চেয়েও গরাণ-হাটী গানের অনেক তালের মাত্রাসংখ্যা বেশি। মনোহরসাহীতেও বিলম্বিত লয় কিন্তু তালের ছন্দোমাধুর্য এবং সুরের অলঙ্করণ অপেক্ষাকৃত অধিক। রেনেটি দ্রুত লয়ের গান। মন্দারিণী স্বরসংযুক্ত আবৃত্তি-বিশেষ কিন্তু তালানুসারী গান।

এই চার শ্রেণীর পদাবলী কীর্তনেই খোলবাদকেরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে থাকেন। এই খোলবাদকদের মধ্যে পাখোয়াজ-তবলা বাজনায় সুদক্ষ যন্ত্রীকেও দেখেছি। অখিল মিস্ত্রীর দলে একজন খোলবাদক এসেছিলেন। নাম অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর খোলবাজনার ধরন আলাদা। আলাদা স্টাইলের বাজনা। একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। আমার কৈশোরকাল হ'লেও তিনি আমাকে অগ্রাহ্য করলেন না। কথাপ্রসঙ্গে বুঝলাম এ বাদন-শৈলী তাঁর নিজস্ব। খোলের অনেক বোলও তাঁর নিজের রচনা। পাখোয়াজ ও তবলা বাজানোতেও

তিনি অভ্যস্ত। আমার অনুসন্ধিৎসা দেখে তিনি আমাকে নয় মাত্রার আড়াঠেকা শিখিয়েছিলেন। আড়াঠেকা তাল সাধারণত আট মাত্রার হয়ে থাকে।

নিয়মসেবায় এই লীলাকীর্তন-পর্ব শেষ হলে পর ধুলোট গেয়ে বিদায় নিতেন কীর্তনসম্প্রদায়। ধুলোটে নামসঙ্কীর্তন গাইতেন কীর্তনীয়ারা।

এই নিয়মসেবার মধ্যেই গোবর্ধনযাত্রার দিন গোবিন্দজীর অন্নকূট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যেত। মন্দিরের মধ্যে শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহের সম্মুখে পর্বতপ্রমাণ অন্নস্তূপ। নানাবিধ ব্যঞ্জনের আধারে মন্দিরতল সমাকীর্ণ। পরমান্ন দধি মিষ্টান্নের পাত্রে পাত্রে পরিপূর্ণ মন্দিরের অভ্যন্তর। ভোগারতির পর নিমন্ত্রিত অতিথিদের পরিবেশন করা হ'তো সেই ভোগের মহাপ্রসাদ। অন্নকূট উৎসবেও নিমন্ত্রিত হতেন জগতাই-নিমতিতার আত্মীয়স্বজনেরা।

দোলযাত্রা নিমতিতার জমিদারবাড়ির সর্বাপেক্ষা সমারোহপূর্ণ উৎসব। পরে এই দোলযাত্রার কথা বলব।

২০

নিমতিতার জমিদার-বাড়ির দোলযাত্রা উৎসব সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে একটি বিশেষ সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান। জমিদার-বাড়ির সামনেই বিরাট ময়দানে মেলা বসে। প্রায় পক্ষকালব্যাপী মেলা। নানান জায়গা থেকে নানা রকমের পণ্যসম্ভার নিয়ে দোকানপাট আসে। আসে নাগরদোলা, আসে ঘোড়ার চরখী। আমরা পরম আনন্দে যেমন নাগরদোলাতে চড়তাম, তেমনি চরখীর ঘোড়ার পিঠে চড়ে চক্রাকারে ঘুরতাম। প্রতি বছর একটা হিন্দুস্থানী লোক আসত ম্যাজিক ক্যামেরা নিয়ে, আমরা বলতাম ম্যাজিক লণ্ঠন। ফটো-ক্যামেরার মুখের মত একটা কাচের ভিতর দিয়ে আমরা ভিতরের ছবি দেখতাম। লোকটা বলতো দিল্লীকা দরবার দেখো, আগ্রাকা তাজমহল দেখো, এই সব নানা জায়গার নাম করে ছবি দেখাতো। স্থির ছবি, আলোতে উজ্জ্বল। সব শেষে দেখাতো একটি বাঘ। বাঘটি কিন্তু স্থির নয়। এদিক ওদিক করে ঘুরতো। আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। ভাবতাম—অত বড় বাঘটা এই তাঁবুর মধ্যে কোথায় থাকে। পরে শুনলাম—ওটা বাঘ নয়—ঐ লোকটার পোষা বেড়াল-বাচ্চা। কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে তাকে বাঘের মতো বড় দেখায়। এই ম্যাজিকলণ্ঠন দেখতে একটি ক'রে পয়সা লাগতো।

একবার একটা অদ্ভুত জিনিস এলো দোলের মেলায়। কলের গান! এখানেও দক্ষিণা এক পয়সা। তাঁবুর মধ্যে কলের গান হচ্ছে। বাইরে থেকে কিন্তু কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ভিড় জমে গেছে তাঁবুর বাইরে। সারা অঞ্চলের লোক দলে দলে যাচ্ছে কলের গান শুনতে। ফিরে আসছে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে। একটি পয়সা খরচ করে ভিড় ঠেলে একদিন আমিও ভিতরে ঢুকলাম। গিয়ে একখানি চেয়ারে বসে পড়লাম। পাশে ২।৩ খানা চেয়ারে আরো ২।৩ জন। সম্মুখে একটা ছোট বাক্স। বাক্সের গায়ে কয়েকটা ফুটো। সেই সব ফুটোর ভিতর দিয়ে রবারের নল বেরিয়ে এসেছে। নলের শেষ দিকটা দুভাগ ক'রে ছোট ছোট দুটি নল বসানো হয়েছে। প্রত্যেকটি ছোট নলের মুখে হুঁকো-কলকের মতো একটা বস্তু। অনেকটা ডাক্তারদের স্টেথস্‌কোপের মতো দেখতে। সেই কলকের মতো বস্তু দুটো আমার দুটি কানের মুখে পরিয়ে দিলে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কলের গান আরম্ভ হলো—"আর ঘুমায়ো না মন, মায়াঘোরে আর কতকাল রবে অচেতন।" সে যে কী অনুভূতি, কী আনন্দ—লিখে বা ব'লে বোঝানো অসম্ভব। বড়দের কাছে শুনেছিলাম—এর নাম নাকি ফনোগ্রাফ। ইনিই গ্রামোফোনের পূর্ব-পুরুষ।

মেলায় আসতো বীরভূমের গ্রামাঞ্চল থেকে কবি ও ঝুমুরের দল। মালদহের আর আমাদের এই অঞ্চলের আলকাপ।

থিয়েটার আর যাত্রার অভিনয় নিয়মিতভাবে দোলযাত্রা উৎসবের প্রধান দুটি অঙ্গ। যাত্রার দল আসতো কলকাতা থেকে। থিয়েটার স্থানীয়।

থিয়েটারের উদ্যোগ-আয়োজন চলতো ২।৩ মাস আগে থেকে। নতুন নাটকের রিহার্সাল চলতো আরও আগে থেকে। মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন থিয়েটারের সর্বাধিনায়ক। নাট্যকলায় অসাধারণ প্রতিভাশালী গুণী ব্যক্তি। নাটক-নির্বাচন, অভিনয়-শিক্ষাদান, দৃশ্যপট-পরিকল্পনা প্রভৃতির ভার তিনিই গ্রহণ করতেন। যেমন তিনি প্রযোজক, তেমনি পরিচালক ও শিক্ষকও তিনিই উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন তিনি।

থিয়েটারের প্রস্তুতি-পর্বে—২।৩ মাস আগে—নতুন নাটকের দৃশ্যপট আঁকবার জন্যে প্রতি বৎসরেই আসতেন কলকাতার বিশেষজ্ঞ চিত্রশিল্পী রঙ্গলাল। কলকাতার রঙ্গালয়গুলির সঙ্গে রঙ্গলালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

থিয়েটারের দৃশ্যপট মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির ভার ন্যস্ত ছিল কৃষ্ণনাথ মজুমদারের উপর। কৃষ্ণনাথবাবু ছিলেন জমিদার-বাড়ির জামাতা এবং ম্যানেজার। নাটক-

অভিনয়কালে নৈসর্গিক দৃশ্য কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করবার একটা সহজাত শক্তি ছিল কৃষ্ণনাথবাবুর। নদী এবং জলতরঙ্গ, নদীপ্রবাহের ধ্বনি, পাহাড়, শূন্যে প্রেতাত্মা (নহুষ), শূন্যে অবস্থিত ত্রিশঙ্কু প্রভৃতিকে যেন তিনি যাদুকরের মতো বাস্তব ক'রে তুলতেন।

নিমতিতা, জগতাই ও দহরপাড়—এই তিনটি স্থানের গুণী ব্যক্তিরাই মুখ্যত ছিলেন নিমতিতা হিন্দু থিয়েটারের অভিনেতা। খোদ নিমতিতাতে জনকয়েক উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন: সতীশচন্দ্র ভাদুড়ী, বসন্তকুমার মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র সরকার, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রাণহরি দাস এবং আরও কয়েকজন। নিমতিতা অঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করা হ'তো কম-বয়সী ছেলের দল। এদের দক্ষতা ছিল নৃত্যগীতে। এই দল থেকে মৃত্যুঞ্জয় নামে একটি ছেলে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল নাচে, গানে এবং অভিনয়ে। এ রকম সর্বতোমুখী প্রতিভা খুব কমই দেখা যায়। আর একটি প্রিয়দর্শন কিশোর—নাম যুধিষ্ঠির—, নারী-চরিত্রের অভিনয়ে তার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। গানের কণ্ঠ ছিল সুমধুর। আজও মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে 'পিয়ারা'র ভূমিকায় তার প্রাণোচ্ছল অভিনয়ের কথা। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকে যুধিষ্ঠিরের উদিপুরীর অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। 'আলমগীর' নাটকের একটি বিশেষ অভিনয়-রজনীর কথা বলি:

স্বনামখ্যাত নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী দোলযাত্রা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে একবার নিমতিতায় এসেছেন। সে-বার দোলযাত্রার নাট্যোৎসবে 'আলমগীর' নাটকের অভিনয়। অভিনয় দেখে শিশিরবাবু মুগ্ধ। মফঃস্বলের গ্রামাঞ্চলে যে এরূপ সুদক্ষ অভিনেতার সমাবেশ হতে পারে, এটা তাঁর ধারণার অতীত। স্থানীয় জনসাধারণের একান্ত ইচ্ছা একবার শিশিরবাবুর অভিনয় দেখবার জন্যে। জনসাধারণের মুখপাত্র হয়ে মহেন্দ্রবাবু শিশিরকুমারকে একদিন 'আলমগীর' নাটকে ঔরংজেবের ভূমিকার অভিনয় করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। খুব বেশি সাধাসাধি করতে হ'লো না। সহজেই সম্মত হলেন শিশিরবাবু।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ঔরংজেব আর তাঁর পার্শ্ববর্তিনী উদিপুরী বেগমের ভূমিকায় আমাদের যুধিষ্ঠির। অত বড় শক্তিমান অভিনেতার পার্শ্বে সমান দক্ষতার সঙ্গে সদা-সপ্রতিভ যুধিষ্ঠির উদিপুরীর চরিত্রটি জীবন্ত ক'রে তুলেছিল সেদিন। শিশিরবাবু যুধিষ্ঠিরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

নিমতিতা ছাড়া জগতাই ও দহরপাড়েও ছিলেন কয়েকজন সুদক্ষ অভিনেতা।

জগতাই-এর যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারমণ নন্দী ও রসরাজ ঘোষ বিভিন্ন ভূমিকায় বহু নাটকে বহুবার অবতীর্ণ হয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক জটিল চরিত্রে রূপদান করেছেন। অমৃতলাল বসুর 'কৃপণের ধন' নাটকে হলধর হালদার সাজতেন রাধারমণ নন্দী। এ রকম নিখুঁত বাস্তব অভিনয় সুদুর্লভ। রসরাজ ঘোষ ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। গানগুলি কেবল শ্রবণগ্রাহী নয়, হৃদয়গ্রাহীও হ'তো তাঁর গায়কীর গুণে। থিয়েটারের প্রম্পটারও ছিলেন জগতাইবাসী। নাম— অতুলচন্দ্র নিয়োগী। সসঙ্কোচে বলি—আমিও নিমতিতা থিয়েটারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম।

দহরপাড় থেকে আসতেন শচীন্দ্রনাথ অধিকারী (পরে সান্যাল) ও চারুচন্দ্র সিংহ। দুজনেই শক্তিশালী অভিনেতা। দুজনেই নারীচরিত্রের অভিনয় করতেন। শচীন্দ্রনাথ কিন্নরকণ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী এবং সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। গানের তান, মীড, গমক, মূর্ছনা—প্রত্যেকটি উপাদান থরে থরে কণ্ঠে সাজিয়ে দিয়ে যেন বিধাতা তাঁকে ইহলোকে পাঠিয়েছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপ-আদিত্য নাটকে 'বিজয়া'র ভূমিকায় শচীন্দ্রনাথের 'এসো ফিরে এসো ফিরে এসো গো' গানটি ভোলবার নয়।

দোলযাত্রার সময় যে-সব নাটক অভিনীত হবে, সেগুলির প্রচার-পত্র ছাপিয়ে বিলি করা হ'তো এতদঞ্চলে। অভিনেতাদের অভিনয়-চাতুর্য, বিশেষ বিশেষ নৈসর্গিক দৃশ্যের বিস্ময়কর বিবরণ প্রভৃতি চটকদার ভাষায় মুদ্রিত থাকত এই সব প্রচার-পত্রে। ছাপাখানার কম্পোজিটর তথা ম্যানেজার তারাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কিঞ্চিৎ রচনাশক্তি ছিল। তিনিই লিখতেন এই সব প্রচার-পত্র।

সেকালে থিয়েটার আরম্ভ হবার আগে, যবনিকা ওঠার পর আরম্ভ হ'তো কন্সার্টের যন্ত্রসঙ্গীত। এই কন্সার্টের পর 'ড্রপসিন' তুলে আরম্ভ হ'তো নাটকের অভিনয়। নাটকের প্রতি অঙ্কে ড্রপসিন পড়ার পর এই কন্সার্ট বাজত। নাটকের প্রোগ্রাম ছেপে বিলি করা হ'তো দর্শকদের মধ্যে। এই প্রোগ্রামে প্রতি অঙ্কের পরে কন্সার্টের স্থলে মুদ্রিত থাকত ঐকতান বাদন।

নিমতিতা হিন্দু থিয়েটারের বহু সুবিখ্যাত নাটকের অভিনয় হয়েছেঃ গিরিশ-চন্দ্রের শঙ্করাচার্য, বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যলীলা; দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতাপসিংহ, সাজাহান, মেবারপতন, দুর্গাদাস; ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপ-আদিত্য, রঘুবীর, পদ্মিনী, চাঁদ-

বিবি, বঙ্গে রাঠোর, ভীষ্ম, রামানুজ, আলমগীর, আলিবাবা, প্রমোদরঞ্জন, পলিন, বরুণা ; অতুলকৃষ্ণ মিত্রের শিরী-ফরহাদ, অমৃতলাল বসুর কৃপণের ধন, হরিশ্চন্দ্র ; রাজকৃষ্ণ রায়ের নরমেধ যজ্ঞ ; বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নাট্যরূপ ; রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন। স্মৃতিশক্তির দৈন্যের জন্যে আরো ভালো ভালো অনেক নাটকের কথা বাদ প'ড়ে গেল।

নিমতিতার থিয়েটার নিমন্ত্রিত হয়ে গেছে কাশিমবাজার মহারাজার বাঞ্ছেটিয়া এক্‌জিবিশনে, গেছে বুধসিংহ দুধোরিয়ার আজিমগঞ্জের বাসভবনে, গেছে রঘুনাথগঞ্জ শহরে। প্রত্যেক স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে এসেছে।

২১

এই দোলযাত্রার সময় কলকাতা থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত যাত্রার দল প্রতি বৎসরই আসতো নিমতিতায়। এখন আর সে ধরনের যাত্রার দল সারা বাংলায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখনকার যাত্রা নামেই যাত্রা, থিয়েটারের পরগাছা বললেও অত্যুক্তি হয় না। তখনকার যাত্রার প্রধান অঙ্গ ছিল গান। এইজন্যে যাত্রার নাটকের নাট্যকাররা তাঁদের নাটকের নামের শেষে গীতাভিনয় কথাটা জুড়ে দিতেন। যেমন—লক্ষ্মণের শক্তিশেল গীতাভিনয়, সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়, অজামিলের বৈকুণ্ঠ লাভ গীতাভিনয়। ছেলে ও জুড়ি—এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যথোপযুক্ত গানগুলি গাইতেন গায়কেরা। ছেলের দলকে ছোকরার দলও বলতো অনেকে। অন্যূন আটজন গায়ক থাকতো এই ছোকরার দলে আর অন্যূন চারজন গায়ক গাইতেন জুড়ির গান। নাটক বিশেষে কোনো কোনো দৃশ্যে এই ছোকরার দল মেয়ে সেজে নাচ-গানও করতো।

জমিদার-বাড়ির বিরাট প্রাঙ্গণে বসতো যাত্রাগানের আসর। প্রাঙ্গণের মাঝখানে সবুজ রঙের কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকতো আসরটি। রেলিং-এর প্রত্যেক দিকে মাঝখানে থাকতো খানিকটা ফাঁক,—গায়কেরা অবস্থাবিশেষে শ্রোতাদের সম্মুখে গিয়ে গান শোনাতেন। শুধু গায়কেরাই নয়—বেহালা-বাদকও তাঁর যন্ত্রটিকে নিয়ে এগিয়ে যেতেন তাঁর কলানৈপুণ্য দেখাবার জন্যে। ছেলেদের পরনে থাকতো পাজামা আর সাচ্চাজরিদার জামা, জুড়িদের পোশাক অনেকটা এখনকার উকিল-মোক্তারদের মতো। কোনো কোনো জুড়ির জামার উপরে একাধিক সোনার মেডেল। মেডেলের মালাও দেখা গেছে কোনো কোনো জুড়ির জামার বুকে। বেহালাবাদকদের পোশাকও অনেকটা জুড়িদেরই

মতো। তাঁদেরও গলায় মেডেল। আবার অনেকের পকেটে সোনার চেন-ঝোলানো ঘড়ি। জুড়িরা প্রায় সকলেই ওস্তাদ গাইয়ে—সাধা গলা উদাত্তগম্ভীর স্বর। দুজন জুড়ির গানের সুর এখনও আমার কানে বাজছে। এঁদের একজন হচ্ছেন জ্যোতিষ পরামাণিক, আরেকজন হেম পাণ্ডা।

যাত্রার আসরে বসতেন ছেলেরা, জুড়িরা আর যন্ত্রীরা। হারমোনিয়ম ক্ল্যারিওনেট, বেহালা, বাঁয়া-তবলা, ঢোলক, মন্দিরা, খরতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন কুশলী যন্ত্রীরা—কখনও একাকী, কখনও একযোগে—ঐকতান বাদনে। যন্ত্রীদের মধ্যে বেহালাবাদক ছাড়া আর সকলেই ধুতি-পাঞ্জাবি-উত্তরীয় পরা বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মতো আসরে বসতেন।

যাত্রার আসর অধিকাংশ দিনেই বসতো ভোর তিনটায়। তিনটার আগেই দর্শকসমাগম হতো। প্রাঙ্গণের পূর্বে ও পশ্চিমে—বাড়ির বারান্দায়, চণ্ডীমণ্ডপে এবং চণ্ডীমণ্ডপে ওঠবার প্রশস্ত সোপানগুলিতে দর্শকেরা আসন গ্রহণ করতেন। দক্ষিণ দিকের বারান্দাটি চিক দিয়ে ঘেরা—সেখানে মহিলাদের আসন। উত্তর দিকের বারান্দার পূর্বাংশে অমাত্যদের অফিসগুলি খালি ক'রে সেখানে নির্দিষ্ট ছিল যাত্রার দলের সাজঘর।

যাত্রা আরম্ভ হ'তো ঢোলকের বাজনা দিয়ে। একক ঢোলকের গুরুগম্ভীর আওয়াজ—চতুর্দিকের দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে তার মন্দ্রিত প্রতিধ্বনি—সে এক অদ্ভুত বাতাবরণ। স্বল্পক্ষণ ঢোলকবাদ্যের পর সমস্বরে বেজে উঠতো বাকী যন্ত্রগুলি। এক সঙ্গীতসমারোহপূর্ণ পরিবেশ।

তারপর আরম্ভ হ'তো অভিনয়। বলা বাহুল্য, পুরুষেরাই নারীচরিত্রের অভিনয় করতেন। নাট্যকার সংলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাটকের গানগুলি যথাযথ স্থানে সন্নিবিষ্ট করতেন। ঠিক সেই সব স্থানে সংলাপ শেষ হওয়া মাত্র ছোকরা বা জুড়িরা গান ধরে দাঁড়িয়ে উঠতেন। দুটি-একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি :

নাটকটির নাম সুরথ-উদ্ধার। নাটকে দুটি কিশোর-চরিত্র—অধিরথ আর সুধীরথ। অধিরথ বড়, ছোটভাই সুধীরথ। ঐ কৈশোরেই সুধীরথের জীবনে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। অধিরথ তাকে বোঝাচ্ছে এই কচি বয়সে তোমার এ মনোভাব কেন? এই ধরনের সংলাপটি শেষ হওয়ামাত্র ছোকরার দল একসঙ্গে গান ধরলো—

"সুধীরথ, এ কি মনোরথ ভাই,
এ নবীন কিশোর বয়সে?"

মিনিট দশেক ধরে গান চললো। আবার দাঁড়ালো দুই ভাই—অধিরথ আর সুধীরথ। আবার তারা গানের আগেকার সংলাপের সূত্র ধরে বক্তৃতা শুরু করলে। এবার শুরু হ'লো ছোটভাই সুধীরথের দার্শনিক বক্তৃতা। সংসার মায়া। এই মায়াময় সংসারে কে বা পর, কে-ই বা আপন।

সংলাপের শেষ হতেই ছোকরার দল আবার গান ধরে ক্ষিপ্রগতিতে যে-যার পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গাইতে লাগল—

দাদা, কে বা কার পর কে কার আপন ?
কালশয্যা-'পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে
দ্যাখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন।
আসা-যাওয়া জীবের স্বকর্মের গতিকে,
কে রোধিবে এই আবর্ত-গতি-কে,
যাতায়াতের পথে কার বা সাথী কে ?
যেন পথিকে পথিকে পথের আলাপন।
স্রোতের তৃণসম ভাসিয়ে ভাসিয়ে
তোমায় আমায় দাদা মিলেছি আসিয়ে।
আবার কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
(কোথায় চ'লে যাব, স্রোতের টানে ভেসে ভেসে
কোথায় চ'লে যাব,
এক তৃণ ছেড়ে অন্য তৃণ ধ'রে
অনন্ত নাগরে মিশিব)
এবার হয়েছি ভাই তব, আবার কার ভাই হব,
কে করে নিরূপণ !

গানটি বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী-সম্মত, কিন্তু ঐ বন্ধনীর মধ্যেকার অংশটুকু ছাড়া। ঐ অংশটুকুতে কীর্তনসঙ্গীতের আখরের সুর। এই আখরের সময় সমঝদার শ্রোতারা সাধুবাদ জানাতেন ছোকরাদের।

জুড়ির দলের গানের কথাও একটু বলি। জুড়িরাও গান ধরতেন ঐ একই ধারায়।

পালা—লক্ষ্মণের শক্তিশেল। নিহত পুত্র ইন্দ্রজিতের শোকে পিতা দশানন দিশাহারা। যেমন শোকার্ত, তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ। রামচন্দ্রকে তিনি সমুচিত শিক্ষা দেবেনই। রামচন্দ্রকে রণাঙ্গনে বধ না করা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি

নেই। রাণী মন্দোদরী স্বামীকে বোঝাচ্ছেন—রামচন্দ্র ভগবানের অবতার। তিনি গুণময়, নির্গুণ আবার গুণাতীত···

জুড়িরা গান গাইতে গাইতে উঠলেন—

গুণময় নির্গুণ রাম রঘুমণি।
তিনি ব্রহ্মসনাতন, সীতা ব্রহ্মসনাতনী।
শ্রীগঙ্গায় পদপঙ্কজে সৃজিলেন নাভি-সরোজে
দেবদেব-অগ্রজে , ;
ভাবেন তাঁর চরণাম্বুজে হৃদাম্বুজে শূলপাণি ॥
চরমে পরমাপদ তরিতে পরমাস্পদ
রাঘবের পরমপদ।
সাধকের সম্পদ ঐ পদ বিপদতরণী ॥

মন্দোদরীর তত্ত্বকথা শুনে রাবণ আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—রাম একজন সাধারণ মানুষ, ঐ বানররাই তার ভক্ত। তার ধর্মাধর্মজ্ঞান নেই। নির্দোষ বালি-রাজার হত্যাকারী সে। কে বললে, সে পূর্ণব্রহ্ম ?

সঙ্গে সঙ্গে জুড়িরা আবার সমস্বরে গান ধরলেন—

তায় পূর্ণব্রহ্ম প্রিয়ে, বোলো না।
যে-রামে শাখামৃগগণে করে সাধনা।
গণ্যমান্য আমি নাহি করি অমরে,
পুণ্যশূন্য রাম কি করিবে সমরে ?
কিবা নর, কি বানর সমরে কাহারে প্রাণে থোবো না
ধর্মাধর্মসার মর্ম জানে না যার
কর্ম পানেতে তার গ্যাখো না ?
কব কায়, হাসি পায়—বালিরাজার বধার কথা ভাবো না।

সে কী দাপটের সঙ্গে জুড়ির গান। সব শেষে যখন তাঁরা গাইতেন ঐ 'বালি-রাজার বধার কথা ভাবো না', তখন—আধুনিক কালের ছান্দরসিকরা যাকে মধ্যখণ্ডন বলেন—ঐ লাইনটির 'বধার' শব্দটিকে দু'ভাগে খণ্ডিত করে গাইতেন—বালিরাজার ব—ধার কথা ভাবো না। সব চেয়ে জোর দিতেন ঐ ধার কথাটির উপর। শুনে অনেকেই সঙ্গীতের রস সম্যকরূপে উপভোগ করতেন।

এই যে ছোকরা-জুড়ির গান হতো, এতে আরও নানা রকমের বৈচিত্র্য থাকত। ছোকরাদের দলের একটি ছেলে গানের অন্তরার মধ্যে অকস্মাৎ

উচ্চৈঃস্বরে একটা তান দিলে। তান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন বেহালা-বাজিয়ে সেই তানের সঙ্গে মিলিয়ে বেহালার ছড়িতে টান দিলেন বেহালার তারের উপর। তারপর চললো গাইয়ে বাজিয়ে দুজনেরই তান আর তালের খেলা।

ওস্তাদ জুড়িরা আরও বেশি কসরৎ দেখাতেন সময়ে সময়ে।

তখনকার দিনের সুবিখ্যাত ভূষণ দাসের দল একবার এলো দোলের সময়। তিন দিন যাত্রাভিনয় হ'লো। সে সময় ভূষণ দাসের অভিমন্যুবধ পালার খুবই খ্যাতি ছিল। সেই পালা হ'লো একদিন। উত্তরার অভিনয় দেখে আর করুণ স্বরে তাঁর গান শুনে সেদিন অনেকেই অশ্রুসংবরণ করতে পারেন নি। অভিনয়ের একটা দৃশ্যে ছোকরা-জুড়ির পরিবর্তে স্বয়ং ভূষণ দাস একাই একটি গান গাইতেন। সে-গানের আস্থায়ীটি আমাদের গ্রামাঞ্চলের অনেক লোককে বহুদিন ধরে গাইতে শুনেছি।

অভিমন্যু যুদ্ধে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে ভূষণ দাস গান ধরলেন—

দাদা অভি, কেন যাবি সে ঘোর শ্মশানে।
সে তো যুদ্ধক্ষেত্র নয়, মৃত্যুর আলয়
কত শত হত হয় সেখানে।

ভূষণ দাসের ভাবব্যঞ্জক গান অবিস্মরণীয়।

ভূষণ দাসের ঐ গানটির পর অভিমন্যু ও উত্তরার সংলাপ। সংলাপ-অন্তে অভিমন্যুর রণক্ষেত্র অভিমুখে গমন। তখন উত্তরা তারস্বরে গান ধরলেন—

"ঐ যায়, যায়, যায় রে আমার প্রাণের পাখী।"

শ্রোতাদের সকলেরই চোখে জলধারা। মহিলারা চিকের আড়ালে ছিলেন. তাঁদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

পাখী বলতে প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রার দলের একটি পাখীর কথা মনে পড়লো। পালাটির নাম মনে নেই, কিন্তু ঐ পালায় সাদা রঙের শোলার পাখী দাড়ে বসিয়ে, সেটিকে হাতে নিয়ে একটি ন'-দশ বছরের ফুটফুটে সুন্দর ছেলে ঢুকলো আসরে। নধরকান্তি, পরমসুন্দর ছেলেটি ঐ পাখীটির দিকে চেয়ে কচিকণ্ঠে সুধা বর্ষণ ক'রে গান ধরলে—

বল্ রে, কার তুই পোষা পাখী?
কে তোর পিতা, কে তোর মাতা,
কারে দিয়ে এলি ফাঁকি।

লক্ষ খাঁচা ঘুরে ম'লি,
মরণের ভয় না ঘুচালি
সাধের হরিনামটি ভুলি
কার প্রেমেতে মাথামাথি ?

শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত, নিস্তব্ধ। গান শেষ হ'তেই শ্রোতাদের একজন বললে —'এগিয়ে এসে আবার গাও।' দলের নির্দেশমতো ছেলেটি সেইদিকে গিয়ে পুরো গানটি আবার গাইলো। আবার অন্যদিকে আহ্বান। শেষ পর্যন্ত চিকের অন্তরাল থেকেও প্রতিনিধির দ্বারা অনুরোধ এলো—তাঁদের দিকে এসে গানটি শোনাবার জন্যে। এ অনুরোধও রক্ষা করলে ছেলেটি। শ্রোতারা ছেলেটিকে আর ছাড়তে চায় না। বারংবার গানটি শুনেও তাঁদের শোনার ক্ষুধা মেটে না। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি গান গাইতে গাইতে সাজঘরের দিকে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করলে।

পরের দিন ছেলেটির ডাক এলো জমিদার-বাড়ির অন্দরমহল থেকে। জমিদারদের একজন পদস্থ কর্মচারী যাত্রাদলের অধিকারীর সম্মতি নিয়ে ছেলেটিকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেমানুষ,—সে আনন্দের সঙ্গেই গেল। কিন্তু গেল তো গেলই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, ছেলেটি ফেরে না। জমিদার-বাবুরা অন্তঃপুরে গিয়ে ছাখেন—ছেলেটিকে নিয়ে মহিলাদের মধ্যে আনন্দের হাট বসে গেছে। তাঁদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে—ছেলেটিকে তাঁরা ছেড়ে দেবেন না। ছেলেটি বোধ হয় পিতৃমাতৃহারা দরিদ্র-সন্তান। জমিদার-বাড়ির মহিলাদের কাছ থেকে যে রকম আদর-স্নেহ পেলো, এ-রকমটা জীবনে সে পায় নি। তাইতে সেও এখানে থেকে যেতে রাজী হয়েছে। যাত্রার দলের সঙ্গে ফিরবে না সে।

খবর গেল যাত্রার দলের অধিকারী মশায়ের কাছে। শুনে তিনি প্রমাদ গনলেন। ছুটে গেলেন জমিদারবাবুদের দরবারে। ছেলেটিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কাতর প্রার্থনা করলেন। বৃদ্ধ জমিদার দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয়ের ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফলে যাত্রার দলের ছেলে আবার দলে ফিরে এল।

২১

দোলের মেলা জমিয়ে রাখতো কবি, ঝুমুর ও আলকাপের দল। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ থেকে সব সেরা দল আসতো এই লোকসঙ্গীত গাইতে। দুটি দল কবির মধ্যে লড়াই, কবি ও ঝুমুরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতো বিভিন্ন দিনে। ঝুমুর মেয়েদের নাচগানও হ'তো কোনো কোনো দিন। কবিদের

অথবা কবি ও ঝুমুরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধতো প্রশ্নোত্তর নিয়ে। বেশির ভাগ প্রশ্ন থাকতো পৌরাণিক শাস্ত্রের উপাখ্যান থেকে। শোনা যেতো ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকেই নাকি নানা রকম কূটকচালে প্রশ্ন করতেন এক পক্ষ অপর পক্ষকে। উত্তর দিতে অসমর্থ হলেও তাঁরা সহজে পরাজয় স্বীকার করতেন না। তখন চলতো দুই পক্ষে গালাগালি—খেউড। খেউড় হচ্ছে অশ্লীল গান। ঝুমুরওয়ালীরাও এই খেউড় থেকে রেহাই পেতেন না এবং খেউড়ের উত্তরে এক ধাপ উঁচুতে উঠে খেউড় গাইতে ঝুমুর-মেয়েরাও পশ্চাৎপদ হতেন না। সমবেত শ্রোতারা এই খেউড়গানের রসাস্বাদনেই বেশি পরিতৃপ্তি লাভ করতেন।

আলকাপ ছিল দোলের মেলার একটি বিশেষ আকর্ষক অনুষ্ঠান। প্রতি বছরেই আলকাপ-এর ভালো ভালো দল আসতো মেলায়। আমি সব দলেরই গান শুনেছি। সকলের চেয়ে সেরা আলকাপ-দল ছিল মালদহ জেলার মোনাকষা গ্রামের বোনাকানার। ভালো নামটি বোধ হয় বন্যেশ্বর। একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন বলে তিনি 'বোনাকানা' নামেই সকলের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। বোনাকানার মতো প্রত্যুৎপন্নমতি, সুরসিক অভিনেতা ও গায়ক আর একটিও আমি দেখি নি।

আর একটি আলকাপের দল ছিল আমাদের গ্রামের কাছেই। গঙ্গার পরপারে দিয়াড়ার একটি গ্রামে ছিল এই আলকাপের দল। দলপতির নাম মহেশ দাস। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমি তাঁর রচনাশক্তির বিশেষ অনুরাগী ছিলাম। একেবারে নিরক্ষর ছিলেন তিনি। বর্ণপরিচয়ও ছিল না। অথচ দৃশ্যত এই মূর্খ লোকটি গানের পর গান রচনা করে চলেছেন—পালার পর পালা। হোক তা অশালীন, অমার্জিত বা অশ্লীল—অসামান্য কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেত তাঁর রচনার মধ্যে। তিনি মুখে মুখে রচনা করে যেতেন, কেবল কথাই নয়, সুরও সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর দলের একজন স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর মুখের কথা শুনে শুনে খাতায় লিখে রাখতেন গান বা পালাগুলি। তাঁর কবি-প্রতিভার একটু নমুনা দিই।

কলকাতা অঞ্চলে ক্ষয়ে-যাওয়া শিল-নোড়া কোটাবার জন্যে এক শ্রেণীর হিন্দুস্থানী লোক রাস্তায় রাস্তায় 'শিল কোটাও' বলে যেমন হাঁক ছেড়ে যায়, আমাদের গ্রামাঞ্চলেও এই শ্রেণীর লোক দেখা যেতো মাঝে মাঝে। তাদের সকলে বলতো—জাঁতা-পাটা-কোটা। এই জাঁতা-পাটা-কোটার একটি নাট্য-চিত্র সরস কথা দিয়ে এঁকেছেন নিরক্ষর কবি মহেশ দাস।

গ্রামে একটি বাড়িতে বাস করেন একজন কৃষক ও কৃষক-বধূ। কৃষক জমি-

চাষ করতে মাঠে গেছেন। পথ দিয়ে গান গেয়ে চলেছে জাঁতা-পাটা-কোটা :

হামারা বাড়ি সীতাপাহাড়ী হাম জাঁতাকুটা
তোরা কোই কুটিয়্যা লে, কুটিয়্যা লে পাটা।
এইসা করকে কুটায় দেঙ্গে নেই হোগে মোটা,
তোরা কোই কুটিয়্যা লে পাটা।

বাড়ির ভিতর থেকে কৃষক-বধূ বেরিয়ে এসে জাঁতা-পাটা-কোটাকে উদ্দেশ করে বলছেন—

এস হে হামি পাটা কুটাবো এস হামার বাড়িতে,
হামার ধার নাই পাটাতে।
চিকন হোয়্যা গেলছে পাটা হলোদ-বাঁটাতে,
এস হামার বাড়িতে।
হামার ধার নাই পাটাতে॥

জাঁতা-পাটাকোটা :

পাটা আনতাই বাহারমে, তব্ তো হাম কুটায় দেঙ্গে,
এইসা করকে কুটায় দেঙ্গে আটঠো পাইস্যা লেঙ্গে।
হ্যমারা হোগে যাহোক ভালা,
ছোড়েঙ্গে নেই এক আধেলা,
চারঠো ভাত খাঙ্গে দেউঙ্গে ভালা,
মায় জাতে ছোটা।

কৃষক-বধূ :

ছেয়ের পাটা এম্‌নি ভারি, আনতে পারি কি না পারি,
কাজ কি হামার বাহিরে এন্যা, এসো ভিতর-বাড়ি।
হামি একে তো দোজেয়্যা নারী,
তাইতে মনে আতং করি,
মড়া যদি এস্যা যায় বাড়ি
হবে মার খেতে।

এমন সময় মাঠ থেকে কৃষকের প্রত্যাবর্তন।

বাড়ির সম্মুখের জাঁতা-পাটা-কোটার ঝোলাঝুলি দেখে কৃষক বিস্মিত।

কৃষকের উক্তি :

আসছি হাল বাহিয়্যা সড়ক দিয়্যা
শুনতে পাওয়া যায়।

বাড়িতে গোল বা কিসের হয় !
আওয়াজ শুনতে পাছি গলার,
ঝোলাঝাপটা ই কুন শালার ?
(জাঁতা-পাটা-কোটার প্রবেশ। তার উদ্দেশে)
বেশ দোকান লাগালছিস্ শালা
তুলসীবিহার ম্যালার।
হামার হাথে কি দেখিসনি পায়ন্যা,
বেঢ়িয়্যা শালার জান থুবো না,
তোর কুন বাপ আছে তা জানো না,
কার পাটা কুটায়,
ই শালা কার পাটা কুটায়।

জাঁতা-পাটা-কোটা :

হাম্ যাতেৎ হেঁ রাস্তা ধরকে, তেরে রাণ্ডি মেরে বোলাকে
ঝক্ মারো ম্যয় এইসা কামকে পাইস্যা দে মোর ফেক্‌কে
ঝট্‌পট দে ভাই, হাম চলে যাঁউ,
বেশি বোলো মাৎ, গিরে তেরে পাঁউ,
মেরে কৌড়ি দে জল্‌দিসে
মাৎ করো লেঠা।

কৃষক :

শালার মেরা্যা দুতিন লাথ,
শালার ভেঙ্গ্যা দিব দাঁত,
শালাকে জন্মের মতো একেবারে কোর‌্যা দিব সাফ্।
লজ্জা নাই লাথকুচ্চা শালার,
পাইস্যা কিসের চাহিস আবার,
কোরবো শালার বিস্তি কাবার
যাতে লিক্যাস হয়,
শালা যাতে লিক্যাস হয়।

কৃষক-বধূ :

পতি হও হে বুদ্ধিনাশা,
ঘরে লাগাও কুন তামাসা,
উচিত কাম কর‌্যাছে উ কি
পাবে নাখো পাইস্যা।

পতি তুমি কি সুদ জানো বাড়ির,
হলোদ বাঁটতে কাঁইত্যা মরি,
হ্যাও দু'আনা গুন্যা কড়ি।
কয় মহেশ নাথে।

লক্ষ্য করবার বিষয়—তিনটি চরিত্রের মুখে তিনটি ভিন্ন গানের সমীকরণ হয়েছে একটি গানের কাঠামোতে। আমি আজ পর্যন্ত কোন নাট্যকারের নাটকীয় দৃশ্যে এ-রকম অভূতপূর্ব টেক্‌নিকে এ ধরনের ত্রয়ী (trio) গান আজ পর্যন্ত শুনি নি বা দেখি নি।

২৩

কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানের এগ্‌জিবিশনে একবার একটি যমজ সন্তান দেখেছিলাম। দুইটি সম্পূর্ণ মানব-দেহ। কিন্তু স্বতন্ত্র নয়। পিঠের দিকের কিছু অংশ অবিচ্ছিন্ন ভাবে জোড়া। দুই দেহের মেরুদণ্ড দুটি। কিন্তু মাঝখানের খানিকটা অংশ পরস্পরে সংযুক্ত। কাজেই ওঠা, বসা, চলা—সব কিছুই উভয়ের সহায়তাসাপেক্ষ।

আমাদের জগতাই-নিমতিতাও ঠিক এই যমজসন্তান দুটির মত অন্যোন্য-নির্ভর। জগতাই-এর রাধিকালাল চৌধুরী নিমতিতার জমিদারবাবুদের অন্যতম প্রধান অমাত্য। জগতাই-এর পরম বৈষ্ণব পণ্ডিত প্রভুপাদ হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ নিমতিতার জমিদারদের পরিবারবর্গের অন্যতম দীক্ষাগুরু। জগতাই-এর প্রফুল্লনাথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র নিয়োগী, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিমতিতার স্কুলের শিক্ষক। জগতাই-এর বহু ব্যক্তি নিমতিতা হিন্দু থিয়েটারের অভিনেতা,—এঁদের কথা আগেই বলেছি। পক্ষান্তরে নিমতিতার জমিদারীর সদরে ও মফঃস্বলে চাকরি ক'রে জগতাই-এর অনেকের অন্নসংস্থান। নিমতিতার জমিদারদের অর্থানুকূল্যে জগতাই-এর বহু দায়গ্রস্ত ব্যক্তির সাময়িক দায়মুক্তি। বিভিন্ন কারণে বিরোধ বাধলে বিবদমান ব্যক্তিদের মধ্যস্থ হয়ে নিমতিতার জমিদারবাবুদের অপক্ষপাত নিষ্পত্তি। বিপদে-আপদে, অভাবে-অভিযোগে নিমতিতার জমিদারবাবুরা জগতাইবাসীদের আশাভরসাস্থল।

সেকালে জগতাই-এর সাধারণ অধিবাসীদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থা সর্বদা সচ্ছল ছিল না। এখনকার কালের হিসাবে অনেকেই হয়ত মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু এখনকার নিরিখে সেকালের অবস্থার পরিমাপ করলে হিসাবে ভুল হবে। আমি আমার নিজেদের সাংসারিক অবস্থার কথাই বলি। এখন উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, ও বিত্তহীন—এই তিনটি শ্রেণী নিয়ে আমাদের সাধারণ ভদ্রসমাজ। সেকালে আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল ত্রিশ বিঘা দোফসলা জমি, আম-কাঁঠালের বাগান, পাঁচ-ছয়খানা বাঁশের ঝাড়, বাড়ির এলাকা ছ-সাত বিঘা—তার এক প্রান্তে ২০।২৫ ঘর প্রজা-বসত। একালের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আমরা আদৌ নিম্নবিত্ত ছিলাম না। স্বচ্ছন্দে মধ্যবিত্ত বলা যায়। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। সেকালে মধ্যবিত্ত তাঁরাই ছিলেন, যাঁরা কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। আমার বাবার বাইরের উপার্জন বড় একটা ছিল না। অল্পকালই তিনি চাকরি করেছেন। বাইরে থেকে অর্থাগম না হলে কেবলমাত্র জমিজায়গার উপর নির্ভর ক'রে থাকলে সব সময় অবস্থা সচ্ছল থাকতো না। জমির ফসলই হোক অথবা বাগানের ফলই হোক, সব-কিছুরই উৎপাদন নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর। যে-বছর যথাসময়ে বৃষ্টি হ'লো না কিম্বা অনাবৃষ্টি দেখা গেল —সে-বছর সংসারযাত্রা-নির্বাহের জন্যে গৃহস্থকে ছুটতে হ'তো মহাজনের কাছে হ্যাণ্ড নোট বা রেহানী তমস্থক লিখে ঋণের ব্যবস্থা করতে। পর পর দু'তিন বছর এই রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে সুদের অঙ্ক চক্রবৃদ্ধির হারে বাড়তে বাড়তে ঋণের মূল টাকা বহুগুণিত হয়ে গৃহস্থকে নিঃসম্বল অবস্থায় পরিণত করতো। এইরূপ ভাগ্যবিপর্যয়ের হাত থেকে আমি কিভাবে রক্ষা পেয়েছিলাম, সে-কথা পরে বলবো।

এর উল্টোদিকের কথাও বলি। পরবর্তীকালের স্বনামখ্যাত শিল্পী ক্ষিতীন্দ্র-নাথ মজুমদারের কথা। সে-সময় ক্ষিতীনদের কিছুমাত্র ভূসম্পত্তি ছিল না। ছিল মাত্র বাড়ি-সংলগ্ন আমবাগান। কিন্তু ক্ষিতীনের বাবা কেদারনাথ মজুমদারের বাইরের অর্থাগম ছিল। কেদারবাবু সাব্‌রেজিস্ট্রার ছিলেন। তাঁর মাসিক আয় দেড়শ'-দুশ' টাকার বেশি ছিল না। এই টাকা সম্বল ক'রে তিনি তাঁর দুটি ছেলেকে বিদেশে রেখে পড়িয়েছেন। তাঁর বাড়িতে প্রতি বৎসর প্রতিমা গড়িয়ে দুর্গাপূজা করেছেন। তাঁর নিজের শখের যাত্রার দলের যাবতীয় ব্যয়ভার একা বহন করেছেন। এই দেড়শ'-দুশ' টাকা আয়ের ভূসম্পত্তিহীন কেদারবাবু ছিলেন আমাদের জগতাই গ্রামের অন্যতম বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ।

তখন টাকার দাম ছিল, জমির দাম ছিল না। এখন টাকার দাম ক'মে গেছে, জমির দামই বেশি।

২৪

জগতাইও গণ্ডগ্রাম। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস। শিক্ষিত ব্যক্তিরও অসদ্ভাব নেই। প্রায় সকলেই বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। গ্রামের পণ্ডিত হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামীর কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে বলেছি। হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী আমাদের গ্রামের জনসাধারণের কাছে 'হারান ঠাকুর' নামে আখ্যাত ছিলেন। সুদর্শন, সুকণ্ঠ এই সুপণ্ডিত ব্যক্তি গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। একটা সহজাত আভিজাত্য ছিল তাঁর মধ্যে। বাড়িতে শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহের ত্রিসন্ধ্যা পূজা, আরাত্রিক প্রভৃতি অনুষ্ঠান তিনি স্বয়ং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। গ্রামবাসীদের অনেকে তাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিল বটে কিন্তু গ্রামের কোন তরুণ তাঁর পাণ্ডিত্যের সুযোগ গ্রহণ করেন নি। সৌভাগ্যবশে আমি কিছুদিন তাঁর কাছে সারস্বত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলাম। বোধ হয় তাঁর দ্বিতীয় ছাত্র ছিল না। নিমতিতার জমিদারবাবুরা মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপে হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর অনুমোদন গ্রহণ করতেন। নিয়মসেবার কীর্তন-সম্প্রদায়ের নির্বাচনও ছিল হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামীর অনুমোদন-সাপেক্ষ।

প্রতি বৎসর পুরো বৈশাখ মাস সন্ধ্যাকালে হরিনাম-সংকীর্তন গ্রাম-পরিক্রমা করত। এই কীর্তনসম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কেদারনাথ মজুমদার। ক্ষিতীনেরও কীর্তনে অনুরাগ এই সময় থেকেই। কোন সন্ধ্যাতেই ক্ষিতীন অনুপস্থিত থাকতো না। ক্ষিতীনদের বাড়ি থেকেই নামসংকীর্তন গ্রাম-পরিক্রমায় বেরোতো। মধ্যপথে হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামীর শ্রীরাধাবল্লভজীর মন্দিরে এবং গ্রাম-প্রান্তে নিত্যগোপাল অধিকারী মহাশয়ের বাড়ির বিগ্রহ-মন্দিরে কিছুক্ষণ গান গেয়ে কীর্তনের দল ফিরে আসত কেদারবাবুর বাড়িতে। অধিকাংশ দিনই এই কীর্তনের দলে মূল-গায়েন থাকতেন হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী। তাঁর অনুপস্থিতিতে মূল-গায়েন হ'তেন স্বয়ং কেদারনাথ মজুমদার। ইতরভদ্রনির্বিশেষে গ্রামের সকল শ্রেণীর লোকেরাই যোগ দিতেন এই কীর্তনের দলে। সুন্দর খোল বাজাতেন হরিগোপাল সরকার, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ছিল গোপেশ্বর মিস্ত্রির আর গোরাচাঁদ ঘোষের।

ঐ কেদারনাথ মজুমদারের বাড়িতেই প্রতি একাদশী তিথিতে হরিবাসরের অধিবেশন হ'তো। এখানে হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ভাগবত পাঠ করতেন। তাঁর সুললিত সুরেলা কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোকগুলির আবৃত্তি যেমন সুমধুর শোনাতো, তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাও হ'তো তেমনি উপভোগ্য।

নিমতিতার জমিদারবাড়ির মতো সমারোহপূর্ণ না হ'লেও আমাদের গ্রামেও দুর্গাপূজা হ'তো দুটি বাড়িতে। স্থানীয় জমিদার প্রাণবন্ধু চৌধুরী ও সাব রেজিস্ট্রার কেদারনাথ মজুমদারের বাড়িতে প্রতি বৎসরেই দুর্গাপূজা হ'তো। দহরপাড় গ্রামের একজন কারিগর জমিদারবাড়ির প্রতিমা গড়তেন আর কেদার-বাবুর বাড়ির প্রতিমা গড়তেন নিমতিতার জমিদার-বাড়ির প্রতিমানির্মাতা কৃষ্ণনগরের কারিগরটি।

একবার ক্ষিতীন নিজে গড়েছিল তাদের বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা। ক্ষিতীন তখন কলকাতায় ইণ্ডিয়ান স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের শিক্ষক। প্রতি বৎসরই পূজোর সময় বাড়িতে আসে। একবার এসে নিজেই প্রতিমা গড়বার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সে চিত্রাঙ্কনশিল্পী। প্রতিমা গড়বার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তার। কিন্তু একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সে বিগ্রহগুলি গ'ড়ে তুললো। চালচিত্র আঁকলো সে ভারতীয় চিত্রকলার ধারায়। কেবল প্রতিমা গড়াই নয়, পূজাপীঠে দেবীপ্রতিমার সম্মুখে সর্বতোভদ্র পর্যন্ত আঁকলো সে। ষষ্ঠীপূজার দিন থেকে মহানবমীর দিন পর্যন্ত অনলস কর্মযোগীর মতো অচঞ্চল চিত্তে ক্ষিতীন সব কয়টি অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ক'রে এসেছে। কিন্তু বিজয়াদশমীর দিন সে-ক্ষিতীন আর নেই। নিজের হাতে গড়া তার মানস-প্রতিমাকে বিসর্জন দিতে সে আত্মহারা হয়ে পড়লো। অবিরাম অশ্রুধারা ; যেন সন্তান-শোকাতুর পিতা। ক্ষিতীনকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে প্রতিমা-নিরঞ্জন সম্ভব হ'লো সেদিন।

স্থানীয় জমিদার প্রাণবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ির প্রতিমাটি হ'তো আমাদের ঐতিহ্যগত চিরাচরিত রীতিতে গড়া : পান-পাতার আকারের মুখ-মণ্ডল, টানাটানা চোখ, তাতে জয়োল্লসিত দৃষ্টি। এ বাড়িতেও ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বাদ্যের অপ্রতুল ছিল না। এখানকার পূজামণ্ডপেও যথেষ্ট জনসমাগম হ'তো।

ক্ষিতীনদের বাড়ির পূজায় শখের যাত্রাভিনয় হ'তো দু'দিন—মহাষ্টমী ও মহানবমীর দিনে।

দুর্গাপূজা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই আনন্দের অনুষ্ঠান। সমগ্র অঞ্চল জুড়েই মহোৎসবের উদ্দীপনা।

বিজয়াদশমীর সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে পূজনীয়দের প্রণাম ও কোলাকুলির ঘটা। আমাদের কাছে তখন কোলাকুলিটা নিতান্তই গৌণ, মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে মিষ্টিমুখ। পূজোর সময় নানা রকমের নাড়ু হ'তো প্রতি বাড়িতেই। নার-কেলের নাড়ু মিলতো প্রায় সব জায়গাতেই। তাইতেই পেট ভরিয়ে আমরা

বাড়ি ফিরতাম। বিজয়ার দিন একটি বিশেষ পানীয় ছিল আমাদের অবশ্য গ্রহণীয়। সে বস্তুটি হচ্ছে—সিদ্ধি অর্থাৎ ভাঙ-এর সরবত। এখন দোকান থেকে সিদ্ধি কিনতে হয়। দোকানদারকে সিদ্ধি-বিক্রির জন্যে সরকারের আবগারি দপ্তর থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। আমাদের সেকালে এ-সব হাঙ্গামা ছিল না। আমাদের বাড়িতেই সিদ্ধিগাছের বন ছিল। সিদ্ধির পাতা শুকিয়ে সারা বছরের ব্যবহারের জন্যে প্রতি বাড়িতেই সঞ্চয় ক'রে রাখা হ'তো। পালেপার্বণে এই সিদ্ধির সদ্ব্যবহার হ'তো মহা উৎসাহে। সিদ্ধি মাদক দ্রব্য হ'লেও এবং মাত্রাতিরিক্ত খেলে নেশা জন্মালেও বিজয়াদশমীর দিনে প্রায় সকল ভদ্রসন্তানই সিদ্ধি পান করতেন। মহিলারা—যাঁরা পান না করতেন—সিদ্ধির সরবতের পাত্রে একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে জিহ্বায় স্পর্শ করাতেন। আমি এবং আমার সমবয়সী বন্ধুরা সেই ছেলেবেলাতেই সিদ্ধির নেশায় অভ্যস্ত হয়েছিলাম।

বিজয়াদশমীর পরে স্বল্পকালের ব্যবধানে পর পর আরো কয়েকটি উৎসব-অনুষ্ঠান হ'তো।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। লক্ষ্মীপূজাতেও সেই লাড্ডু-বৈচিত্র্য। নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, মুড়ির নাড়ু, চিঁড়ের নাড়ু। আর একটা অদ্ভুত খাদ্যদ্রব্য হ'তো—নারকেলের চিঁড়ে। নারকেলের চিঁড়ের ওস্তাদ কারিগর ছিলেন আমার মা। ঝরঝরে শুকনো চিঁড়ে। নারকেল ফালাফালা ক'রে কেটে, তার ধার শিলে ঘষে, বঁটিতে চিঁড়ের আকারে কেটে, তারপর ঘিয়ে ভেজে, চিনির পাতলা রসে ফেলা হ'তো। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সূক্ষ্ম শিল্পবোধ থাকতো মনে হয়। আমি তন্ময় হয়ে মায়ের এই নারকেলের চিঁড়ে তৈরি দেখতাম।

লক্ষ্মীপূজা হ'তো গ্রামের প্রায় প্রতি বাড়িতেই। লক্ষ্মীর প্রতিমা গ'ড়ে পূজা নয়—বাড়িতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি থাকতো, তারই পূজা। মাত্র একজন পুরোহিত গ্রামের সমস্ত বাড়িতে গিয়ে ঝাঁপির উপর দুটি ফুল ফেলে, অস্পষ্ট উচ্চারণে দু'চারটে সংস্কৃত শব্দ ব'লে শাঁখ বাজিয়ে দক্ষিণা নিয়ে চ'লে যেতেন।

লক্ষ্মীপূজার পরেই কালীপূজা। গ্রামের উত্তর প্রান্তে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় কালীর 'থান' ছিল। এইখানে হ'তো কালীপূজা। যথারীতি প্রতিমা গড়িয়ে পূজা হ'তো এই অশ্বত্থতলায়। কিন্তু ছাগবলি হ'তো না,—হ'তো কুমড়ো-বলি। বৈষ্ণবপ্রধান গ্রাম ব'লেই বোধ হয় এই অহিংস বলিদানের ব্যবস্থা।

আমাদের কালীপূজার আনন্দ 'উঁকাউঁকি' খেলায়।

এই উঁকাউঁকি খেলাটা একটু বুঝিয়ে বলি। শুকনো পাটকাঠির (কলকাতার ভাষায় 'প্যাকাটি') ছোট ছোট আঁটি বেঁধে যে লম্ববান বস্তু তৈরী হয়, তার

নাম উঁকা। এই উঁকার এক প্রান্তে আগুন জ্বালিয়ে তাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগুন নিয়ে খেলার নাম উঁকাউঁকি খেলা।

আর ছিল হাউই-বাজির খেলা। কুমোররা এই মাটির হাউই তৈরি করতো। ভিতর-ফাঁপা বলের মতো। বলের গায়ে ছোট ছোট ফুটো। তার মধ্যে ঠেসে বারুদ পোরা হ'তো। একটা লম্বা দড়ির মাঝখানটিতে একটি ছোট্ট জালি বসিয়ে তার ওপর রাখা হ'তো ঐ হাউইটিকে। তারপর হাউই-এর মধ্যে আগুন দিয়ে দড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সেটিকে ছুঁড়ে দেওয়া হ'তো আকাশে। হাউই আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে আকাশে উঠে প'ড়ে যেত মাটিতে। বেশ শক্তিশালী ছিল এই দড়ির রকেট।

কালীপূজার মাসখানেক পরেই নবান্ন। নতুন ধানের আতপ চালে নবান্ন হ'তো প্রতি বাড়িতে। নতুন চাল, কলা, আখ একত্র ক'রে মেখে ইষ্টদেবতার কাছে নিবেদন ক'রে প্রসাদে পরিণত করা হ'তো। এই প্রসাদ সর্বপ্রথম পরিবেশন করা হ'তো কাকপক্ষীদের। তারপর অপরের প্রাপ্য।

রাত্রে রান্নার ঘনঘটা। এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন—এটা সেদিন প্রবচন মাত্র নয়, —বাস্তব সত্য। ব্যঞ্জন-বৈচিত্র্যের যেন প্রতিযোগিতা প'ড়ে যেত গ্রামের মধ্যে।

অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন-উৎসবের পরেই পৌষ মাসের শুভাগমন। পৌষ মাসের গোড়াতেই আমাদের আরম্ভ হতো শাঁকবোল গাওয়া। শাঁকবোল হচ্ছে এক রকমের ছড়া কবিতা। কে যে কোন্ কালে এ-সব ছড়া রচনা করেছিল, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। স্মরণে থাকলে একটু নমুনা দিতাম। আমরা এই শাঁকবোল গাইতাম সন্ধ্যার পর বাড়ি-বাড়ি গিয়ে। মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতি বাড়ি থেকে কিছু অর্থ বা কিছু চাল-ডাল সংগ্রহ ক'রে, পৌষল্লা করা হ'তো কোনো ফাঁকা জায়গায় অথবা গঙ্গার ধারে। পৌষল্লা হচ্ছে বনভোজনের নামান্তর।

পৌষ-সংক্রান্তিতে পুলিপিঠের আয়োজন। পৌষ সংক্রান্তির আরেক নাম তিলুয়া সংক্রান্তি। কলকাতার বীরখণ্ডি, আমাদের দেশে তিলুয়া।

পৌষ সংক্রান্তিতে গৃহজাত মিষ্টান্নের সমারোহ: পুলি পিঠে, পাটিসাপ্টা, রসবড়া, মুগসাঁওলি, গোকুলপিঠে, আসকে—আরও কত কি। জানি না, আমাদের গ্রামাঞ্চলের আধুনিক গৃহিণীরা পৌষ সংক্রান্তিতে এ-সব খাদ্যবস্তু তৈরি করেন কিনা।

তারপরেই মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা। সরস্বতী পূজায় অঞ্জলি দেওয়া একটি

অবশ্যকর্তব্য কর্ম ছিল আমাদের।

একবার আমরা আমাদের জগতাই গ্রামে বারোয়ারি সরস্বতী পূজা করেছিলাম। এখনকার কালে বারোয়ারির পোশাকী নাম হয়েছে সার্বজনীন।

আমরা কয়েকজন প্রথমেই চাঁদার খাতা নিয়ে হাজির হলাম নিমতিতার জমিদার-বাড়িতে। মহেন্দ্রবাবু আমাদের নানা প্রশ্ন করে খাতায় তাঁর নামের পাশে পাঁচ টাকার অঙ্ক লিখে দিলেন। আমরাও ঐ রকমই আশা করেছিলাম। তারপর গেলাম কালীবাবুর কাছে। কালীবাবু জানতে চাইলেন, গান-বাজনা কিছু হবে কিনা। আমাদের ইচ্ছা ছিল—যদি ভালো রকম চাঁদা ওঠে, তাহ'লে অনুকূল দাসের কৃষ্ণযাত্রা করাবার। কালীবাবুকে এ-কথা বলতেই তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন—"তোমরা কৃষ্ণযাত্রার ব্যবস্থা করো, যা খরচ হয় আমি দেবো।"

একালের লোকেরা কৃষ্ণযাত্রার কথা হয়তো শোনেই নি। কৃষ্ণযাত্রার আর এক নাম ছিল কালীয়দমন যাত্রা। এককালে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার খুব নামডাক ছিল। আমরা তাঁর কৃষ্ণযাত্রা দেখিনি। তবে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার 'বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের'—শুকসারী-সংবাদের গানটি তখন খুবই চালু ছিল আমাদের গ্রামাঞ্চলে। আমাদের কালে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণযাত্রার খুব খ্যাতি ছিল। নীলকণ্ঠের অনেক গান এখনও আমার মনে আছে। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রার গানের খুব সুখ্যাতি করেছেন, এ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে।

কৃষ্ণযাত্রায় কথার চেয়ে গানই বেশি। প্রধান চরিত্র তিনটি—কৃষ্ণ, রাধা ও বৃন্দা। অনুকূল দাস বেশ সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। গানের সংখ্যা বেশি ছিল ব'লে স্বয়ং অনুকূল দাস বৃন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন।

অনুকূল দাসের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। আখড়াবাসী বৈরাগী ছিলেন তিনি। কালো রং, লম্বা দেহ, সুপুষ্ট গোঁফ ও লম্বমান দাড়ি, গলায় মোটা দানার তুলসীমালা, পরনে আগুল্‌ফলম্বিত গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। এই বেশে তিনি এক হাতে একতারা, অন্য হাতে খঞ্জনি এবং দুটি পায়ে নূপুর প'রে তিনি পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে জীবিকানির্বাহ করতেন। গান গাইতেন মাটিতে ব'সে। পা দুটি সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতেন। সেই নূপুর-পরা পায়ে তাল দিতেন, তাতে নাচের আওয়াজের আমেজ ফুটে উঠতো। সুর দিতেন ডান হাতের একতারায়। আর বাঁ হাতের খঞ্জনিটি ঐ হাতের বাহুমূলের উপরকার হাড়ের চামড়ায় ঠুকে ঠুকে বোল তুলতেন। যেমন গানে, তেমনি বাজনায়—সর্বগুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

সরস্বতী পূজায় অনুকূল দাসের কৃষ্ণযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা কালীবাবুকে এ কথা জানিয়েছি। তিনি আসবেন বলেছেন। আমরা পূজা-মণ্ডপে তাঁর জন্যে বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

সন্ধ্যারতির পর যাত্রা আরম্ভ হ'লো। আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরে কালীবাবু এলেন। তখন বৃন্দার ভূমিকায় নেমে অনুকূল দাস গান গাইছেন।

কালীবাবু চেয়ারে বসামাত্র তাঁর দিকে ফিরে নারীসুলভ অঙ্গভঙ্গী ক'রে অনুকূল দাস গানের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন। অন্য শ্রোতাদের দিকে দৃকপাতও নেই। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য কালীবাবু। বেশ কিছুক্ষণ পরে গানটি শেষ হলো।

কালীবাবু আঙ্গুলের ইশারায় অনুকূল দাসকে কাছে ডাকলেন।

অনুকূল দাস ভাবলেন—বাবু গান শুনে খুশী হয়েছেন, কিছু বকশিশ মিলবে হয়তো।

উৎসাহভরে তিনি কালীবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন।

কালীবাবু ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে অনুকূল দাসকে বললেন—"মেয়েছেলের পার্ট করছো, শাড়ী পরেছো,—দাড়ি-গোঁফ কামাও নি কেন?"

অনুকূল দাস কাতরোক্তি করলেন—"এ দাড়ি-গোঁফ মহাপ্রভুর নামে উচ্ছুগ্যু করা, বাবু!"

মিনিট পাঁচেক থেকে কালীবাবু চলে গেলেন।

সরস্বতী পূজার পরেই দোলযাত্রা। নিমতিতা জমিদার-বাড়ির দোলযাত্রাই জগতাইবাসীরও দোলযাত্রার উৎসব।

দোলযাত্রার পর চৈত্র মাসের চড়কপূজার অনুষ্ঠান। চড়কপূজা আমাদের গ্রামাঞ্চলে ছিল না। কিন্তু গাজনের সন্ন্যাসীদের ক্রিয়াকলাপ ছিল। গাজনের সন্ন্যাসীদের আমরা বলতাম ভক্ত। এই ভক্তেরা রঙিন কাপড় প'রে ছাই মেখে শিবভক্তের বেশে শিবঠাকুরের গান গাইতো নেচে নেচে, সঙ্গত চলতো ঢাকের। যাঁদের কাছে দু'পয়সা মেলবার সম্ভাবনা থাকতো, তাঁদের বাড়িতেই এই ভক্তের দল উপস্থিত হ'তো। আমরাও ঘুরতাম তাদের সঙ্গে ভক্তের নাচ দেখবার জন্যে।

আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন ছিল চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনটি। এই দিনটিকে আমরা বলতাম ছাতু-সংক্রান্তি। যবের ছাতু আর ছোলার ছাতুর সমারোহ সেই দিনটিতে। যবের ছাতুর মধ্যে কোনো অসাধারণত্ব থাকতো না, কিন্তু ছোলার ছাতুর আভিজাত্য ছিল। যবের ছাতুর মধ্যে গুড়ের গরীবিয়ানা ছিল কিন্তু ছোলার ছাতু গাওয়া ঘি আর চিনির ঐশ্বর্যে গৌরবান্বিত ও গর্বিত।

২৫

এ-সব আনন্দোৎসব ছাড়া আরও অনেক রকমের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ছিল সারা বছর জুড়ে। কোনো কোনো বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা হ'তো। পূজার পর সত্যনারায়ণের কথা অর্থাৎ কাহিনী। সে এক অপূর্ব কাব্য। পয়ার ত্রিপদী ছন্দে গাঁথা। পূর্ণিমা তিথিতে সত্যনারায়ণের পূজা। এ পূজায় মেয়েরাই অগ্রণী হতেন।

মেয়েদের আরও অনেক অনুষ্ঠান হ'তো। অনেক রকমের ষষ্ঠী, অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ মঙ্গলবার নির্দিষ্ট ছিল তাঁদের সন্তানদের শুভকামনার জন্যে। কুমারী মেয়েরা শিবরাত্রির দিন গুনতো। বিধবাদের বিশেষ পালনীয় দিন ছিল অম্বুবাচীতে।

এই সব বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়া আমরা চৌর্যবৃত্তি পালন করতাম ভাদ্র মাসের একটি দিনে—যেদিনের চাঁদ নষ্টচন্দ্র। আমাদের গ্রামাঞ্চলে ঐ নষ্টচন্দ্রের রাত্রিতে চুরি করার একটা অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল। চুরি-করা জিনিস ভোগ করবার জন্যে চুরি নয় বরং সেগুলিকে নষ্ট ক'রে ফেলাতেই চুরির সার্থকতা। লোকের টাকাপয়সা জিনিসপত্র চুরি নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর গাছ থেকে ফলফলারি চুরি করা। এ রাত্রিটিতে গৃহস্থও সতর্ক থাকতেন পাছে তাঁর বাড়ির কলামূলো চুরি যায়। আমাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল কলার কাঁদি। আমরা কাঁদিসুদ্ধ কলা চুরি ক'রে সেগুলোকে কুচি কুচি ক'রে কেটে রাস্তাময় ছড়িয়ে দিতাম। এতেই আমাদের আনন্দ। কিন্তু কাজটা সহজসাধ্য ছিল না। গৃহস্থ রাত্রি জেগে বাড়িতে ব'সে পাহারা দিচ্ছেন, এই অবস্থায় তাঁর বাগানে ঢুকে কলার কাঁদি কেটে নিয়ে যাওয়া দুঃসাহসিক কাজ। কিন্তু বুদ্ধি খরচ করে নানা কৌশলে এ কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হ'তো। বিনিদ্র হয়ে রাত্রিযাপন ক'রে পাহারা দিয়েও পরদিন প্রভাতে গৃহস্থ বাগানে গিয়ে দেখতেন—কলাগাছ ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে —নেই কেবল কাঁদিটি। ব্যাপারটি ঘটতো সহজ উপায়েই। দু'চারজন ব্যথার ব্যথী সেজে গৃহস্বামীর কাছে যেত, তাদের গাছও তারা পাহারা দিচ্ছে এই ভাব দেখিয়ে। তারপর নানান গল্প ফেঁদে তারা গৃহস্বামীকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করতো, এরই মধ্যে নিঃশব্দে তিনজন বাগানে ঢুকতো। একজনের কাঁধে আরেক-জন উঠে কাঁদিটি কেটে অপেক্ষমাণ আরেকজনের হাতে পৌঁছে দিত। তখনও গৃহস্বামীর সঙ্গে আমাদের দলের লোকের গল্প চলছে।

কিন্তু একবার এই নষ্টচন্দ্রের রাত্রিতে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

নিমন্তিতার একটি বৈষ্ণবসন্তান—নাম গোপাল, বয়স ষোলো-সতেরোর বেশি নয়—নষ্টচন্দ্রের রাত্রিতে একটি বাগানে চুরি করতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেল। তার অভিভাবকেরা কোনো রকম চিকিৎসা বা ওঝার ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করবারও সময় পেলেন না।

২৬

আমাদের গ্রামাঞ্চলে মন্ত্রশক্তির দ্বারা চোর ধরা, ভূত-ছাড়ানো, সাপের বিষ নামানোর একাধিক ওঝা ছিল সেকালে। ওঝাকে বলা হ'তো গুণী।

এক শ্রেণীর গুণী ছিলেন, তাঁরা বাটি চেলে চোর ধ'রতেন। আমি বাটি-চালা দেখেছি কিন্তু চোর ধরা পড়তে দেখি নি। আমাদেরই জগতাই গ্রামে বাটি-চালা হ'লো একবার। একটি বাড়িতে চুরি হওয়াতে বাটি-চালানোর গুণী এলেন চোর ধরতে। যে-ঘরে চুরি হয়েছে সেই ঘরের মেঝেয় গুণী একটি ছোট বাটি রাখলেন। আমাদেরই গ্রামের একজন মেঝের উপর ব'সে গুণীর নির্দেশমতো ডান হাতের চেটো দিয়ে বাটির মুখটি ঢেকে দিলেন। গুণী ঐ ভদ্রলোকের হাতের উপর হাত রেখে কয়েক মিনিট বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র প'ড়ে হাত তুলে নিলেন। বাটি চলতে আরম্ভ করলো। এখনকার পুলিসের কুকুর যেমন চোরের পায়ের চিহ্ন বা গন্ধ শুঁকে আসামী ধরতে যায়, বাটিও যেন তেমনি চোরের পায়ের গন্ধ অনুসরণ ক'রে চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে বাটি আর এগোল না—স্থির হয়ে রইল। চোর ধরা পড়লো না।

যিনি বাটি ধরে ছিলেন, তিনি আমাদের গ্রামেরই লোক, সকলেরই সুপরিচিত ব্যক্তি এবং ঐ গুণীর সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি বললেন—হাতের তেলো দিয়ে বাটির মুখ ঢেকে রাখা ছাড়া তিনি বাটি-চালানোর কোনও চেষ্টা করেন নি। বাটিই তাঁকে চালিয়েছে।

ভূত-ছাড়ানোও দেখেছি। স্ত্রীলোক ছাড়া কোন পুরুষমানুষকে ভূতে ধরেছে—এমন একটিও চোখে পড়ে নি। যার উপর ভূতে ভর করেছে, তার মুখ দিয়ে ভূত অনর্গল ভালো মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল নানা কথা বলে চলেছে। ভূতের গুণী আনানো হ'লো। গুণী মন্ত্র আউড়িয়ে ভূতকে চড়চাপড় মেরে ভাগিয়ে দিয়ে ধার্য দক্ষিণা নিয়ে চলে গেলেন। অবশ্য ভূত-ভাগানোর জন্যে ঘণ্টা তিনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাঁকে।

সবই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা। কিন্তু মন্ত্রবলে সাপের বিষ নামানোতে একটি ক্ষেত্রে অবিশ্বাস করার কোনও উপায় ছিল না। আমার বাড়িরই ঘটনা।

একদিন ভোরবেলায় আমার মাসীমাকে সাপে কামড়ালো। চেঁচামেচিতে বাড়ির লোকজন ও পাশের প্রতিবেশী লোকেরা সব ছুটে এল। মাসীমা থরথর ক'রে কাঁপছেন। পাশের বাড়ির এক ব্যক্তি কোথা থেকে দড়ি সংগ্রহ ক'রে মাসীমার মণিবন্ধে, কনুই-এর কাছে এবং বাহুতে—তিন জায়গায় শক্ত ক'রে বেঁধে দিলেন। সাপ ছোবল দিয়েছিল মাসীমার দুটি আঙুলের মাঝখানের গোড়ার দিকে। মাসীমা সুস্থই আছেন—ভয়ের ভাবও অনেকটা কেটে গেছে। এমন সময় পাড়ারই একজনের সঙ্গে দু'জন গুণীর আবির্ভাব। সাপে কামড়ানোর খবর শুনলেই নাকি গুণীদের আসতে হয়। গুণীরা দেখে বললেন, "আপনারা দড়ির বাঁধন দিয়েছেন বটে, কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, বাঁধন সত্ত্বেও বিষ উপরে উঠে যায়। এখন অবস্থা আয়ত্তে আছে, যদি আপনারা বলেন তাহ'লে যতটা বিষ উপরে উঠেছে, আমরা নামিয়ে দিতে পারি। কিন্তু বিষ নামাতে হ'লে ঐ বাঁধনগুলো কেটে দিতে হবে।"

যাঁরা দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন, তাঁরা গুণীদের কথায় বাঁধন কাটতে রাজী হলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বৃদ্ধের কথায় বাঁধন কাটা হ'লো। গুণীরা নিমগাছের পাতায় মন্ত্র প'ড়ে মাসীমার দেহে সঞ্চালন করতে লাগলেন। বিষ নামা দূরের কথা, ক্রমেই মাসীমার অবস্থা অবনতির দিকে দেখা গেল। এই অবস্থায় আমাদের গ্রামেরই একজন বললেন—"শিগ্‌গির গিয়ে ভগীরথ মিস্ত্রীকে ডেকে আনো। সে অনেক সাপে কামড়ানো লোককে বাঁচিয়েছে।"

বৃদ্ধ ভগীরথ মিস্ত্রীকে আমি জানতাম। আমাদের হেড্‌মাস্টার কৃষ্ণনারায়ণ সিংহের বাড়ির পাশেই তাঁর বাড়ি। আমিই গেলাম তাঁর কাছে। মিস্ত্রী তখন নিজের কাজে ব্যস্ত। হাতে হাতুড়ি-বাটালি।

আমার কথা শোনামাত্র তিনি হাতুড়ি-বাটালি ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন—"চল বাবা।"

ভগীরথ মিস্ত্রীকে যখন বাড়িতে নিয়ে এলাম, দেখি মাসীমার দেহ ঢ'লে পড়েছে, মুখ দিয়ে গাঁজলা পড়ছে। অন্তিম অবস্থা।

ভগীরথ মিস্ত্রী একটা কাঠি দিয়ে প্রকাণ্ড একটা বৃত্ত আঁকলেন। একটু গঙ্গাজল চাইলেন। তাঁর নির্দেশমতো রোগীকে বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে দেওয়া হল। বৃত্তের বাইরে থেকে একটি মহিলা, মাসীমাকে ধ'রে রইলেন। রোগীর সম্মুখভাগে ভগীরথ মিস্ত্রী পাত্র থেকে জল নিয়ে বৃত্তের ভিতরে মাটিতে ঢেলে

তার উপর ঘন ঘন হাত চালিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে কাদামাখা হাতটি ছুঁড়ে দিলেন রোগীর সম্মুখে। হাত পড়লো রোগীর মুখের উপর, ভুরুর কাছে। সেই হাত সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে কাদার উপরে রেখে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আবার ছুঁড়ে দিলেন রোগীর দিকে। এবারে হাত পড়লো রোগীর উরুর উপরে। আবার কাদায় হাত চালিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে হাত ছুঁড়লেন। এবার তাঁর হাতখানি রোগীর গা বেয়ে পড়লো মাটির উপরে। মাসীমা মুদ্রিত চোখ দুটি মেলে চাইলেন সকলের দিকে। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনটি চাপড়ে নির্বিষ হয়ে গেল দেহ!

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত। আমিও তখন নিতান্ত শিশু নই। বয়স ষোল-সতেরো।

২৭

জগতাই-নিমতিতা বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থপ্রধান গ্রাম। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান সবই হ'তো বরেন্দ্রভূমিতে অর্থাৎ রাজসাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায়। ঐ সব জেলার মেয়েরা আসতো আমাদের গ্রামে আর আমাদের গ্রামের মেয়েরা যেতো ঐ সব জেলায়।

আমাদের বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থের বিবাহে প্রকারভেদও কিছু ছিল। দক্ষিণরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের বিবাহে কুশণ্ডিকা-প্রথা নেই। বারেন্দ্রসমাজের বিবাহে বিয়ের পরদিন সকালবেলায় হ'তো কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠান। কুশণ্ডিকাকে ব'লতো বাসি-বিয়ে।

আর একটি অনুষ্ঠান হ'তো: বিবাহের আনন্দোৎসবে বর্ষীয়সী সধবা মহিলাদের নাচ। এ নাচের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। মহিলারা এক-একজন ক'রে এই নৃত্যকলা প্রদর্শন করতেন। নৃত্যপরা মহিলাটি দুটি পায়ের পাতা একত্র ক'রে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়াতেন। দুটি হাত থাকতো কোমরের দুই দিকে। তারপর নীচের দিকে ঝুঁকে একটা অভিনব ভঙ্গীতে নাচ শুরু করতেন। একজন ঢুলী ঢোলে নাচের বোল বাজাতো আর সেই বাজনার তালে তালে মহিলারা নাচতেন। জোড়া পা দুটির অগ্রভাগ জোড়া অবস্থায় রেখে গোড়ালি দুটি ডাইনে-বাঁয়ে সরিয়ে দিতেন, আবার দুটি পায়ের গোড়ালি জোড়া অবস্থায় রেখে পায়ের পাতার অগ্রভাগ দুটি ডাইনে-বাঁয়ে সরিয়ে দিতেন। স্বচক্ষে না দেখলে পুরস্ত্রীদের এই নৃত্যকলার মাধুর্য আস্বাদন করা

সম্ভব নয়। মহিলাদের এই নৃত্যানুষ্ঠানে পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। একমাত্র পুরুষ ঐ ঢুলী। আমরা যখন এই নাচ দেখেছি, তখন ঠিক পুরুষপদ-বাচ্য হইনি।

বিয়ের বাসর-ঘরে মেয়েদের গানের রেওয়াজ তখনও হয়নি। বরং মেয়েরা বাসর-ঘরে বরের গান শোনবার জন্যে খুবই উদ্‌গ্রীব হতেন।

একটি বিয়ের কথা বলি। কন্যা আমাদের জগতাই গ্রামেরই মেয়ে। বর এসেছেন পাবনা জেলা থেকে। বরযাত্রীরা যে বাড়িতে ছিলেন, সেখানে গিয়ে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সকলেই বর দেখবার জন্যে আগ্রহী। বরের চোখদুটি দেখবার মতো। ড্যাবডেবে দুটি চোখ। যেন কারও ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে চোখ রাঙিয়েই আছে।

কিন্তু বর বেশ ভদ্র। দৃষ্টিতেই যা-কিছু উগ্র ভাব। নইলে মানুষটি ঠাণ্ডা প্রকৃতির। ঐ চোখের সঙ্গে কন্যার চোখের শুভদৃষ্টি হ'লো। ছাঁদনাতলায় বিবাহ-অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়ে গেল। এবারে বর গেলেন বাসরঘরে। তরুণীরা সব তৈরি হয়ে আছে। নির্দিষ্ট আসনে 'বর-কনে' বসবামাত্র একটি তরুণী গান গাইবার জন্যে বরকে অনুরোধ করলেন। বর অসম্মত—বললেন আমি গান জানি না। জানি না ব'ললেই হ'লো! গান না জানা লোক কি পৃথিবীতে আছে? মেয়েরা কিছুতেই গান না গাইয়ে ছাড়বে না। সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মতো বরের অবস্থা। অগত্যা বরকে গাইতে হ'লো। বর গান ধরলেন—

তিড়িং তিড়িং ফড়িং তেলাকুচা খায়।
ওরে ব্যাটা মাথানেড়ে, যাতিছ কোথা ছেড়ে,
খা ছাতু, খা ছাতু, যা খাচায়।
তিড়িং তিড়িং ফড়িং তেলাকুচা খায়।

এই জামাইবাবুটি পরবর্তীকালে ঘরজামাই-এর মতো ছিলেন শ্বশুর-বাড়িতে। আমরা তাঁকে খ্যাপাতাম—'তিড়িং তিড়িং ফড়িং তেলাকুচা খায়' গান গেয়ে।

আমাদের গ্রামের বারেন্দ্র-কায়স্থ সমাজপতিরা একটু বেশি মাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন। একটু পান থেকে চুন খসলেই একঘ'রে। ধর্মবিধি, সমাজবিধির নানা অনুশাসন। ধর্ম ও সমাজ—দুইই আচার-অনুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্পর্শদোষ তো পদে পদে। অবশ্য এ বিধান পূর্বপুরুষদের। হয়তো পুরুষানুক্রমে কালধর্মে

বিধির বন্ধন কিছু শিথিল হয়েও থাকতে পারে। বলা বাহুল্য, এ সব বিধি হিন্দুসমাজ পরিচালক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সৃষ্টি। তাঁরা হিন্দুসমাজকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—ভদ্র ও অন্ত্যজ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি ভদ্র, বাদবাকি সব অন্ত্যজ। আবার অন্ত্যজদের মধ্যে জল-চল ও জল-অচল—দুটি বিভাগ। এই জল-চলের দলে আছেন ন'টি জাতি। যাদের বলা হয় নবশাখ। কামার, কুমার, বারুই, নাপিত, সদ্‌গোপ, তিলি, মালী, তাঁতী ও ময়রা—এই ন'টি জাতি নবশাখ। এ-ছাড়া বাদবাকি সব জল-অচল অর্থাৎ এদের ছোঁয়া জল গ্রহণ করা চলবে না। দেবতার পূজার ফুল সম্বন্ধেও একাধিক আইন এবং ক্ষেত্রবিশেষে আইনের ব্যতিক্রমও আছে। মাটিতে প'ড়ে গেলে সে-ফুলে দেবতার পূজা হয় না, কিন্তু মাটিতে ঝ'রে-পড়া শিউলি ফুল দেবতা সানন্দে গ্রহণ করেন। গ্রহণ না ক'রে উপায় কি? শিউলিগাছের শাখা স্পর্শ করবামাত্র ফুলগুলি সব ঝ'রে মাটিতে প'ড়ে যায় যে!

আর-একটি ফুলের ব্যাপারে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মশাইরা একটু বিব্রত-বোধ করেছিলেন। কোনো অচ্ছুৎজাতের স্পর্শ ঘটলে সে-ফুল সর্বদা বর্জনীয়। কিন্তু একটি বিশেষ ফুল গ্রহণীয় ব'লে তাঁরা পাঁতি দিয়েছেন চণ্ডালে চয়ন ক'রলেও সে-ফুলে দেবতার পূজা হ'তে কোনো আপত্তি নেই। সেটি হচ্ছে পদ্মফুল। পুকুরের মাঝখানে কাঁটাভরা পদ্মবনে ফুল তুলতে অচ্ছুৎরা ছাড়া আর কে যাবে?

আরো অনেক রকমের বিধিনিষেধ দেখেছি আমাদের পল্লীসমাজে। জানি না সেগুলি ব্রাহ্মণের কিংবা তাঁদের সহধর্মিণীদের অথবা আমাদেরি সমাজপতি-দের কিংবা তাঁদের ধর্মজায়াদের সৃষ্টি করা কি না। সেকালে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-পরিবারে সাদা রঙের ছোট ছোট বেগুনের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কারণ ওগুলো দেখতে ডিমের মতো। আরো একটি আনাজ নিষিদ্ধ ছিল আমাদের রান্নাঘরে। সেটি হচ্ছে চিচিঙ্গে। তার অপরাধ—বিধাতা তাকে মোষের শিঙের আকার দিয়েছেন।

অবশ্য, এই সব বিধিনিষেধের বেড়া আমাদের কালেই ভাঙতে আরম্ভ হয়েছে।

কিছুকাল পরের কথা। আমরা তরুণের পর্যায়ে তখন। পাবনা জেলায় একটি বিয়ে। পাত্র আমাদের আত্মীয়। বরযাত্রী প্রায় দশজন—বর, বর-কর্তা,

আমার বাবা, পুরোহিত ও নাপিত এবং আমরা ক'জন তরুণ। তিনটি নৌকা। একটি নৌকায় আমরা তরুণের দল আগেই উঠে বসেছি। বয়োজ্যেষ্ঠরাও এ ব্যবস্থা অনুমোদন ক'রে অন্য দুটিতে স্থান গ্রহণ করলেন। পুরো তিন দিনের যাত্রা। চতুর্থ দিনে পাবনায় প্রবেশ। আহারাদির ব্যবস্থা সব কিছু নৌকার উপরেই। সঙ্গে খাদ্যবস্তু—চাল, ডাল প্রভৃতি আছে। সেগুলি তিনটি নৌকাতে ভাগ ক'রে নেওয়া হয়েছে। যদি কিছু প্রয়োজন হয়, মধ্যপথে রাজসাহীতে কিনে নিলেও চলবে।

তিনটি নৌকার মধ্যে যেটিতে আমরা চড়েছি, সেটি আমাদেরি একজন প্রজার। নৌকার মাঝির সঙ্গে আমার মামা-ভাগ্‌নে সম্পর্ক। সেকালে আমাদের মুসলমান ভাগীদার চাষীদেরও আমি মামু ব'লে ডাকতাম।

কোন্ মাস মনে নেই। মনে আছে ভরা পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত অপরূপ রূপ। এই পদ্মার উপর দিয়ে আমরা চলেছি। আগুপাছু তিনটি নৌকা। কখনও কাছাকাছি, কখনও দূরে।

নৌকায় ইলিশ-মাছ-ধরা জাল ছিল। মাঝিরা জাল ফেলে দু'তিনটি ইলিশ মাছ ধরলে। অন্য নৌকাটিতে কী ব্যাপার ঘটছে তার খবর নেবার উপায় নেই। আমাদের নৌকোর মাঝি বললে—"ভাগ্‌নে, আখা জ্বেলে দিচ্ছি। মাছ কুটে দিচ্ছি। তোমরা একটা হিলশ্যা ভেজে ফ্যালো। তারপর দুটি চাল সিদ্ধ ক'রে নামিয়ে নিয়ো।"

ইলিশ মাছ ধরা দেখেই আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আজ আমরা গুঁড়ি-মাঝিদের রান্না মাছের ঝোল আর ভাত খাবো। হ'লোও তাই। আমাদের জাত মারতে পেরে গুঁড়িরা খুশী। আর আমরা? ও-রকম সুস্বাদু ইলিশ মাছের ঝোল আমরা কখনও খাইনি। অথচ না-ছিল সর্ষে-বাঁটা, না-ছিল অন্য কোন মশলা। স্রেফ্‌ সর্ষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা। আমরা ক'টি তরুণ ভদ্রলোকের ছেলে দিব্যি অচ্ছুৎ জাতের হাতের রান্না মাছের ঝোল আর ভাত নির্বিকারচিত্তে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করলাম। এই অভোজ্য-ভোজনে পরিপাক-ক্রিয়াতেও কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটলো না।

এর পর পাবনায় যাওয়া এবং সেখান থেকে ফিরে আসা—প্রত্যাবর্তন-পর্বে এমন কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি।

বলবার মতো একটি ঘটনা ঘটেছিল ক্ষিতীনের বিয়েতে। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রাঙ্কন-শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের বিয়ের সময়ের ব্যাপার। ক'নের বাড়ি নবদ্বীপ। আমরা অর্থাৎ বরযাত্রীরা দল বেঁধে যাবো নবদ্বীপ। আমাদের সঙ্গে যেতে চান অনুকূলচন্দ্র চৌধুরী। চৌধুরী মশাই আমাদের গ্রামেরই লোক। কন্যাপক্ষের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা। যাই হোক, তিনি আমাদের সঙ্গেই যাবেন, স্থির হ'লো। বরকর্তার আপত্তির কোনো কারণও নেই। কারণ, অনুকূল-বাবুর ট্রেনভাড়া বরকর্তাকে বহন করতে হবে না। কেন হবে না, সেটা আমরা সকলেই জানতাম।

অনুকূল চৌধুরী ব্যক্তিটির সঙ্গে আমার পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ, ক্ষিতীনের বিয়ের প্রসঙ্গে যে কাহিনী শোনাবো, তার নায়ক হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অনুকূল চৌধুরী মশাই।

চৌধুরী মশাইকে আমি শ্রদ্ধা করতাম দুটি কারণে : অভাব-অনটনের সংসারে সব সময় শিরদাঁড়া সিধে করে, মাথা সর্বদা উঁচু রেখে অপ্রিয় সত্য কথা বলতে কোনো কুণ্ঠা ছিল না তাঁর। মুখের কথাতেও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল।

চৌধুরী মশাই ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে চাকরি করতেন। বর্তমানে তিনি বেকার। রেলের চাকরি ছেড়েছেন কিন্তু রেলের পোশাকটি ছাড়েননি। কালো কোটের বোতামের উপর ইংরেজি হরফে লেখা ই. আই. আর. শব্দটি তাঁর অতীত-সম্ভ্রম-স্মৃতি উদ্দীপিত করতো। কেবল তাই নয়, ঐ কালো কোট আর বোতামের কল্যাণে তিনি সারা ভারতবর্ষ বিনা ভাড়ায় যে-কোনো লাইনের ট্রেনে অব্যাহতভাবে ভ্রমণ করতেন। কোনো চেকার একটি বারও টিকিটের কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করতেন না।

চৌধুরী মশায়ের ছোট্ট বাড়িটির পাশে একফালি খালি জায়গায় তিনি শাকসব্জি, বেগুনের চারা প্রভৃতি লাগাতেন। জায়গাটুকু বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকতো। একদিন চৌধুরী মশাই ছাখেন—একটা গরু বেড়া ভেঙে ঢুকে তাঁর চারাগাছগুলির সর্বনাশ করছে। মাথা গরম হয়ে গেল চৌধুরী মশায়ের। তিনি একটা মোটা লাঠি এনে দমাদ্দম পিটিয়ে গরুটিকে তাড়িয়ে দিলেন। শোনা গেল, গরুটি চৌধুরী মশায়ের গুরুদেবের।

কিছুক্ষণ পরে চৌধুরী মশায়ের বাড়িতে গুরুদেবের আবির্ভাব।

গুরুদেব উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'অনুকূল, তুমি আমার গরুকে মেরেছো?'

'আজ্ঞে, হাঁ, প্রভু।'

গুরুদেব আরও ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে বললেন—'তোমার এত বড় আস্পর্ধা, তুমি আমার গরুকে মারতে সাহস করো।'

অনুকূল চৌধুরী মশাই জোড়হাত ক'রে গুরুদেবকে প্রশ্ন করলেন—'প্রভু, গুরুর গরুও গুরু?'

আমি একদিন দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে একটু আরাম করছি, হঠাৎ কানে এল গাছকাটার শব্দ। মনে হ'লো, কে যেন আমার বাগানের গাছের ডাল কাটছে, শয্যা ছেড়ে বেরোলাম। গাছকাটার আওয়াজ অনুসরণ ক'রে দেখি—গাছের ডাল নয়, আমার বাঁশের ঝাড় থেকে বাঁশ কাটছে কে যেন। আমাকে দেখে বাঁশ-কাটা থেমেছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি—দা-হাতে চৌধুরী মশাই। বললাম—'ও কী হচ্ছে, চৌধুরী মশাই?'

'একটা বাঁশ নিচ্ছি ভাই!'

আমি একটু বিরক্তির স্বরে বললাম—'কী অন্যায় কথা। বলা নেই, কওয়া নেই, আপনি আমার বাঁশ কেটে নিয়ে যাচ্ছেন!'

সদাসপ্রতিভ চৌধুরী মশাই বললেন—'আমার নেই, তোমার আছে, তাই নিচ্ছি। এতে আবার বলা-কওয়ার কি প্রয়োজন আছে?'

অনেক পরের ঘটনা। ক্ষিতীন ও আমি দুজনেই কলকাতায় থাকি। অনুকূল চৌধুরী মশাই মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। ওঠেন ক্ষিতীনের ভিক্টোরিয়া হোটেলে। প্রতি বারই আমার সঙ্গে দেখা করেন।

একবার এসেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—'কেমন আছেন?'

'বেশ আছি, ভাই!'

'কী ভাবে চলছে?'

চৌধুরী মশাই বললেন—'সংসার-চলার কথা জিজ্ঞাসা করছো? ভগবান চালাচ্ছেন। কোনো কোনো দিন আমিও চালাই।'

বললাম—'সে আবার কী কথা! ভগবানও চালান, আবার আপনিও চালান?'

চৌধুরী মশাই বললেন—'আরে ভাই, যেদিন উপোস ক'রে থাকি, সেদিনটি আমাকেই চালাতে হয়। তখন কোথায় তোমার ভগবান?'

ক্ষিতীনের বিয়ের কথা বলতে বলতে চৌধুরী মশাইকে নিয়ে কলকাতা পর্যন্ত চ'লে এসেছি। এবারে পশ্চাদপসরণ করি।

আমরা বরযাত্রীর দল, সঙ্গে চৌধুরী মশাই, বিবাহের শুভ দিবসে নবদ্বীপে এলাম। চৌধুরীমশাই-এর সঙ্গে স্টেশন থেকেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তিনি এখন কন্যাপক্ষ। কন্যাপক্ষ যথোচিত আপ্যায়ন করলেন। শুভকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। এবারে নববধূ নিয়ে আমাদের প্রত্যাবর্তনের পালা। প্রত্যাবর্তনের সময়েও সঙ্গী চৌধুরী মশাই। নবদ্বীপ স্টেশনে সকলেই এসেছে। একজন বন্ধু বললেন—'চৌধুরী মশাই-এর সঙ্গে একটি হাঁড়ি দেখেছো? হাঁড়ির মুখে একটি সরা, আর চতুর্দিক আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা?'

কন্যাপক্ষের যাঁরা স্টেশনে এসেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল—হাঁড়ির মধ্যে অন্তত দু'তিন ডজন পান্তুয়া আছে। আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল—যে-কোনো প্রকারে পান্তুয়ার হাঁড়িটি চুরি করতে হবে।

চুরি করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। যদিও দিনের বেলা এবং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপরেই অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে হাঁড়িটি। চৌধুরী মশাইও নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক ঘুরছেন। তবু আমাদের একজন বন্ধু হাঁড়িটি চুরি করতে গিয়ে বমাল সমেত ধরা প'ড়ে গেল। চোর ধরলেন চৌধুরী মশাই স্বয়ং। বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষের লোকদের মধ্যে হৈ চৈ প'ড়ে গেল। বরযাত্রীর দলের বয়স্ক ব্যক্তিরা আমাদের সেই বন্ধুটিকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন। চৌধুরী মশাই সাবধান হয়ে গেলেন। হাঁড়ির কাছটিতে ব'সে রইলেন গ্যাঁট হয়ে।

ট্রেন এলো। যে-কামরায় বর-বৌ উঠলেন, সেই কামরাটিতে পান্তুয়ার হাঁড়ি নিয়ে উঠলেন চৌধুরী মশাই। আমরা অন্য কামরায়। সন্ধ্যা নাগাদ ট্রেন এসে পৌছলো সজনীপাড়া স্টেশনে। তখনও নিমতিতা স্টেশন হয়নি।

যান-বাহন জগতাই থেকে এসেছে। দু'জন বেহারা সমেত একটি পালকি এসেছে। পালকিতে যাবেন নতুন বৌ, আর আর সকলে গরুর গাড়িতে। সজনীপাড়া স্টেশন থেকে জগতাই চার-পাঁচ মাইল পথ। ব্যবস্থা হয়েছে, জগতাই-এর মাইলটাকে দূরে মধ্যপথে এক জায়গায় পালকি ও গরুর গাড়িগুলি একে একে পৌছলে, সব যান-বাহন মিলিত হয়ে একসঙ্গে জগতাইএ পৌছবে।

একটা সমস্যা দেখা দিল, পালকির সঙ্গে একজন প্রহরী দেওয়া নিয়ে। চাকর-বাকর বা নাপিতের কথা কারও মনঃপূত হ'লো না। শেষ পর্যন্ত চৌধুরী মশাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পালকির সঙ্গে যাবার ইচ্ছা জানালেন।

পালকি-বেহারারা বললে গরুর গাড়ির পথ দিয়ে গেলে তাদের বেশি-পথ চলতে হবে। তার পরিবর্তে রেল-লাইন ধ'রে গেলে তাদের পক্ষে সুবিধা—পথও সংক্ষিপ্ত হয়। রেল-লাইন দিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত হ'লো। কথা হ'লো—পালকি-বেহারাদের চলতে হবে ধীরে ধীরে—চৌধুরী মশাইএর চলার গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নতুন বৌকে পালকিতে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। পালকির ভিতরকার বেতে-ছাওয়া তলদেশে বেশ সুদৃশ্য রঙীন শয্যা রচনা করা হ'লো। দুটি প্রান্তে দুটি তাকিয়া। বেশ কিছু ফুলও। চৌধুরী মশাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে পালকির ভিতরকার ঐ অপরূপ সাজসজ্জার মধ্যে তাঁর পান্তুয়ার হাঁড়িটি বসিয়ে দিলেন। দু'একজন প্রতিবাদ করলেন, কারও কথা গ্রাহ্য করলেন না তিনি। বেহারারা হাসছে।

গরুর গাড়ি চললো সদর রাস্তা দিয়ে। রেল-লাইন ধ'রে পালকি। হাওয়া যাতায়াতের জন্যে পালকির দু'পাশের দুটো দরজা ঈষৎ খোলা। পালকি চলেছে। ডানদিকের দরজার পাশে চৌধুরী মশাই পালকির ছাদের উপরে একটি হাত রেখে মৃদু পদক্ষেপে চলেছেন। তিনি চলেছেন রেল-লাইনের পাশের পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে। বেহারা দুটি রেল-লাইনের কাছ ঘেঁষে চলেছে। পালকির অর্ধাংশ রেল-লাইনের ভিতরে। আমি এক সময়ে অন্ধকারের মধ্যে এসে পালকির বাঁ দিকের দরজার পাশে পাশে চলেছি চৌধুরী মশাই-এর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। পিছনের বেহারাটি বোধ হয় দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। আমাকেও চিনতো সে। পান্তুয়ার হাঁড়ি নিয়ে বরযাত্রীদের আলাপ-আলোচনা বোধ হয় সে শুনেও থাকবে।

পালকি চলেছে। চৌধুরী মশাইও চলেছেন। অন্যপাশে আমিও চলেছি। মাইলটাক পথ চলার পরে, পালকির বাঁ দিকের দরজাটি একটু বেশি ফাঁক করতেই হাত পড়লো পান্তুয়ার হাঁড়ির উপরেই। চুপিসাড়ে হাঁড়িটি নামিয়ে নিলাম। পালকি চলেছে। চৌধুরী মশাইও নিশ্চিন্ত মনে চলেছেন। কেবল আমিই সঙ্গে নেই, আর নেই তাঁর হাঁড়িটি।

২৯

ক্ষিতীনের বাবা কেদারনাথ মজুমদারের যাত্রার দলের কথা আগে বলেছি, বোধ হয় বলেছি তাঁর পাঁচালির দলের কথাও।

নিমতিতা-জগতাইএর ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজপতিরা নিম্নশ্রেণীর জাতদের সেকালে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন। সেটা আদৌ ছিল না নিমতিতা থিয়েটারে কিম্বা কেদারবাবুর যাত্রা ও পাঁচালির দলের মধ্যে। মনে হ'তো আর্টিস্টদের জাতিভেদ নেই—আর্টিস্টরা একজাতিভুক্ত।

কেদারবাবুর পাঁচালির দলে যিনি সুরসংযোগে কবিতা আবৃত্তি করতেন, তাঁর নাম গোরাচাঁদ ঘোষ, জাতিতে গোয়ালা ; যাত্রার দলে তবলাবাঁয়া, ঢোলক ও খোল বাজাতেন হবিগোপাল সরকার, জাতিতে নাপিত ; গায়কের দলে ছিলেন ছুতোর, গোয়ালা প্রভৃতি। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ আসরে সকলের সঙ্গে ব'সে বেহালা বাজাতেন। কেদারবাবুর এই যাত্রা পাঁচালির আসরে কোনরকম উচ্চনীচ ভেদ-বোধ ছিল না।

যাত্রা ও পাঁচালি অভিনয় হ'তো কেদারবাবুর বাড়িতেই। দাশু রায়ের পাঁচালি অনুষ্ঠিত হ'তো এই সম্প্রদায়ে। আমিও এই যাত্রা-পাঁচালির দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। পাঁচালিতে সকলের সঙ্গে গান করতাম, যাত্রার দলে গান ও অভিনয়—দুই অংশেই অবতীর্ণ হ'তে হ'তো।

নিমতিতার দোলযাত্রা-উপলক্ষে কলকাতার যাত্রা দলের সুরথ-উদ্ধার অভিনয়ের উল্লেখ করেছি। জগতাই-এর যাত্রার দলে কেদারবাবুর স্বরচিত নাটকই অভিনীত হ'তো। মাত্র একবার হয়েছিল অহিভূষণ ভট্টাচার্যের লেখা ঐ সুরথ-উদ্ধার নাটকের অভিনয়। এই সুরথ-উদ্ধার নাটকে আমি দিবোদাসের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম।

দিবোদাস-চরিত্রটি পাগলের। পাগল, কিন্তু শেয়ানা পাগল। মুখে পাগলের প্রলাপ, কিন্তু সে প্রলাপের মধ্যে রাজা ও রাজঅমাত্যদের প্রতি প্রচ্ছন্ন পরিহাস, অপ্রিয় সত্য। কখনও মধুক্ষরণ, কখনও বা হুল-ফোটানো। একটুখানি নমুনা দিই—

নাটকের প্রথম অঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্ক—দুটি অঙ্ক জুড়ে দিবোদাসের একটি গান। গানের গোড়ার চরণ—"আপন বুঝে চলো এই বেলা"। রাজ-অমাত্যদের একটি চক্রান্তের খবর পেয়ে দিবোদাস তার পাগলের প্রলাপ গেয়ে চলেছে—

আপন বুঝে চলো এই বেলা।
ঐ বাস্তু শকুন উড়ছে মাথায় গো,
ব'সে যুক্তি দিচ্ছেন হাড়গেলা।
আপন বুঝে চলো এই বেলা।

ঐ ছাখো না, ঐ একটি জনা—
সিংহির মামা ভোম্বলদাসকে চিনতে জুয়ায় না,
উনি গর্তে থেকে মারছেন উঁকি গো,
বার ক'রে লম্বা গলা।
ঐ ছাখো খ্যাঁকশেয়ালির ছানা
ল্যাজ গুটিয়ে আছেন যেন কত পোষমানা,
সেথা পিঁজরেতে কালপ্যাঁচা ব'সে
দিতেছেন কত শলা।

যখন যেমন পরিস্থিতি, ঠিক তখনই দিবোদাসের আবির্ভাব, আর সেই পরিস্থিতি অবলম্বন ক'রে দিবোদাসের এই 'আপন বুঝে চলো এই বেলা' গানের বিভিন্ন স্তবক।

সেকালে এই 'আপন বুঝে চলো এই বেলা' চরণটি আমাদের দেশে একটা প্রবচনে পরিণত হয়েছিল। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও লেখক শিরোধার্য করতেন 'আপন বুঝে চলো এই বেলা'।

কেবল এই 'আপন বুঝে চলো এই বেলা'ই নয়, 'সুরথ-উদ্ধারে'র আর-একটি গান সমগ্র বাংলাদেশে খুব প্রসারলাভ করেছিল। আধ্যাত্মিক ভাবমূলক গান—

এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নট নটবর হরি যায় যা সাজান সেই তা সাজে
কর্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সবে গাঁথা,
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ বন্ধু, কেহ ভ্রাতা,
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গের অভিনেতা যাচ্ছে আসছে কত সাজে।
মাতৃসাজে সেজেছিস মা, করতে স্নেহের অভিনয়,
কর্মক্ষেত্রে কর্মসূত্রে আমি তোর সেজেছি তনয়,
এ নাটকের এই অঙ্কে পেয়েছি স্থান তোর অঙ্কে
হয়তো যাবো পর-অঙ্কে পর-অঙ্কে পুত্র সেজে।
যার যখন হতেছে সাঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনয়,
কাকস্য পরিবেদনা আর তখন সে কারও নয়,
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়, কন্যাপুত্রের কাতর বিনয়
শোনে না কারও অনুনয়, চ'লে যায় সাজ সজ্জা ত্যজে

আমাদের বাংলাদেশের সেকালের কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ বলতেন—সেকালে নাকি পাঁচ টাকায় দুর্গোৎসব হ'তো। কথাটা শুনে একালের লোকে অবিশ্বাসের হাসি হাসে। কিন্তু অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই।

পাঁচ টাকায় দুর্গাপূজা যে-কালে হ'তো, সেটা আমাদের সেকাল নয়—আমাদেরও আগেকার সেকালে। যে-কালে কড়ি দিয়ে একটা জলজ্যান্ত বর কেনা যেত, সেকালে পাঁচ টাকার কড়ি দিয়ে একটা দুর্গাপূজা হবে না কেন?

কড়াগোণ্ডার হিসেবে সেকালে পাঁচ গোণ্ডা অর্থাৎ এক পয়সা কুড়িটি কড়ির সমান। এক আনায় মিলতো আশীটি কড়ি। সুতরাং এক ট্যাকায় বারোশ' আশীটি কড়ি পাওয়া যেত। পাঁচ টাকা ভাঙিয়ে পাওয়া যেত ছ' হাজার চারশ' কড়ি। সেকালে ছ'সাত হাজার কড়ি একালের ছ'সাত হাজার টাকার সমান। বুঝিয়ে দিচ্ছি।

আমাদের কালেই একটা বড় ইলিশ মাছ দু'পয়সায় পাওয়া যেত। আর আগেকার সেকালের হিসেবে মাছটির দাম দশ কড়ি। এখন সেই ইলিশের দাম কমপক্ষে কুড়ি টাকা। আমাদের কালেই এক কড়ির দাম দু টাকা। হবে না কেন পাঁচ টাকায় দুর্গাপূজা?

আমাদের সেকালের সব জিনিসের দাম স্মরণে নেই। যতটা মনে আছে বলছি। দুধ-ঘীয়ের কথা আগে বলেছি। মনে আছে পাঁচ সিকে দেড় টাকায় এক জোড়া মিলের ধুতি পাওয়া যেত। রেলি ব্রাদার্সের ধুতি। আট আনা দশ আনায় একজোড়া জুতা। চটির দাম আরও কম। পোস্টকার্ডের দাম এক পয়সা, খাম দু'পয়সা। এক পয়সায় দুটি দেশলাই। দেশলাই-এর কাঠির মুখে লাল-রঙের বারুদ। শক্ত জায়গায় ঘষেও জ্বালানো যেত। দেশলাই বাক্সের উপরে ছাপা থাকতো 'মেড্ ইন্ সুইডেন'।

আমাদের সেকালে কাঁচকলা, মোচা, থোড়, সজনেডাঁটা, ওল, মান—এ সব বাজারে বিক্রী হ'তো না। আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি থেকেই পাওয়া যেত। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে শীতের প্রাক্‌কালে গঙ্গার স্রোত মন্দীভূত হয়ে এসে মাছ ধরার মরসুম প'ড়ে যেত। গ্রামের লোকেরা ছিপ্, বঁড়সি, তোগী নিয়ে যেতেন গঙ্গায় তাঁদের নির্বাচিত স্থানে। এক-একদিন বড় বড় রুই, মিরগেল,

কালবাউস ধ'রে আনতেন তাঁরা। সে মাছ কেটে ভাগ ক'রে আত্মীয়বন্ধুদের বাড়িতে বিতরণ করা হ'তো।

গ্রামে কারও অসুখবিসুখ করলে অনেক ক্ষেত্রে ঔষধপথ্যাদিরও সাহায্য পাওয়া যেত গ্রামবাসীদের কাছে। সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়িতে পুরোনো ঘী, পুরোনো তেঁতুল প্রভৃতি ঔষধের উপকরণ সঞ্চিত থাকতো। সে-সব বস্তু সহানুভূতির সঙ্গে দেওয়া হ'তো প্রার্থীদের। পথ্যের পুরোনো চা'লও থাকতো অনেকের বাড়িতে।

ক্ষিতীনের কাকা পূর্ণচন্দ্র মজুমদার ছিলেন আমাদের জগতাই গ্রামের একমাত্র চিকিৎসক। মনে হয় কোনো মেডিক্যাল স্কুল বা কলেজের পাস-করা ডাক্তার ছিলেন না তিনি। এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দুই মতেই চিকিৎসা করতেন। প্রয়োজন হ'লে নিমতিতার জমিদার-বাড়ির গৃহ-চিকিৎসককে ডাকা হ'তো। সে সময় মেডিক্যাল কলেজের পাস-করা ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ বসু জমিদার-বাড়ির গৃহচিকিৎসক। একজন কবিরাজও ছিলেন—শ্রীপতি সেনগুপ্ত। জমিদার-বাড়ির কারও কোনো ব্যাধি দুরারোগ্য মনে করলে কিম্বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন হলে কলকাতা থেকে আসতেন ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য অথবা কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়। নিমতিতায় আরও একজন ডাক্তার ছিলেন—আমাদের বন্ধু অবনীভূষণ দাসের মামা দুর্গাবিলাস ধর।

এ ছাড়া ছিল গ্রামীণ টোট্‌কা চিকিৎসা। ছোটখাটো রোগে বাড়ির বৃদ্ধারাই লতাপাতা-শিকড় একটা কিছু দিয়ে রোগ সারিয়ে দিতেন। এই টোট্‌কা ওষুধের চিকিৎসায় আমার দিদিমার বেশ খ্যাতি ছিল। গ্রামের অনেক বাড়ি থেকে রুগী আসতো দিদিমার কাছে। আমি ছিলাম দিদিমার কম্পাউণ্ডার। দিদিমা আমাকে হুকুম করতেন, আর আমি জঙ্গল থেকে গাছ, পাতা বা শিকড় তুলে এনে দিতাম। দিদিমা আমাকে অনেক গাছ চিনিয়ে দিয়েছিলেন। সবই ভুলে গেছি—দুটি-একটি মনে আছে। একদিন অন্তর জ্বর হ'লে, এই পালাজ্বরের জন্যে দিদিমা হাতীশুঁড়ো গাছের শিকড়, ডাল, পাতা ফুল সবসুদ্ধ শিলে থেঁতো ক'রে একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে শুঁকতে দিতেন। এই হাতীশুঁড়োর নাসে পালাজ্বর সেরে যেত। এক রকম লতানে গাছ ছিল, নাম—আকনাদি। এই আকনাদি গাছের পাতা সোজা পিঠে গরম গাওয়া ঘী লাগিয়ে ফোড়ার উপর বসিয়ে দিলে ফোড়া ফেটে যেত। আবার পাতার উল্টো পিঠটা ঐ ফাটা-

ফোড়ার উপর বসিয়ে দিলে ঘা শুকিয়ে যেত। আরও অনেক রোগের অনেক রকম ওষুধের ব্যবস্থা করতেন দিদিমা। বলা বাহুল্য এ নিঃস্বার্থ চিকিৎসা। দিদিমা কারও কাছ থেকে একটি পয়সাও নিতেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে বলতেন রুগীদের। যেমন হিং, বিটনুন, শুঁঠ প্রভৃতি।

দিদিমা শেষ বয়সে কালাচাঁদের প্রেমে পড়েছিলেন। অর্থাৎ আফিং ধরেছিলেন। বলতেন—বৃদ্ধ বয়সে আফিং নাকি সালসার কাজ করে। আমার মা কিন্তু দিদিমার আফিং খাওয়ার ঘোর বিরোধী। বিরোধের মূল কারণ— মাকেই এই আফিং-এর পয়সা যোগাতে হয়। এইজন্যে মায়ে-মেয়েতে খিটিমিটি লেগেই থাকে।

শেষ পর্যন্ত দিদিমা আর তাঁর মেয়ের কাছ থেকে আফিং-এর পয়সার প্রত্যাশী হলেন না। নিজেই একটা পন্থা উদ্ভাবন করলেন। তেমন-তেমন রুগী পেলে দিদিমা বলতেন—'তোমার জন্যে আফিং দিয়ে ওষুধ তৈরি করতে হবে। কাল চার আনার আফিং নিয়ে এসো।' দিদিমা তাঁর আফিং-এর সমস্যার সমাধান ক'রে ফেললেন।

আমাদের এ অঞ্চলে কার্বঙ্কল রোগে বড় একটা কারও মৃত্যু ঘটতো না। একটি অসাধারণ গুণসম্পন্ন গ্রাম্য ক্ষতচিকিৎসক ছিলেন, নাম—সদারত বিশ্বাস। তাঁর বহু কার্বঙ্কল-চিকিৎসা আমরা দেখেছি,—শতকরা একশ' জনই রোগমুক্ত হয়েছে। সদারত বিশ্বাসের একটি বিশেষ চিকিৎসার কথা বলি :

নিমতিতার জমিদারদের পুরোহিত রমেশচন্দ্র ভাদুড়ীর বৃদ্ধা মা তরকারি কুটতে কুটতে অসতর্ক হওয়ায় বঁটিতে তাঁর একটি আঙ্গুলের ডগায় একটু কেটে গেল। বৃদ্ধা বড় বেশি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সামান্য রক্ত পড়লো। ধুয়েপুঁছে ঠিক ক'রে নিলেন। পরদিন সেই আঙ্গুলে অসহ্য যন্ত্রণা। গোটা আঙ্গুলটাই ফুলে উঠেছে। ডাক্তার এসে লোশন লাগাবার ব্যবস্থা করলেন। ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিলেন। পরের দিন কব্জির কাছ থেকে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত ফুলে উঠলো। সেই সঙ্গে ভদ্রমহিলার হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। হাত বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ফোলা অগ্রসর হচ্ছে কনুই-এর দিকে। ডাক্তার বললেন—'সেপটিক হয়ে গেছে। এখানে চিকিৎসা অসম্ভব। বহরমপুর হাসপাতালে সত্বর নিয়ে যাওয়া দরকার। খুব সম্ভব, আক্রান্ত স্থান কেটে ফেলতে হবে। নৈলে রোগের বিষক্রিয়া ক্রমে উপরের দিকে উঠে রোগীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে।'

বৃদ্ধা হাসপাতালে যেতে কিছুতেই রাজী হলেন না।

কোনো সূত্রে খবর পেয়ে সদারত বিশ্বাস পুরোহিত-বাড়িতে উপস্থিত। তিনি রোগী দেখে বললেন—'শুনেছি ডাক্তারবাবু জবাব দিয়েছেন। বলেন তো, আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'

চিকিৎসা আরম্ভ হ'লো সদারত বিশ্বাসের। কোথা থেকে একটা লতা এনে বালার মতো ক'রে পরিয়ে দিলেন রোগীর বাহুতে। কনুই থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত পচ ধরেছে। সমস্ত স্থানটিতে একটা মলম মাখিয়ে দিলেন। প্রথম দিনেই দেখা গেল, রোগ হাতের যতদূর আক্রমণ করেছিল, সেইখানেই প্রতিরুদ্ধ হয়েছে। আর অগ্রসর হয়নি। এখন একমাত্র চিকিৎসা মলম মাখানো। চিকিৎসক বিশেষ ক'রে ব'লে গেছেন, কোনো ক্রমেই যেন ঐ লতার বালাটি হাত থেকে খুলে না যায়।

মাসখানেকের মধ্যে সর্বসাধারণের মনে একটা বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে সদারত বিশ্বাস রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে তুললেন।

কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় একবার নিমতিতার জমিদার-বাড়িতে চিকিৎসা করতে এসে সদারত বিশ্বাসের কার্বঙ্কল চিকিৎসার কথা শুনতে পান। সদারত বিশ্বাসকে ডেকে তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। তাঁর সঙ্গে কথা হয়, কলকাতায় কার্বঙ্কলের রোগী পেলে কবিরাজ মশাই তাঁকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

একবার নিয়ে গিয়েছিলেন। কবিরাজ মশাই-এর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ আরোগ্য-শালায় দুটি কার্বঙ্কল রোগীকে নিরাময় ক'রে সদারত বিশ্বাস সসম্মানে ফিরে এসেছিলেন।

আমরা শুনেছিলাম—যামিনী কবিরাজ মশাই উপযুক্ত মূল্যে এই মলমের প্রস্তুত-প্রণালী সদারত বিশ্বাসের কাছ থেকে কিনে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সদারত বিশ্বাস সম্মত হন নি।

যতদূর জানি, সদারত বিশ্বাস শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না।

তথাকথিত অশিক্ষিত দাই-এর (ধাত্রীর) দ্বারা আমাদের গ্রামাঞ্চলের প্রসূতিদের সন্তান প্রসব করানো হ'তো। সকলের কাছে তিনি দাই-মা বলে অভিহিত হতেন। তিনি একজন চর্মকার জাতীয় নারী। ভদ্রলোকদের অস্পৃশ্য,—অথচ ভদ্রলোকেরা তাঁর কৃপাতেই এই পৃথিবীর মুখ দেখতে পেতেন।

৩১

আমাদের জগতাই-নিমতিতা গ্রামাঞ্চলে বনজঙ্গল ছিল না। ছিল ঝোপঝাড়। ছিল আম-কাঁঠালের বাগান। তবু শীতকালের রাত্রে কোনো কোনো বছরে ফেউ-এর ডাক শোনা যেত। শেয়ালের ডাক তো প্রহরে প্রহরে। একটু ঝোপ-ঝাড় পেলেই গর্ত খুঁড়ে শেয়ালে সেখানে বাসা বাঁধতো। প্রহর-জ্ঞাপন ছাড়া শেয়ালের ডাকের আর কোনো মানে নেই। কিন্তু ফেউ-এর ডাকের মানে আলাদা। তার মানে অনেকেরই হৃৎকম্প উদ্রেক করে। একবার এই ফেউ-এর ডাক আমাদের পল্লী-অঞ্চলের চতুর্দিকের গ্রামবাসীদের সন্ত্রস্ত ক'রে তুললো। কেউ কেউ বললে তারা স্বচক্ষে বাঘটিকে দেখেছে। লোকগুলো আস্থাভাজন না হ'লেও বাঘের কথায় তাদের উপর সকলেই আস্থা স্থাপন করলে। প্রতি রাত্রেই ফেউ-এর ডাক শোনা যায়। গুজবও রটে অনেক রকম। শেষে একজন বারুজীবী আমাদের গ্রামের জমিদার প্রাণবন্ধু চৌধুরীর কাছে এসে বললো—তাঁর পানের বরজের লোকেরা বাঘটিকে দেখেছে। পানের গাছে জল দেবার জন্যে যে গর্ত থাকে, সেই গর্তের জল খেতে দেখেছে বরজের লোকেরা।

বরজের কাছেই খানিকটা মাঠ জুড়ে শরের বন। এমন কিছু জঙ্গুলে জায়গা নয় যে তার মধ্যে বাঘ বাসা বেঁধে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারে। বারুজীবীর কিন্তু সন্দেহ, ঐ শরের বনেই বাঘটা থাকার সম্ভাবনা। জমিদারবাবুর একটি দোনলা বন্দুক ছিল। বারুজীবীর প্রার্থনা—তিনি যদি দয়া ক'রে ঐ শরের বনে সন্ধান করেন বাঘটিকে। বারুজীবী খুবই বিপন্ন। বাঘের ভয়ে মজুররা বরজের পানের গাছে জল দেওয়া বন্ধ করেছে।

জমিদার প্রাণবন্ধু চৌধুরী বিকেলের দিকে লোকলস্কর নিয়ে বাঘ-শিকারে গেলেন। পূর্ব নির্দেশমতো তাঁর সঙ্গের লোকেরা শরের বনের কাছে গিয়ে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে হৈ-হল্লা সোরগোল আরম্ভ ক'রে দিলে। হঠাৎ বনের এক পাশ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে একটা নাতিক্ষুদ্র চিতেবাঘ খোলা মাঠের উপর দিয়ে বিদ্যুদ্‌বেগে দৌড়ে চ'লে গেল। জনতাও ছুটলো বাঘটিকে অনুসরণ ক'রে। শিকারীও চললেন।

দিনের বেলা। লোকজনের চক্ষুর অগোচরে কোথায় যাবে বাঘ? কিছুদূর যাবার পর একজন বুড়ী খবর দিলে তার ঘরের পিছন দিকে কাঁটাগাছের ঝোপের মধ্যে বাঘটা ঢুকেছে।

জনতা হৈচৈ না ক'রে প্রাণবন্ধু চৌধুরীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। বন্দুক হাতে চৌধুরী মশাই এলেন। কোন্ পথ দিয়ে বাঘটা আবার পালাতে পারে, সেই দিকে জনতাকে পাঠিয়ে দিয়ে তার বিপরীত দিকে তিনি কয়েকজন লাঠিধারী লোককে নিয়ে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিপরীত দিক থেকে জনতা ক্যানেস্তারা বাজিয়ে হট্টগোল করা মাত্র, বাঘ বেরিয়ে পড়লো শিকারীর সম্মুখেই। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলি। অব্যর্থ সন্ধান।

মরা বাঘটিকে নিয়ে আসা হ'লো জগতাই-এর জমিদার-বাড়িতে।

আর-একটা অদ্ভুত প্রাণী বেরিয়েছিল এই পানের বরজ থেকে। সরীসৃপ জাতীয়, দেখতে ঠিক কুমীরের বাচ্চার মতো। বেজির মতো মুখ। সারা দেহে চালতার খোলার মতো বড় বড় আঁশ। নাম কেউ বলতে পারলো না। ইংরেজিতে বলে অ্যাণ্ট-ইটার। পিঁপড়ে খেয়ে বেঁচে থাকে এরা। আমাদের গ্রামের প্রবীণতম ব্যক্তিও এই অদ্ভুত প্রাণী দেখেননি।

৩২

আমাদের জগতাই গ্রামে প্রবীণতম ব্যক্তি ছিলেন গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী। রাধিকালাল চৌধুরীর পিতা। গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী শতায়ু ছিলেন। মৃত্যুর দু'তিন বছর আগেও প্রত্যহ সকালবেলায় একটি লাঠি হাতে নিয়ে তিনি গ্রাম পরিক্রমায় বেরোতেন!

বাইরের বাড়ির পশ্চিম ভিটায় একটি ঘরে তিনি বসতেন। খানদুত্তিন তক্তাপোশ জুড়ে তার উপরে ফরাস পাতা থাকতো, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ব'সে তিনি ধূমপান করতেন। মেঝের উপরে থাকতো ফরসি। বৃহন্নলা ফরসি। ফরসির মাথায় প্রকাণ্ড কলকে। চার-পাঁচ হাত লম্বা নলের ভিতর সঞ্চালিত হয়ে সুগন্ধি তামাকের ধোঁয়া পৌঁছতো বৃদ্ধের বদন-বিবরে। অনেক সময় নানা বয়সী লোকজন থাকতেন তাঁর কাছে। জ্যেষ্ঠের সম্মুখে কনিষ্ঠরা সেকালে ধূমপান করতেন না। তাঁদের ধূমপানের ব্যবস্থা অন্যত্র, রাধিকাবাবুর দক্ষিণ-দুয়ারী বৈঠকখানায়। সেখানে সারি সারি হুঁকো। কোনোটির উপরের অর্ধেকটা রূপো দিয়ে বাঁধানো। কোনোটির নলচের মাথায় কড়ি বাঁধা। কড়ি-বাঁধা হুঁকো ব্রাহ্মণদের জন্যে।

গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী মশাই-এর কাছে গ্রামান্তর থেকেও বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা আসতেন। এঁদের মধ্যে দহরপাড়ের পুলিন অধিকারী অন্যতম। পুলিন অধিকারী হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শচীন অধিকারীর বাবা। শচীনদা পরে অধিকারীর অধিকার ত্যাগ ক'রে সান্যাল পদবী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা চিরদিন অধিকারীই ছিলেন।

গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী মশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে এলে অধিকারী মশাই গ্রামের অন্যান্য ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গেও দেখা ক'রে যেতেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় একবার পুলিন অধিকারীর চমৎকার রসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর এই দিনের সরস উক্তি আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

আমাদের গ্রামবাসী ভদ্রলোকটি পুলিনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'অধিকারী মশাই, কেমন আছেন?'

অধিকারী মশাই বললেন—'আর 'কেমন আছি'।'

'কেন, কী হয়েছে?'

অধিকারী মশাই বললেন—'নতুন কিছুই হয়নি। জানোই তো আমার বাড়ির তিন দিকে ঐকার। এতেই বোঝো, কেমন আছি।'

'তিন দিকে ঐকার! সে আবার কি?'

অধিকারী মশাই গম্ভীর হয়ে বললেন—'আমার বাড়ির একদিকে বৈদ্য, আরেক দিকে কৈবর্ত আর বাড়ির সামনেই বৈরিগী। এতেই বোঝো, কেমন আছি।'

আরেকজন মাননীয় ব্যক্তি গ্রামান্তর থেকে জগতাই-এ গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী মশাইকে দেখতে আসতেন। তিনি একজন মহাজন। বৈষ্ণবপদাবলীর পদকর্তারা যে-অর্থে মহাজন, সে-অর্থে মহাজন নন ইনি। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের অর্থে অর্থশালী মহাজন। বহু লোকের সোনারূপার অলঙ্কার এঁর গৃহজাত হয়ে আছে। অনেক লোকের রেহানি তমসুকে আবদ্ধ জমি-জায়গা এঁর নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। তাই ব'লে ভদ্রলোকের সৎ-কার্য কিছু নেই, এমন কথা কেউ বলবেন না। প্রতি রবিবারে তিনি ভিখারীদের চা'ল ভিক্ষা দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক ভিখারীর জন্যে বরাদ্দ একমুষ্টি চা'ল। একটা মাটির কলসীর মধ্যে চা'ল ভরা থাকে। ব্যবস্থা আছে—ভিখারীরা নিজেরাই কলসীর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুষ্টিভরা চা'ল বার ক'রে নেবে। সম্মুখে একজন চাকর ব'সে থাকে,

কোনো ভিখারী যাতে এক মুষ্টির বেশি চা'ল না নেয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্যে।

চমৎকার ব্যবস্থা। ভিখারীরাও খুশী। যে-সব ভিখারীর হাতের পাঞ্জা বড়, তারা আরও খুশী। বড় পাঞ্জায় মুষ্টিও বড়।

কিন্তু কার্যকালে ছোট-বড় সকলেই সমান। কিবা শিশু, কিবা যুবা, কিবা বৃদ্ধ—সকলের ভাগ্যেই সমপরিমাণ চা'ল। কলসীটি মহাজন মহাশয়ের নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্ডার দিয়ে কুমোরকে দিয়ে তৈরি করা। যত বড় হাতের পাঞ্জাই হোক, স্বচ্ছন্দগতিতে ঢুকে যাবে কলসীর মধ্যে, কিন্তু চা'ল-ভরা মুষ্টি কিছুতেই বেরোবে না কলসীর মুখের ফোকর দিয়ে। বাধ্য হয়ে মুষ্টি আলগা করতে হয়, তার ফলে চা'লও কিছু প'ড়ে যায় কলসীর মধ্যে। হাতটি যখন কলসীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সামান্য কয়েকটি দানা অবশিষ্ট থাকে, হাতের মধ্যে।

এঁদের নাম মহাজন। নমস্য ব্যক্তি!

৩৩

সে-সময় আমাদের গ্রামাঞ্চলে নাটক নিয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা হলেও কথাসাহিত্য বা কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ চর্চা ছিল না। এ অঞ্চলে একমাত্র সাহিত্যিক ছিলেন ক্ষিতীনের দাদা যতীন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি কলকাতার সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর একখানি উপন্যাসও ছিল—'সুন্দরী'। দুখানা নাটকের পাণ্ডুলিপিও দেখেছি। একখানা—'সীতারাম'। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসের নাট্যরূপ। আরেকখানা—'চাঁদের হাট'। প্রহসন। এগুলি ছাপা হয়নি। কবিতা রচনার দিকে কখনও কোনো আগ্রহ দেখিনি যতীন্দ্রনাথের।

*

আমাদের গ্রামের হরিশ্চন্দ্র চাটুজ্জের বাড়িতে বীরভূম জেলার কলহপুর গ্রাম থেকে তাঁর একজন আত্মীয় এসেছিলেন আমাদের গ্রামে। নাম—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ইনি কবি। তখনকার কালে গান-রচনায় তাঁর খ্যাতি ছিল। বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সমবয়সীর মতো আলাপ-আলোচনা করতেন তিনি। আমরা তখন কিশোর। বয়োজ্যেষ্ঠ যুবকদেরও আমরা সমীহ ক'রে চলতাম। কিন্তু এই নবাগত প্রৌঢ়ের সঙ্গে

প্রাণ খুলে কথা বলতে আমাদের কোন সঙ্কোচ ছিল না। আমাদের নাই দিয়েছিলেন তিনিই।

তিনি গাইতেও পারতেন। আমরা যে কয়জন বন্ধু গাইতে পারতাম, তাদের তিনি তাঁর কয়েকটি স্বরচিত গান শিখিয়েছিলেন। সবই প্রাচীন-পদ্ধতিতে লেখা। উপমা, অলঙ্কারে ভরা।

এই ধরনের গানই আমাদের পল্লী-অঞ্চলে সেকালে খুব বেশি প্রচলিত ছিল। সব চেয়ে জনপ্রিয় ছিল নীলকণ্ঠের গান। আমি নীলকণ্ঠের অনেকগুলি গান শিখেছিলাম। প্রতিটি গানে নতুন নতুন মাধুর্যের আস্বাদ পাওয়া যেত। দুটি-একটি গানের কিছু কিছু অংশ শোনাই।

শ্রীমতী রাধিকার কাছে শ্রীকৃষ্ণ দাসখত লিখেছেন। প্রেমের অচ্ছেদ্য-বন্ধনের বন্ধকী তমসুক—

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী।
আমি বাঁধা আছি তব প্রেমে, বাজাই রাধা রাধা বলে বাঁশরি।
নিজ প্রয়োজন-কারণ,
করিলাম তব প্রেম-ঋণ,
আমি শুধিব শুধিব ঋণ
দিবা ও বিভাবরী।
লিখিতং শ্রী বাঁকানয়ন,
পিতা শ্রীনন্দরাজন,
সাকিন শ্রীবৃন্দাবন,
পেশা—গোপীর মন-চুরি।

অনুপ্রাস-অলঙ্কারে ভূষিত একটি গানের কিছু নমুনা দিই—

অঞ্জন-গঞ্জন রূপ কোন্ জন যমুনা-তীরে।
দুখ ভঞ্জন রঞ্জন করে বাঁকা খঞ্জন নয়নে হেরে।
বরিহা-বিরচিত স্থিরচিতচোর চূড়া শিরে,
মুকুলরূপী বকুল ফুল অনুকূল করেছে তারে,
সমাকুল রমণীকুল অলিকুল আকুল করে,
গন্ধে মনানন্দে মকরন্দ-আশে ঘুরে ফিরে।

* * *

কে বটে কালিন্দীর তটে তরুনিকটে করি আলা,
তড়িৎ মেঘে জড়িত যেন হৃদিসরোজ-বনমালা,

কণ্ঠ কয় নিশ্চয় পরিচয় নাহি জানে গোকুলবালা,
সেই সে কালা নন্দলালা, দেয় জ্বালা সে যুবতীরে ॥

আমাদের কবি গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই শ্রেণীর গীতিকার। তাঁর গানেও উপমা অলঙ্কারের সমৃদ্ধি।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের যমক-অলঙ্কারে সজ্জিত একটি গানের প্রথম দুটি চরণের উল্লেখ করি। একটি শব্দের আলাদা মানে বা আলাদা রূপ প্রদর্শন করার নাম যমক।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটি গানের গোড়াকার দুটি পঙক্তি—

এলোকেশে এলো কে সে সমরে।
হেন কে হবে, পশি' আহবে, এ বাম্যরে যেবা মারে
দানবে কি অমরে।

যমক হচ্ছে কথার খেলা।. উপমা তা নয়। উপমায় থাকে ভাবের ঐশ্বর্য। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্কুল-কলেজের উপমা দিয়ে অধ্যাত্ম-সাধনার কথা বলেছেন একটি গানে—

স্কুল-কলেজে কেন যাবি রে ভ্রান্ত মন!
ও নয় বিদ্যালয়, অবিদ্যার আলয়,
যেথা অর্থ যশ উপার্জন, দুরাশার অধ্যাপন,
যাতে বারে বারে ফেল হবি ঘুচাতে ভববন্ধন।
পরাবিদ্যা বিজ্ঞান শিখিবিরে আত্মদর্শন,
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর রে মন অধ্যয়ন,
মোহ-মূর্খতানাশক ধরো গুরু সুশিক্ষক,
লও দীক্ষা হাতে খড়ি করো রে পাঠ আরম্ভন।
সংযম-বেঞ্চেতে বসি পরো বেশ সদাচার,
সম্মুখে টেবিল রাখো অষ্টাঙ্গ যোগাধার,
সুনিয়ম প্রাণায়ামে পূরক কুম্ভক ক্রমে
সুখে করো শুভঙ্করী অজপার সুসাধন।
ক্ষিতি আদি পঞ্চতত্ত্ব, ক্ষেত্রতত্ত্ব পঞ্চাধ্যায়,
পরিমিতি বাতপিত্তকফাদি ধাতুনিচয়,
হৃদয়-স্লেটোপরি ভক্তির পেন্সিল ধরি;
বীজমন্ত্রে করো রে মন, বীজগণিত সমাপন।

শিখো রে পিঙ্গলা ইড়া সুষুম্নার ইতিহাস,
স্বাস্থ্যরক্ষা ব্রহ্মচর্য যতনে করো অভ্যাস,
ভূগোল-খগোল-তত্ত্ব শিখিবে সকল তথ্য,
ষট্‌চক্র মানচিত্র করো রে মন অন্বেষণ।
ব্যাকরণ বিবেক সহ সুসাহিত্য হরিনাম
সাধো রে গোবিন্দ, তব পূর্ণ হবে মনস্কাম,
সংসারে পরীক্ষা হ'লে পাস হবি অবহেলে,
নির্বাণ মেডেল পাবি, শান্তিধামে প্রমোশন।

অনুপ্রাসেও অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ক-এর অনুপ্রাস-অলঙ্কারে দিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরকে চমৎকার সাজিয়েছেন—

কেশব কমলাকান্ত কমলাক্ষ কালবারী।
কমলকর কমলাকর কিরীটি-কৌস্তভ-ধারী।
কৈটভারি কাশ্যপেয় কশিপু-কায়-বিদারক,
করাল কর্বুরকুলপতি-কুলান্তকারক
কালীয়-কালকূটহারী কুহকী ক্রুর কেশী-অরি,
কুবলয়-কুঞ্জর-নাশক কংস-করী-কেশরী।
কোমল কিশলয় কুবলয়কান্তি কলেবর,
কেকীপুচ্ছকৃত চূড়া কোটি কাম মনোহর,
কালিন্দী-জলকল্লোল কোলাহল কুতূহল,
কটাক্ষে কুসুম শরে কামিনীকুলাকুলকারী।
কুরসে কুসঙ্গে মজে কুকর্ম করেছি কত,
কি হবে কালান্তকালে কাল গত কালাগত,
কৃতান্ত-কিঙ্কর-কোপে কাতরে গোবিন্দ কাঁপে,
করুণাকর, করুণা কর অভয় পদে রাখো হরি।

৩৪

আমাদের এ অঞ্চলে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাকীর্তন পদাবলীর পদকর্তা দু'জন মহাজনকবি ছিলেন: সৈয়দ মর্তুজা আর নরহরি দাস। সৈয়দ মর্তুজার আবাসভূমি ছাপঘাটি আর নরহরি দাসের নিবাস ছিল রেয়াঁপুরে।

সৈয়দ মর্তুজা সম্বন্ধে অনেক মনীষী ব্যক্তি অনেক কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুরুদাস সরকার আর চিত্তপ্রিয় মিত্র।

গুরুদাস সরকার মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর চতুর্বিংশ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের নাম—'সূতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্তুজার আবির্ভাব কাল'। প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩২৫ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে সূতীর পুরাবৃত্ত প্রসঙ্গে গুরুদাসবাবু লিখেছেন—'কথিত আছে যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি নরহরি দাস খৃঃ সপ্তদশ (শতাব্দীর) শেষভাগে জঙ্গীপুর মহকুমার রেয়াঁপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।'

গুরুদাসবাবুর কাছ থেকে এই কথা শুনে জঙ্গীপুরের সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কৈলাসপতি ঘোষ তাঁকে বলেন, এই রেয়াঁপুর নাকি লালগোলা থানার পানিশালা গ্রামের সন্নিহিত।

জানি না, লালগোলা থানার অন্তর্গত রেয়াঁপুর নামে কোনো গ্রাম আছে কি না। যদি থাকেও বা, তাহলেও যথাযথ প্রমাণসিদ্ধ তথ্য না পাওয়া গেলে সূতী থানার অন্তর্গত রেয়াঁপুর গ্রামকেই বৈষ্ণবপদকর্তা নরহরি দাসের জন্মস্থান বলে স্বীকার করা উচিত।

পদকর্তা নরহরি দাসকে পাওয়াই যথেষ্ট নয়—পদকর্তার পদের সন্ধান করা প্রয়োজন। এ কার্য সহজসাধ্য নয়। গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরু থেকে ডক্টর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের বৈষ্ণব পদাবলী পর্যন্ত অদ্যাবধি পদাবলীর যতগুলি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নরহরি নামক পদকর্তা মাত্র দু'জন—নরহরি সরকার আর নরহরি চক্রবর্তী। নরহরি সরকার জাতিতে বৈদ্য আর নরহরি চক্রবর্তী মহাশয় ব্রাহ্মণ। দু'জনেই বৈষ্ণব-সমাজে পূজনীয় ব্যক্তি।

পদাবলীর পদগুলিতে পদকর্তাদের ভনিতা দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, তাঁরা কোন্ কুলোদ্ভব। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ-নির্বিশেষে তাঁরা সকলেই দাস। একই নামের বিভিন্ন পদকর্তা প্রত্যেকেই দাস। কোন দাসের পদ অন্য কোন দাসের পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা, তার সম্যক সমীক্ষণ বোধ হয় আজ পর্যন্ত হয়নি। কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি এই মহৎ কার্যে অগ্রসর হন, তাহ'লে রেয়াঁপুরের নরহরি দাসের পদও আবিষ্কৃত হ'তে পারে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

গুরুদাসবাবু অনুমান করেন—সৈয়দ মর্তুজা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম—সৈয়দ হোসেন কাদেরী। ঐতিহাসিক

নিখিলনাথ রায় তাঁর 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—'প্রবাদ মতে মর্তুজা জঙ্গীপুরে বালিঘাটায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ প্রবাদের মূলে কতটা সত্য নিহিত আছে—অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

গুরুদাস সরকার বলেন—"সুতীর সহিত 'মর্তুজা হিন্দ্' বা বিখ্যাত পদ-রচয়িতা ও সাধক সৈয়দ মর্তুজার স্মৃতি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। গঙ্গাতীরে সতীদহের নিকট তাঁহার আস্তানা অবস্থিত ছিল। এই স্থানেই তিনি ও তাঁহার ভৈরবী, ব্রাহ্মণকন্যা আনন্দময়ী সমাহিত হইয়াছিলেন। পাশাপাশি অবস্থিত গোর দুইটি এখন নদীগর্ভে স্থান পাইয়াছে।*** বদ্ধজল চলিত কথায় এ অঞ্চলে 'ডামশ' বলিয়া পরিচিত। এই ডামশের ধারেই সৈয়দ মর্তুজার দর্গাহ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুনিতে পাই ডামশের দর্গাহ সন্নিহিত অংশটি 'সতীদহ' নামে অভিহিত হইত।"

৩৫

১৩৭৯ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যা রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় চিত্তপ্রিয় মিত্র তাঁর "বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্তুজা ও সুফি মর্তুজানন্দ" নামক প্রবন্ধে বহু অজ্ঞাত-পূর্ব তথ্যের অবতারণা করেছেন।

চিত্তপ্রিয় মিত্রের প্রবন্ধে প্রকাশ—"১১৬৪ সালে সাধক-কবি হেয়াৎ মামুদ তাঁর লিখিত 'আম্বিয়া বাণী'তে সৈয়দ মর্তুজাকে বন্দনা করতে বলেছেন—

'সৈয়দ মর্তুজা বন্দো করিয়া ভকতি…'

"এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে সৈয়দ মর্তুজা এ সময়ে একজন বিশিষ্ট সাধকরূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ১১৫৬ বঙ্গাব্দে রানী ভবানীর স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দলিলে মর্তুজানন্দের নামে ১০০ শত বিঘা জমি দানের উল্লেখ দেখা যায়। তার নিদর্শন দেওয়া গেল। এই সঙ্গে উল্লেখ্য, আমার সংগ্রহ রানী ভবানীর স্বাক্ষরযুক্ত দলিল। ৩২শে শ্রাবণ, ১১৫৬।

"ফার্সী ভাষায় লিখিত নিম্নবর্ণিত দলিলে সরকারী মহাফেজখানার শীলযুক্ত আদেশনামায় স্থানীয় কর্মচারীকে সুতী এলাকায় চোর ডাকাত ও দুষ্কৃতকারীদের দৌরাত্ম্য হতে মর্তুজার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দলিলটিতে মর্তুজাকে 'স্বর্গীয় জ্যোতিঃ' বলা হয়েছে। মুসলমান পীরের নামে রানী ভবানী একশত বিঘা জমি দান করেছেন। তার নিদর্শন হিসাবে দলিলটির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। দলিলটি ভারতের ধর্মীয় উদারতার পরিচয় বহন করে

এবং এটি জাতীয় সংহতিরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।...শাহ আলমের শীলমোহর যুক্ত দলিল। সন ১১৯২ হিজরী।"

সৈয়দ মর্তুজার মর্তুজানন্দ নাম-গ্রহণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন চিত্তপ্রিয় মিত্র মহাশয়। এ বিষয়ে তিনি সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের "কিম্বদন্তীর দেশে" গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। চিত্তপ্রিয় মিত্র বলেন—"নিঃসন্তান এক ব্রাহ্মণ পরিবার সন্তান কামনায় সাধক মর্তুজার কাছে প্রার্থনা জানায়। মর্তুজার আশীর্বাদে তাঁদের কন্যাসন্তান হ'লে নাম রাখা হয় আনন্দময়ী। আনন্দময়ীকে তাঁর পিতামাতা কৃতজ্ঞতাবশতঃ সাধকের নামে উৎসর্গ করেন।" পরবর্তী কালে মর্তুজা ও আনন্দময়ী চণ্ডিদাস ও রামী রজকিনীর মত একত্রে সাধন-ভজন করেন। এবং নিজের নামের সঙ্গে আনন্দময়ীর নামের সংযোগ-সাধন ক'রে সৈয়দ মর্তুজা হন মর্তুজানন্দ।

এ সব তথ্য পরিবেশন ক'রেও চিত্তপ্রিয় মিত্র মহাশয় লিখেছেন— "কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় সাধক মর্তুজানন্দ ও কবি সৈয়দ মর্তুজা কি একই ব্যক্তি?"

এরূপ প্রশ্ন নূতন নয়। চণ্ডিদাসের সহজিয়া সাধনার রাগাত্মিকা পদগুলিকে এক শ্রেণীর বৈষ্ণব ভক্ত বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডিদাসের রচনা ব'লে স্বীকার করেন না। এঁদের ধারণা ঐ পদগুলি চণ্ডিদাসের ভণিতা থাকলেও অন্য কোন কবির রচনা।

চিত্তপ্রিয় মিত্র মহাশয় বলেন—"সুফী সাধক সৈয়দ মর্তুজানন্দ তান্ত্রিক ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি যে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন এমন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কবির ভণিতায়ও মর্তুজানন্দ নামের সংযোজনা দেখা যায় না। রাজমহলের নিকট রাজগাঁও স্টেশন সংলগ্ন আড়ুয়া গ্রামে দুইটি মাটির ঢিপি আছে। স্থানীয় কিংবদন্তী মর্তুজা ও আনন্দময়ী প্রতি বৎসর কিছু সময় ঐ স্থানে সাধনভজন করতেন। তিনি যে কবি ছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর বর্তমান বংশধরেরা বিন্দুবিসর্গ অবহিত নন। তাঁর স্থিতি ছিল বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রাজমহলের দিকে। কবিতাগুলি সংগৃহীত হয়েছে পূর্ব সীমান্তে সুদূর চট্টগ্রামে। সুতরাং বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্তুজা ও সুফী সাধক মর্তুজানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি কি না, তার চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।"

মিত্র মহাশয়ের "সুতরাং" শব্দটি কিন্তু দুর্বল, যুক্তিগ্রাহ্য নয়। পূর্ব সীমান্ত চট্টগ্রামে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সৈয়দ মর্তুজার চারটি পদ পেয়েছিলেন 'রাগমালা' নামে একটি সংকলন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির মধ্যে। সে সংকলন-গ্রন্থে

কেবল সৈয়দ মর্তুজাই বা কেন বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের আরও একাধিক কবির গান অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না কে বলতে পারে? একখানি সংকলন-গ্রন্থ চট্টগ্রামে পাওয়া গেল ব'লেই, সে গ্রন্থের পদকর্তারা সকলেই চট্টগ্রামের অধিবাসী, এটা ধারণা করা ঠিক নয়।

মিত্র মহাশয় বলতে চান—মর্তুজানন্দের "স্থিতি ছিল বাংলার পশ্চিম সীমান্তে রাজমহলের দিকে।" ১১৫৬ সালের ৩২শে শ্রাবণ তারিখে সম্পাদিত মর্তুজানন্দের নামে রানী ভবানীর একশো বিঘা জমি দানের দলিলখানি তো মিত্র মহাশয় সংগ্রহ করেছেন। সেই দলিলে দাতা ও গ্রহীতা ও উভয়েরই নামের সঙ্গে তাঁদের বাসস্থানের ঠিকানাও নিশ্চয়ই লেখা আছে। সেই দলিলখানি আর একবার ভাল ক'রে দেখলে তাঁর সংশয়ভঞ্জন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

৩৬

গুরুদাস সরকার মহাশয় সুতীর পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন। কেবলমাত্র সুতীর বিবরণই নয়, প্রসঙ্গক্রমে সমাশরগঞ্জ থানার জীয়ৎকুঁড়ি বা জীবন্তকুণ্ডের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। তিনি নিমতিতার জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে জীয়ৎকুঁড়ি গিয়ে জীবন্তকুণ্ড পুষ্করিণীর ধারে একটি পাথরের দরজার পাল্লা দেখতে পেয়েছিলেন। পাথরের পাল্লায় দেবদেবীর মূর্তি তিনি দেখেছিলেন। মূর্তিগুলি সিঁদুরের প্রলেপে অস্পষ্ট। আমি দেখেছি, সে বস্তুটি পাথরের কপাট নয়—সেটি কতকগুলি দেবদেবীর মূর্তির সমন্বিত একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস গ্রন্থের ১৮০-১৮৫ পৃষ্ঠায় জীয়ৎকুঁড়ি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়। নিখিলনাথ রায় লিখেছেন—"* * * একটি স্থানের সঙ্গে হোসেন সাহার (শাহ?) নাম বিজড়িত আছে। সাধারণ লোকে এই স্থানটিকে 'জীয়ৎকুঁড়ি' বলিয়া থাকে। জীয়ৎকুঁড়ি জীবন্তকুণ্ডের অপভ্রংশ। * * * যে কুণ্ডের নামানুসারে স্থানটির নামকরণ হইয়াছে, তাহা এক্ষণে একটি ক্ষুদ্রায়তন পুষ্করিণীর জলশূন্য পরিণাম বলিয়া বোধ হয়। পুষ্করিণীটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এককালে তাহা যে অত্যন্ত গভীর ছিল, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর উচ্চ পাহাড়ীর উপরিভাগে চারিদিকে কিছুদূর ব্যাপিয়া ইষ্টকনির্মিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ ও দেবদেবীর ভগ্ন প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শুষ্ক পুষ্করিণীর গর্ভে একটি অর্ধপ্রোথিত দেবীমূর্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। পাহাড়ীর উপরিস্থিত

ইষ্টকস্তূপ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেবদেবীর মূর্তিদর্শনে সহজেই অনুমান হয় যে ঐ কুণ্ড বা পুষ্করিণীর পাহাড়ে এক বা ততোধিক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার কিছু দূরে একটি বৃহদায়তন পুষ্করিণী ও ইতস্ততঃ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই স্থান হইতে অনেক লোকে রাশি-রাশি ইষ্টক উত্তোলন করিয়াছে। ঐ সকল ইষ্টক আয়তনে ক্ষুদ্র এবং দেখিলেই সহজে প্রাচীনকালের ইষ্টক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। জীয়ৎকুঁড়ির উত্তর দিকে একটি প্রশস্ত ইষ্টকময় রাজপথের কিয়দংশ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা এক্ষণে মৃত্তিকাবৃত। ইহার নিকটস্থ কৃষকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্র ও মুদ্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ফলতঃ স্থানটি পর্যবেক্ষণ করিলে এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীন কালে এখানে কোন একটি সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির বাসভবন ছিল। এক্ষণে উক্ত স্থানের যাহা কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। উক্ত বিবরণ একমাত্র প্রবাদ-মুখনিঃসৃত হওয়ায় সতর্কতার সহিত গ্রহণ করাই কর্তব্য।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, যৎকালে হোসেন সাহ গৌড়ের একাধীশ্বর-রূপে বঙ্গদেশে আপনার প্রভুত্ব ও গৌরব বিস্তার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ স্থানে একজন ব্রাহ্মণ জমিদার বাস করিতেন। জনৈক তীবর (তীওর) ভৃত্য তাঁহার যারপরনাই প্রিয়পাত্র ছিল। ক্রমে ক্রমে সে ব্রাহ্মণের জমিদারী কার্যে সর্বপ্রধান কর্মচারী হইয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ জমিদার নিঃসন্তান ছিলেন। এক সময়ে তিনি তীর্থপর্যটনমানসে উক্ত তীবর কর্মচারীর প্রতি জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক স্বভবন হইতে বহির্গত হন। নানা তীর্থ পর্যটন করিতে তাঁহার প্রত্যাগমনের বহু বিলম্ব ঘটায় তীবর উচ্চ আশার বশবর্তী হইয়া প্রভুর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং ব্রাহ্মণের অলীক মৃত্যুসংবাদ রটাইয়া দানসূত্রে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন। কিন্তু স্বীয় তীবর কর্মচারীর কৌশল ভেদ করিতে সমর্থ না হওয়ায় চিরদিনের জন্য ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নিঃসন্তান হওয়ায় পূর্ব হইতে ব্রাহ্মণের সংসারের প্রতি অনাসক্তি জন্মে, এক্ষণে তীর্থপর্যটনে তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি তীবরের অসদ্ব্যবহারের কোনই চেষ্টা করেন নাই। ইহার পর হইতে তীবর নিষ্কণ্টকে ব্রাহ্মণের বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং অল্পদিনের মধ্যে এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে যে উক্ত অঞ্চলে সে 'তীওর রাজা' নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।

"তীওর রাজা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অভিমান ও দম্ভের সঞ্চার হইতে লাগিল এবং নিজে স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সে সময় পাঠান রাজাধিরাজ হোসেন সাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকায় তীওর রাজা সহজে যে স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য ধীরে ধীরে তিনি নিজের সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। কিছুদিন পরে তাঁহার সৈন্যদল গঠিত হইলে তিনি হোসেন সাহর সহিত রণপরীক্ষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। * * * এইরূপ কথিত আছে যে, হোসেন সাহর মাতা একআনা চাঁদপাড়া হইতে শিবিকারোহণে রাজধানী গৌড় গমন করিতেছিলেন, তীওর রাজার জমিদারীর মধ্য দিয়া রাজপথ প্রচলিত থাকায় সাহজননীকে সেই পথ দিয়া যাইতে হয়। তাঁহার সহিত সামান্যমাত্র লোকজন ছিল। তীওর রাজা হোসেন সাহর অবমাননার ইচ্ছায় সেই অল্প-সংখ্যক লোককয়টির আক্রমণের জন্য স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য তাহাতে বাদসাহের লোকজন পরাজিত হয় এবং সাহজননীও যারপরনাই অবমাননা ভোগ করিতে বাধ্য হন। হোসেন সাহ পূর্ব হইতে এই ক্ষুদ্রপ্রাণ জমিদারের বিদ্রোহলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু স্পষ্টতঃ বিদ্রোহের কোন কার্য দেখিতে না পাওয়ায় তাহার শাসনে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। এক্ষণে নিজের অবমাননাকর সংবাদ পাইয়া তিনি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন যে অচিরাৎ সেই বিদ্রোহী তীওররাজের বিনাশসাধনের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। রাজাদেশে তথায় একদল সৈন্যও প্রেরিত হইল, কিন্তু সৈন্যদল সহজে তীওররাজের রাজধানী আক্রমণে সক্ষম হইল না। তাঁহার সৈন্যগণ এইরূপ উৎসাহসহকারে যুদ্ধ করিতেছিল যে, গৌড়েশ্বরের সেনাপতি তাহাদিগকে সহজে পরাজয় করা অসম্ভব মনে করিলেন। তাহাদের উৎসাহ দেখিয়া সকলের বোধ হইল, যেন তীওররাজের মৃত সৈন্যগণ পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ লোকে এইরূপ রটনা করিয়া দিল যে, তীওররাজের সৈন্যগণের মৃতদেহ নিকটস্থ কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াতেই উহারা পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বাদসাহের সেনাপতি তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, একটি গো-হত্যা করিয়া কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপের আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইলে কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্তর্হিত হইয়াছেন মনে করিয়া তীওররাজের সৈন্যগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে এবং বাদসাহের সেনাপতিও জয়লাভে সমর্থ হন। তৎকালে সাধারণ

লোকের এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, গো-হত্যায় জন্য কুণ্ডের জল অপবিত্র হওয়ায় দেবীর অন্তর্ধানে তাহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি তিরোহিত হয় এবং তীওররাজের সৈন্যগণ পুনর্জীবিত হইতে না পারায় তাহাদের পরাজয় সংঘটিত হইয়াছিল। এই প্রবাদ অদ্যাপ উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত রহিয়াছে। * * * তীওররাজের সৈন্যগণ কুণ্ডাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মহিমায় পুনর্জীবিত হওয়ার বিশ্বাসে লোকে উক্ত কুণ্ড বা পুষ্করিণীর 'জীবৎকুণ্ড' বা 'জীয়ঁৎকুঁড়ি' আখ্যা প্রদান করে। অদ্যাপি তাহা সেই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। জীয়ঁৎকুঁড়ির গর্ভে যে অর্ধপ্রোথিত দেবীপ্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই লোকে উক্ত কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বিশ্বাস করে। উহা কোন্ দেবতার মূর্তি তাহা বুঝিতে পারা যায় না।"

এই মূর্তি আমি দেখেছি। কিন্তু আমি যখন দেখেছি সে সময় সেটি অর্ধ-প্রোথিত অবস্থায় নয়—সম্পূর্ণ আকারে। অর্ধপ্রোথিত অবস্থা থেকে বিগ্রহ খোদাই করা সেই প্রস্তরখণ্ডটি শুষ্ক কুণ্ডের অনতিদূরে রাস্তার ধারে সংরক্ষিত ছিল। মূর্তি অস্পষ্ট—স্থানীয় ভক্তদের সিঁদুর অথবা রক্তচন্দনের দ্বারা প্রলিপ্ত। একবার নয়, অনেকবার গেছি জীয়ঁৎকুঁড়িতে। প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে নয়, পারিবারিক প্রয়োজন।

জীয়ঁৎকুঁড়ির কাছেই ধুসরিপাড়া গ্রাম। এই গ্রামে আমাদের একটি বাঁশবাগান ছিল। আমার পিসতুতো দাদা সতীশচন্দ্র সরকার তার তত্ত্বাবধান করতেন। ধুসরিপাড়ায় থাকতেন আমার দুই পিসীমা। এক পিসীমার তিন ছেলে—সতীশচন্দ্র সরকার, মুকুন্দসুন্দর সরকার আর মোহিনীমোহন সরকার। অন্য পিসীমার ছেলে বোধ হয় চার জন—রমেশচন্দ্র সরকার, রোহিণীকুমার সরকার, নরেন্দ্রনাথ সরকার; চতুর্থজনের নাম মনে নেই।

সতীশদা ধুসরিপাড়াতেই থেকে গৃহস্থালি দেখতেন। মুকুন্দদা জঙ্গীপুরের খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে গিয়ে ওকালতি করেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত (মুকুন্দদার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এখনও আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়)। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, সে-সময় মোহিনীদা কলেজের ছাত্র, বোধ হয় বি. এ পড়েন। মোহিনীদা খুবই ভালোবাসতেন আমাকে। তাঁর জীবনের শোচনীয় পরিণতির কথা পরে বলব।

রমেশদার ছেলেও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুনেছি। বছর দুই আগে তাঁর পৌত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

দহরপাহাড়ের অন্নদাচরণ গাঙ্গুলীর পুত্র রমাভূষণ আমার সহপাঠী বন্ধু ছিল। রমার পিতা অন্নদাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয় যে একজন কবি ছিলেন—এ-কথা জানতাম না। খবরটি পেলাম গুরুদাস সরকার মহাশয়ের সুতীর পুরাবৃত্তের মধ্যে। গুরুদাসবাবু লিখছেন—"জঙ্গীপুরের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, সোদরোপম বন্ধু শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় আমাকে দহরপাহাড় গ্রামবাসী অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামক কোনও প্রবীণ ভদ্র মহোদয়ের রচিত একখানি হস্তলিখিত পুঁথি আনিয়া দেন। ইহাতে অনেক স্থানীয় প্রবাদ কবিতাকারে গ্রথিত ছিল। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখন পরলোকে। * * * আমি গ্রন্থকর্তার টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতিতে স্থানীয় জনপ্রবাদ অবিকৃত আকারে রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া, উহা ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আসিতে পারে মনে করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে সেগুলি প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থাদির পোষকতা অনুযায়ী স্থানে স্থানে সুতীর পুরাবৃত্তে অনুশীলন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে।"

গুরুদাসবাবু লিখেছেন—"শুনিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃঃ অব্দে), রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিবার পূর্বে, চৈতন্যদেব রামকেলি নামক বৈষ্ণব তীর্থস্থানে গমনকালে সুতীতে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়ে রামকেলি-গমন প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—

'হেন মতে প্রভু সর্ব জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্ত গোষ্ঠী লৈয়া॥
গঙ্গাতীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান পানে গঙ্গার পুরিল মনোরথ॥
—(শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়
সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ)

"চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ এবং প্রভু নিত্যানন্দের শিক্ষামত কয়েকজন গোপ বালক তাঁহাকে উটা পথ দেখাইয়াল্ দিলে, গঙ্গাতীরস্থ সেই পথ অবলম্বন করিয়া নদীয়াভিমুখে প্রত্যাবর্তনের কথা বেশ মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পবিত্র তীর্থরূপে বিবেচিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুঁথিতে শ্রীচৈতন্যের সুতীতীর্থে স্নানাদি বিষয়ক কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে।"

গুরুদাসবাবু লিখেছেন—"প্রবাদ এই যে, আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে মোগল-সেনাপতি মুনিম (মুনাইম?) খাঁ রাজমহলের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত

করিয়া পুরাতন মোঙ্গলপুরে বাজার সংস্থাপিত করেন। গাঙ্গুলী মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত প্রবাদগুলির মধ্যে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। মোগল বা মোঙ্গলগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই গ্রামটির নাম নাকি 'মোঙ্গলপুর' হইয়াছিল। মঙ্গলপুরের নামোৎপত্তি কোনও এক রাজা মঙ্গল সেনের নামানুসারে হইয়াছিল, এরূপ কিম্বদন্তীও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না।"

"মোগল-সেনাপতির আদেশ মত 'বাজার' প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রবাদটি সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, বোধ হয়, গৌড় গমনের পূর্বে, উড়িষ্যার বিদ্রোহী পাঠানদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া, সুতী হইয়া টাঁড়া যাইবার সময় মোঙ্গলপুর সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে। ইহার পরবর্তী কালে—প্রবাদ মতে বাদসাহ আওরংজীবের রাজত্ব সময়ে পুরাতন মোঙ্গলপুর পরিত্যক্ত হইয়া নূতন মোঙ্গলপুর প্রতিষ্ঠিত হয়।*** অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রণীত আওরংজীবের রাজত্বকালের ইংরাজী ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে ৮ই জুন তারিখে মোগল-সেনাপতি মীরজুমলা যখন সুতী স্কন্ধাবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, রাজকুমার মহম্মদ তখন দোগাছি শিবির হইতে পলায়ন করিয়া, পিতৃব্য সুজার কন্যা, নিজ বাগ্‌দত্তা পত্নী গুলরুখ বেগমের পাণিগ্রহণ করেন। ইহার পর সুজার সৈন্যদল ও নওয়ারার আক্রমণ ফলে সুতী হইতে সম্রাটের সৈন্যদিগকে অপসৃত করিতে হয়। মীরজুমলা সুতীর নিকট গঙ্গা পার হইয়া উত্তর-পূর্ব দিকে টাঁড়া অভিমুখে গমন করিবার যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই অবগত হওয়া যায়।"

এরপর মীরজুমলা আবার সুতীতে ফিরে এলে চিলামারির কাছে ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে সুজার সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তখন রাজমহল থেকে সুতী পর্যন্ত মোগলবাহিনী বিস্তৃত হয়েছিল। যুদ্ধ চলেছিল এক বৎসর ধরে। এরই সমকালে প্রতিষ্ঠিত হয় অরঙ্গাবাদ। ঐতিহাসিকেরা বলেন—প্রথমে অরঙ্গাবাদই ছিল মহকুমা শহর। কিছুকাল পরে মহকুমা অরঙ্গাবাদ থেকে জাঙ্গিপুরে স্থানান্তরিত হয়।

গুরুদাসবাবু বলেন—"এই সময়ে (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে) প্রেমসিংহ হাজারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সেনানায়কের এই অঞ্চলে বসবাস করার কথা গাঙ্গুলী মহাশয়ের পূর্বোক্ত প্রবাদ-সংবলিত হস্তলিখিত কবিতা পুস্তকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়।* * * প্রেমসিংহের বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন।

শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয়ের সৌজন্যে নিম্নে ইহাদের একটি বংশলতিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রেমসিংহ হাজারি
|
শ্রীরাম সিংহ
|
মনসারাম সিংহ
|
হরভজন সিংহ
|
জগমোহন সিংহ
|
বেণীমাধব সিংহ (ইনি জীবিত রহিয়াছেন)

"প্রেমসিংহ হইতে বেণীমাধব পর্যন্ত পাঁচ পুরুষের ব্যবধান মাত্র। এক এক পুরুষ গড়ে ৪০।৫০ বৎসর করিয়া ধরিলে ছয় পুরুশে প্রায় আড়াই তিন শত বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়। মোটামুটি ২৫০ বৎসর ধরিয়া লইয়া বর্তমান সন ১৯১৮ খৃঃ অঃ হইতে বাদ দিলে ১৬৬০ খৃঃ অঃ পর্যন্ত পৌছে। আওরঙ্গজীবের রাজত্বকাল (১৬৫৮-১৭০৭), সুতরাং বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বকালে প্রেমসিংহ হাজারীর সুতী আগমন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।"

আমি বেণীমাধব সিংহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলাম। বর্তমানে অরঙ্গাবাদের সন্নিহিত বক্‌সিরাপাড়া গ্রামেই কয়েক ঘর ক্ষত্রিয় বাস করেন। বেণীমাধব সিংহ নামে এঁদের কোনো পূর্বপুরুষ ছিলেন বলে এঁরা জানেন না।

গুরুদাসবাবু বলেছেন বেণীমাধব সিংহ "অদ্যাপি" বর্তমান আছেন। তাঁর সেই অদ্যাপি ১৯১৮ খৃঃ অঃ। সে সময় আমার বয়স ২৯ বৎসর। এ সময় অরঙ্গাবাদ, মঙ্গলপুর, দহরপাহাড় অঞ্চল আমার সুপরিচিত ছিল। আমিও অরঙ্গাবাদ-বক্‌সিরাপাড়া অঞ্চলে কোনো বেণীমাধব সিংহের কথা জানি না। কেবলমাত্র একজন ক্ষত্রিয়ের কথা মনে হচ্ছে, তিনি আমাদের জগতাই গ্রামের পশ্চিমস্থ শেরপুরে থাকতেন। বেশ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা, সুবিন্যস্ত একজোড়া গোঁফ। তাঁর একটি ছেলে ছিল। ছেলেটির নাম বোধ হয় উপেন্দ্রনাথ সিংহ। জানি না, এই বৃদ্ধই বেণীমাধব সিংহ কি না। স্থানীয় অশীতিপর বৃদ্ধেরা হয়তো সঠিক বিবরণ দিতে পারবেন।

গুরুদাসবাবু লিখেছেন—"নূতন মঙ্গলপুর সংস্থাপনকালে তথায় একটি সুন্দর স্নানাগার নির্মিত হইয়াছিল। *** স্থানীয় মধ্যইংরাজি বিদ্যালয়ের নিকট

এই স্নানাগারের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন স্নানাগার খননকালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—Babu R. S. of Aurangabad utilised a few (of the enamelled bricks) in repairing an old brick wall. They were excavated out of the walls of the Bath which stood near Aurangabad M. E. School : remains can still be seen."

আমরা অরঙ্গাবাদ অঞ্চলে একটা বাগানের মধ্যে একটি চতুষ্কোণ ইঁদারা দেখেছিলাম। তার এক পাশ থেকে সিঁড়ি নেমে গিয়েছিল ইঁদারার তলদেশ পর্যন্ত। অযত্নরক্ষিত ইঁদারা। উপর থেকে সিঁড়িও বড় একটা দেখা যেত না। এ ধরণের ইঁদারা সচরাচর দেখা যায় না। শুনলাম, এটি নাকি নবাবী আমলের ইঁদারা। হয়তো ঐ স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ স্মৃতিচিহ্ন এই ইঁদারাটি।

গুরুদাসবাবু তাঁর "সূতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্তুজার আবির্ভাব" সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করেছেন। সবগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

৩৭

১৯০৫ সনের ২০শে জুলাই। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের স্মরণীয় দিবস। লর্ড কার্জন চাকরি ছেড়ে বিলেত চ'লে যাবার অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে প্রয়াণ-পদাঘাত দিয়ে গেলেন সমগ্র বাঙালীজাতির বুকের উপরে। দ্বিখণ্ডিত হ'লো দেশ। এক অংশে প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ, বিহার, উড়িষ্যা আর ছোটনাগপুর নিয়ে বাংলা ; অপরাংশে রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আর আসাম নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গবর্নর হলেন স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার।

সারা বাংলাদেশে বিক্ষোভের ঝড় উঠ্‌লো। এ এক অভিনব জাতীয় জাগরণ। আমরা—পল্লীবাসীরা—দেশাত্মবোধের কোনোই ধার ধারতাম না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—কথাটা শোনা ছিল। জননীর কথা বুঝতে পারতাম, জন্মভূমিও যে স্বর্গাদপি গরীয়সী—এর কোন মানে বুঝতে পারতাম না। মানে বুঝিয়ে দিলেন একদিন একজন মুসলমান বক্তা—মৌলবি দীনমহম্মদ

আর একজন গায়ক—রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানে বুঝিয়ে দেওয়াই নয়, তাঁরা যেন দেশাত্মবোধের ইঞ্জেকশন দিয়ে আমাদের মুমূর্ষু দেহে প্রাণসঞ্চার ক'রে গেলেন।

তাঁরা এসেছিলেন কলকাতা থেকে স্বদেশ-আন্দোলনের প্রচার-কার্যে। উন্মুক্ত প্রান্তরে সভার অধিবেশন হ'লো। সভার উদ্বোধন হ'লো রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে—

দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ অনশনে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে,
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্রসূর্যবংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জারাহু মুখে লীন।
তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে যাহা ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভূষি শেষে
হায় গো রাজা কি কঠিন
সুচ সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দিয়াশলাই কাঠি তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে শুতে রৈতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।
আজ যদি এ রাজত্ব ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
পরবে কি লোক সবে দিগম্বরের সাজ—
বাকল, ট্যানা, ছেঁড়া ডোর কোপীন॥

মন্ত্রমুগ্ধ জনমণ্ডলী। নিস্তব্ধ সভাস্থল। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বক্তৃতা দিতে উঠলেন মৌলবি দীনমহম্মদ। বক্তৃতা নয়—অগ্নিবর্ষণ। ইংরেজ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করেছে, বক্তা শাসক ইংরেজের চরিত্র ব্যবচ্ছেদ ক'রে ইংরেজ-জাতির কদর্য রূপটি উদঘাটিত ক'রে তুললেন। ভাষণের মাঝে মাঝে পৌরাণিক-উপাখ্যান, মহাভারতের চিত্র, গীতার উপদেশ অনর্গল অবিশ্রান্তভাবে উল্লেখ ক'রে এই মুসলমান বক্তা শ্রোতাদের বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে দিলেন। স্বদেশী-গ্রহণ ও বিলাতী বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল সভামণ্ডপে। রাজকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেন—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতার সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু তাই বেচে কাচ সাবান মোজা
কিনে কর্‌লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
ঐ প্রতিজ্ঞা করবো ভাই
পরের জিনিস কিনবো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

সভা ভঙ্গ হ'লো। আমরা কয়েকজন নেতাদের দর্শন করবার জন্যে তাঁদের কাছে গেলাম। প্রণাম নিবেদন ক'রে কৃতার্থ হলাম।

এই মৌলবি দীন মহম্মদকে অনেকেই বলে থাকেন দীনমহম্মদ গাঙ্গুলী। জানি না, ইনি গাঙ্গুলী-বংশোদ্ভব হিন্দু ছিলেন কি না।

নেতারা চ'লে গেলেন। আমাদের এই অঞ্চলের যে-সব তরুণেরা বাইরে থেকে স্কুল-কলেজে পড়তেন, তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আমরা পরিচালিত হতাম। তাঁদের উদ্যোগে একদিন আমরা শোভাযাত্রা ক'রে বেরোলাম রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে। তাঁদেরই একজনের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাইতে গাইতে আমরা পথ-পরিক্রমা করেছিলাম। গানটির প্রথম কলি—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক
মুখ তুলে আজি চাহ রে।

এই আমার প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা। স্বদেশী গান আর একটিও জানতাম না। আমাদের নিমতিতায় নীলকান্ত মজুমদার রাজসাহী থেকে ফিরে এসে বললেন, তিনি রজনীকান্ত সেনের একটি নতুন গান শিখে এসেছেন। (গানটি সত্যিই নতুন। পরবর্তীকালে বাণী-কল্যাণী-অভয়া-আনন্দময়ী-অমৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দীর্ঘকাল ছাপা হয় নি। আমি কান্তকবির অপ্রকাশিত গান শিরোনামায় গানটি 'বিজলী'তে প্রকাশ করেছিলাম)।

গানটি এই—

তবু ভাঙে না ঘুমের ঘোর।
ঐ হয়েছে যামিনী ভোর,
নবীন তপন মহাজাগরণ আনে না নয়নে তোর!
শিয়রে গগন-চুম্বী শির
ঐ অচল সৌম্য ধীর,
কোটি নয়নে ঝরঝর ঝরে কোটি নয়ন-লোর।
সে যে হ্যাথায় নীরবে ইন্দ্রপ্রস্থ পানিপথ চিতোর॥
ঐ নীল সিন্ধুজল,
চির গর্বিত চঞ্চল
তীব্র আবেগে করিছে প্রহত বধির শ্রবণে তোর।
বলে "জাগ্, জাগ্, নতুবা ডুবে যাক্ অতল গর্ভে মোর।"

নীলুকাকা গানটি আমাদের শিখিয়ে দিলেন। ভালো গাইতেন নীলুকাকা।

কিছুদিন পরে দয়হপাহাড়ের শচীনদা (শচীন অধিকারী) কলকাতা থেকে শিখে এসে আমাদের শিখিয়ে দিলেন—

"বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী।"

একটি কথা সসঙ্কোচেই বলি—এই স্বদেশী গানের প্রেরণা থেকেই আমার গান ও কবিতা লেখার সূত্রপাত।

এলো একটি শোকদিবস। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সেই ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) বৎসরান্তে আবার ফিরে এলো। দেশবরেণ্য নেতারা ঘোষণা করলেন —এই শোকদিবসে শিশু আর রোগী ছাড়া কেউ অন্নজল গ্রহণ করবে না। কোনো বাঙালীর ঘরে উনুন জ্বলবে না। জুতো পরবে না কেউ। এ যেন মায়ের মৃত্যুজনিত অশৌচপালন।

অরন্ধনের সঙ্গে হবে রাখীবন্ধন। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলনগ্রন্থিযুক্ত বন্ধন। রাখীসঙ্গীত রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
হে ভগবান!
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক—
হে ভগবান!
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক,
হে ভগবান!
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন,—
এক হউক, এক হউক, এক হউক,
হে ভগবান॥

সেদিন আমরা কয়েকজন নিষ্ঠাভরে নেতাদের সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করেছিলাম।

৩৮

এই দেশাত্মবোধের পরিবেশের মধ্যে একদিন একাগ্রচিত্তে চিন্তা করতে করতে এ-কথা সে-কথা লিখতে লিখতে দু'চার লাইন কবিতা লেখা হয়ে গেল। ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। মায়ের রচনাশক্তি ছিল। কিন্তু লিখতেন না। আমার এখনও মনে আছে, মায়ের মুখে-মুখে রচনা-করা একটি গানের দুটি চরণ—

মন যদি মোর সঙ্গী হতিস যেতাম আমি ব্রজধামে।
দেখতাম গিয়ে রাধাশ্যামে দাঁড়িয়ে আছে যুগল ঠামে।

মা আমার কবিতার লাইন ক'টি প'ড়ে খুবই উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'ভালো হয়েছে। আরও লেখ না?'

ছেলের লেখায় মায়ের বিচার। ভালো হবেই তো।

এই আমার প্রথম কবিতা-রচনার প্রয়াস। ভুল বললাম। কবিতার লাইন ক'টি লিখেছিলাম বিনা প্রয়াসেই। প্রয়াস জাগলো পরে। রোজই লিখি। কী যে আনন্দ পাই লিখে। ক্রমে লেখার নেশা ধ'রে গেল।

এবারে সাধ জাগলো, এ লেখা ছাপানো যায় না? ছাপার হরফে দেখবার সাধ।

একবার পূজার সময় মা দুর্গার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখলাম। মাকে দেখালাম। মা তো ভালো বলবেনই জানি। তখন নিমতিতায় একটি ছাপাখানা হয়েছিল, নাম গোবিন্দ প্রেস। মাকে সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম—যদি একটি টাকা দাও তো কবিতাটা ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে আনি। মা দিলেন একটি টাকা।

কবিতাটি নিয়ে চললাম ছাপাখানায়। ছাপাখানার কর্মকর্তা তারাদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনিই ছাপাখানার কম্পোজিটর, তিনিই ম্যানেজার। তারাদাস বাবু ছাপাখানার কম্পোজিটর হলেও তিনি একজন সাহিত্যিক। হাওড়ার দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'সাহিত্য সংহিতা' মাসিক পত্রের লেখক তিনি।

তারাদাসবাবুকে বললাম—'আমার এই পদ্যটা ছেপে দেবেন?'

'পদ্য? কে লিখেছে? তুমি?'

'হাঁ।' ব'লে কবিতাটা তাঁকে দিলাম।

তারাদাসবাবু কবিতাটা নিয়ে বললেন—'কিন্তু তোমার এ পদ্য ছাপতে পয়সা লাগবে যে। দেবে তুমি?'

বললাম—'এক টাকাতে হবে? আমার কাছে একটি টাকা আছে।'

তারাদাসবাবু বললেন—'খুব হবে। তুমি কাল এসে নিয়ে যেয়ো। একশ'-খানা ছেপে দেবো।'

পরের দিন ছাপাখানায় গিয়ে কবিতার ছাপা কাগজগুলি নিয়ে এলাম। ছাপার হরফে কবিতা, কবিতার নীচে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ছাপার হরফে। কী যে আনন্দ! বোঝাবার ভাষা নেই।

দু'চারখানা বাড়িতে রেখে বাকি সব ছাপা কাগজ পূজা-বাড়িতে গিয়ে বিলি ক'রে দিলাম। বন্ধুদের কাছে খাতির বেড়ে গেল। বড়রা কেউ মুখ টিপে হাসলেন কি না ভগবানই জানেন।

প্রতি বছরই পূজার সময় একটি ক'রে কবিতা লিখে ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে নিই। একটিবার তারাদাসবাবু রূঢ় কথা ব'লে প্রাণে বড় আঘাত

দিলেন। কবিতার কপিটি ছাপবার জন্যে তাঁর হাতে দেওয়া মাত্র বললেন—'বাপ-মার বেশি পয়সা হয়েছে নাকি? এই সব ছাইপাশ ছাপিয়ে কেন পয়সা খরচ করাচ্ছো?'

চোখের জল চেপে কবিতাটি নিয়ে ফিরে এসে মাকে সব কথা বললাম। মা-ও দুঃখ পেলেন।

বাড়িতে একখানা গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ছিল। সেই পঞ্জিকার একটি পাতায় গুপ্ত প্রেসের বিজ্ঞাপন ছিল। তাতে লেখা ছিল সুলভে সব রকম ছাপার কাজ হয়। মায়ের কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে মনিঅর্ডার ক'রে দিলাম কলকাতায় গুপ্ত প্রেসে। চিঠির মধ্যে কবিতাটা পাঠিয়ে লিখে দিলাম—ঐ পাঁচ টাকার মধ্যে যেরূপ এবং যতগুলি ছাপা সম্ভব হয়, ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতে। যেন পূজার আগেই পাই।

কবিতা আকারে বড়। ফিকে নীল রঙের ফুলস্ক্যাপ কাগজে, চমৎকার বর্ডার দিয়ে ছাপা কবিতার বাণ্ডিলটি রেজিস্ট্রি ডাকে এল। দু'শ কপি। ডাকমাশুল সমেত ঐ পাঁচ টাকাতেই কুলিয়ে গেছে।

আমার আনন্দ ছাখে কে?

তারাদাসবাবু কবিতা লিখতে পারেন, জানতাম না। তিনি 'সাহিত্য-সংহিতা'য় প্রবন্ধই লিখে থাকেন, কখনও তাঁর কবিতা দেখিনি।

নিমতিতায় আশুতোষ চক্রবর্তীর মেয়ের বিয়ে। তখন বিয়েতে প্রীতি-উপহার-কবিতার খুব প্রচলন হয়েছে। এই বিয়েতে ছোট বোনের উদ্দেশে কবিতায় একটি প্রীতি-উপহার দিলেন বড় বোন। শোনা গেল তারাদাসবাবু কবিতাটি লিখে দিয়েছেন। খুব ভালো কবিতা। তারাদাসবাবুর সুখ্যাতি আর ধরে না। কবিতাটির নূতনত্ব এই যে, নানারকমের ফুল দিয়ে সুন্দর ভাষায় সুনির্বাচিত শব্দ-বিন্যাসে কবিতাটি লেখা।

কবিতাটির দুটি একটি স্তবক আমার মনে আছে—

সাজাইয়া দে লো বোনে বাসন্তিয়া বসনে।
কানে কদম্বের ফুল,
শিরে নাগেশ্বর ফুল,
অশোক-চম্পকে দে লো উজলিয়া বরণে।
মুখের কুসুম দে লো নূপুরিয়া চরণে॥

কবিতার শেষ দুটি চরণ—

মনোহরা পারুলে ও মোতিয়ার মুকুলে।
বর যেন বলে, হেন বধূ নাহি ভুবনে।

সকলে প্রশংসা করলেও, 'মুকুলে'র সঙ্গে 'ভুবনে'র মিল আমার ভালো লাগলো না। তারাদাসবাবুর উপর আমার রাগ ছিল। তাই ঐ মিলের ত্রুটিটা আমি সকলকে বলে বেড়াতে লাগলাম। এ-কথা তারাদাসবাবু শুনে মন্তব্য করেছিলেন—'ও ছোক্‌রা কবিতার কী বোঝে ?'

এই সময় আমি জমিদারদের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পুরোনো 'সাহিত্য' মাসিকপত্র পড়ি। এক বছরের পত্রিকা একসঙ্গে বাঁধানো থাকে। 'সাহিত্য' পড়তে পড়তে একটি সংখ্যাতে দেখি, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি কবিতা। শিরোনামা—'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা'। দেখে চক্ষুঃস্থির। এ যে তারাদাসবাবুর সেই প্রীতি উপহার। শ্রীরাধাকে ফুল দিয়ে সাজাচ্ছেন ব্রজগোপীরা। কবিতার গোড়ার চরণে আছে—

সাজাইয়া দে লো আজি বাসন্তিয়া বসনে।

তারাদাসবাবু ঐ 'আজি' শব্দটার জায়গায় বসিয়েছেন 'বোনে'। 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা'র শেষ দুটি চরণ—

মনোহরা পারুলে ও মোতিয়ার মুকুলে।
শ্যাম যেন বলে হেন বধূ নাহি গোকুলে।

'শ্যাম'-এর জায়গায় 'বর' বসিয়েছেন তারাদাসবাবু। দেবেন সেন কবিতাটিতে 'মুকুলে'র সঙ্গে 'গোকুলে' শব্দের চমৎকার মিল করেছেন। কিন্তু বিয়ের প্রীতি-উপহারে তো 'গোকুলে' চলে না। আর কোনো শব্দ খুঁজে না পেয়ে 'ভুবনে'-শব্দটি জুড়ে দিয়েছেন তারাদাসবাবু।

আমাকে আর পায় কে ? পাকা পুলিশের মতো আমি যেন চোর ধরেছি,—এই রকম মনোভাব আমার। কাকে শোনাই আমার এ কৃতিত্বের কথা। প্রথমেই মনে হ'লো জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কথা। তিনি বিকেলে বাড়ির সম্মুখে রাস্তার ধারে ঘাসের উপর পাতা বেঞ্চিতে রোজই ব'সে থাকেন। ঐ বাঁধানো 'সাহিত্য' সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম। দেখি মহেন্দ্রবাবু বেঞ্চির উপর ব'সে। আমি তাঁর কাছ দিয়ে যাবার সময় একটু ইতস্তত করতেই জিজ্ঞাসা করলেন—'কিছু বলবে নাকি ?'

'সাহিত্যে'র ঐ "অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা" কবিতার পৃষ্ঠাটি চিহ্নিত ক'রে রেখেছিলাম।

কবিতাটি বার ক'রে মহেন্দ্রবাবুর সম্মুখে মেলে ধরলাম। বললাম—'এই কবিতাটা আগে পড়েছেন ?'

'মনে হচ্ছে যেন পড়েছি। 'সাহিত্য' কাগজ তো আমি এর মধ্যে পড়িনি।'

আমি বললাম—'পড়েছেন আশুবাবুর মেয়ের বিয়ের প্রীতি উপহারে।'

মহেন্দ্রবাবুর মনে প'ড়ে গেল। তিনিও সুখ্যাতি করেছিলেন প্রীতি উপহার কবিতাটির। বললেন—'বইটা আমার কাছে এখন থাক। কাল তুমি নিয়ে যেয়ো।'

পরের দিন মহেন্দ্রবাবু আমাকে বইটি দিলেন। শুনলাম—তিনি বিশেষ ভর্ৎসনা করেছেন তারাদাসবাবুকে।

প্রাণ জুড়িয়ে গেল!

আমি প্রত্যহই লিখে চলেছি। হয় কবিতা না হয় গান। কাঁচা হাতের কাঁচা লেখা হ'লেও সুখ্যাতি করবার একটি লোক আছেন। তিনি আমার মা।

'সাহিত্য' পত্রিকার সব চেয়ে আমার প্রিয় ছিল মাসিক সাহিত্য সমালোচনা। শুনেছিলাম—সমালোচনা করতেন স্বয়ং সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সে সমালোচনা যেমন সরস, তেমনি ক্ষুরধার। সমাজপতি মহাশয়ের দুটি একটি সমালোচনা ভোলবার নয়, এখনও আমার মনে আছে।

কোনো একটি মাসিক পত্রে একজন লেখকের প্রবন্ধের মধ্যে ছিল 'সবদিনাপেক্ষা' শব্দ। সব, দিন আর অপেক্ষা—এই তিনটি শব্দকে লেখক সন্ধিবদ্ধ করেছেন। সমাজপতি মশায় মন্তব্য করলেন—'যদ্যপ্যাপনারৈইরূপাদ্ভুতোদ্ভটার্ষসন্ধীন্দ্র হইয়া উঠেন…' ইত্যাদি। তিনি যদ্যপি, আপনারা, এইরূপ, অদ্ভুত, উদ্ভট, আর্ষ, সন্ধি, ইন্দ্র শব্দগুলিকে একসঙ্গে জুড়েছেন। অদ্ভুত চেহারা হয়েছে সন্ধিবদ্ধ শব্দটির।

কবি কালিদাস রায় একটি কাগজে কি-যেন-একটা কবিতা লিখেছিলেন। শিরোনামা মনে নেই। বিষয়বস্তু হচ্ছে, আকাশ। আকাশে চাঁদ ওঠে, চাঁদের জ্যোৎস্না আলো ছায়, রামধনু ওঠে, নানা রঙে রঙীন হয় আকাশ—এই রকমের অনেক বর্ণনা ছিল কবিতাটিতে। সমাজপতি মশায় তাঁর সমালোচনায় কবিতাটির দুটি লাইন উদ্ধৃত ক'রে লিখলেন: কবি কালিদাস তাঁর কবিতায় লিখেছেন—

'ইন্দ্রধনুর স্বপন দেখিস,
চন্দ্র-রেণু গায়ে মাখিস।'

প্রার্থনা করি—যে হামানদিস্তায় কবি কালিদাস চাঁদ চূর্ণ করিয়াছেন, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকুক। কবিরাজ মহাশয়েরা তাঁদের দশনকান্তি চূর্ণের সহিত এই চাঁদ-চুর মিশাইয়া দিলে বহু দন্তপঙক্তিতে দন্তরুচিকৌমুদী ফুটিয়া উঠিবে।'

গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন পরলোকগমন করেন, তখন একখানি বিখ্যাত কাগজের সম্পাদকীয়তে এইরূপ মন্তব্য বেরোলো—"নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরলোকগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কোনো নাটক পড়ি নাই বা তাঁহার অভিনয় দেখিতে কোনো রঙ্গালয়েও যাই নাই, এজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।"

সমাজপতি লিখলেন—"আমরা বলি বাপু, কাজটা ভালো কর নাই। তোমার মত অনেক জাঁদরেল ও ধৃষ্ট গিরিশচন্দ্রের নাটক পড়িয়া ও তাঁহার অভিনয় দেখিয়া তরিয়া গিয়াছে। আর তুমি তাঁহার নাটক না পড়িয়া থাকিলে বা তাঁহার অভিনয় না দেখিয়া থাকিলে তাঁহার কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে জানো? গোসম্প্রদায়ের কোনো ক্ষণজন্মা দীর্ঘশৃঙ্গ তৃণভোজন না করিলে ধরণীর যেরূপ ক্ষতি হয়, এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত।"

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ভারতীয় চিত্রকলার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। একখানি মাসিক পত্রে অবনীন্দ্রনাথের একজন ছাত্রের একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত ছবি বেরোলো। ছবির নাম—কালীয়দমন। আমরা সাধারণত কালীয়দমন ছবিতে দেখি—শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগের ফণার উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করছেন। এ ছবিটিতে শিল্পী এঁকেছেন অন্য রকম: লম্বমান কালীয়নাগের গা বেয়ে উঠছেন শ্রীকৃষ্ণ। উপর দিকে সাপের ফণা।

সমাজপতি মশায় সমালোচনা করলেন—"শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন করিতেছেন—কি সুপারি গাছে উঠিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না।"

['সাহিত্যে'র মাসিক সাহিত্য সমালোচনাটি সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর। কিছু ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তবু মনে হয়—খুব বেশি গরমিল ঘটেনি।]

৩৯

ইমানি আমার বন্ধু। সুস্থ সবল মুসলমান যুবা। সে আমাকে ভালোবাসে, আমিও ভালোবাসি তাকে।

কিন্তু সে আর-সকলের দু'চক্ষের বিষ। কেউ কাছে ঘেঁষতে চায় না তাকে। ঘৃণা করে সকলেই।

আমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বলে পাঁচজনে আমার সম্বন্ধেও নানা কথা বলে। কারণ ইমানি চোর।

আমি বলি, সে চোর নয়। ওটা ওর রোগ। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্লেপ্‌টোমেনিয়া, এ তাও নয়। ক্লেপ্‌টোমেনিয়ার রোগী চুরি-করা জিনিস আত্মসাৎ করে। ইমানির চুরি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। চুরির মালের একটি কণাও নেয় না সে।

আমার মাথার চুল বড় বলে সে আমাকে বলে ঝাব্‌রিবাবু। কোথায় থাকে, কোথায় খায়, কোথায় শোয় কিছুই জানি না। এক এক দিন উদয় হয় "ঝাব্‌রি-বাবু" ব'লে। একটি পয়সাও চায় না, খাবার কথা দূরে থাকুক। ঠিক পাগল নয়। বিকৃতমস্তিষ্ক, তাতে সন্দেহ নেই।

নবীন গোয়ালার গোয়াল—ঘরে রাত্রে দুটি বাছুর বাঁধা থাকে। আর তাদের মা, গরুদুটি থাকে বাইরে। এই অবস্থায় থাকতে তারা অভ্যস্ত। সকালবেলায় গোয়ালা বাছুর দুটিকে বন্ধনমুক্ত ক'রে দেয়। ছাড়া পাওয়া মাত্র তারা ছুটে যায় যে যার মায়ের কাছে। তৎপর হয়ে মায়ের পালানে গোঁত্তা মেরে বাঁটে মুখ লাগায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা বাঁধা পড়ে মায়ের একটি পায়ের সঙ্গে। দুধ দোয়া হয়ে গেলে বাছুর দুটির নিষ্কৃতি। সারাদিন তারা মায়ের সঙ্গী। আবার রাত্রে বন্ধন-দশা।

একদিন গোয়ালা সকালবেলায় উঠে দ্যাখে, দুটি বাছুরই গোয়াল থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে মায়ের বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খাচ্ছে!

গোয়ালা মনে মনে বললে, এ ইমানির কাজ। একটা বাছুরের বাঁধন কোন রকমে খুলে যেতে পারে,—দুটো বাছুরেরই বাঁধন একসঙ্গে খুলে গেল! হ'তেই পারে না। এ ইমানির কাজ। কিন্তু ইমানিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। দু'এক-জন বললে দুদিন আগে সে গাঁ থেকে কোথায় যেন গেছে। বাছুরের বাঁধন কেউ যদি খুলে দিয়েই থাকে সে ইমানি নয়।

দু'তিন দিন পরে ফিরলো ইমানি। এর মধ্যে নবীন ঘোষের মেজাজও নরম হয়ে এসেছে।

ইমানি এল আমার বাড়িতে। জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় ছিলি এ কয়দিন?"

"ক্যানে? গাঁয়ে কিছু ঘট্যাছে? ফুফার বাড়ি গেল্‌ছিল্যাম।"

বললাম—"ঘটবে আর কি? নবীন ঘোষের গোয়ালে বাঁধা দুটো বাছুর কেমন ক'রে ছাড়া পেয়ে দুটি গরুরই দুধ খেয়ে ফেলেছিল একদিন। নবীন ঘোষ তোকেই সন্দেহ করেছিল। তুই রাতে গোয়ালে ঢুকে বাছুর দুটোকে ছেড়ে দিয়েছিলি। পরে নবীন যখন শুনলো তুই সেদিন গাঁয়ে ছিলি না, তখন তার মেজাজ ঠাণ্ডা হলো।"

ইমানি আমার কথা শুনছে আর মুচকি হাসি হাসছে। ওর মুখের হাসি আর মুখের ভঙ্গী দেখে বললাম—"তুই কি বাছুর দুটোর বাঁধন খুলে দিয়েছিলি?"

ইমানি বললে—"বাছুরদুটাকে দেখ্যাছেন ঝাব্‌রিবাবু? একেবারে হাড্ডিসার। লোব্‌নে বাছুরদুটাকে দুধ খেতে ছায় না। সব দুধ দুহ্যা ল্যায়। সেদিন রেতে তার গোহালে ঢুক্যা দিল্যাম ছেড়্যা বাছুরদুটাকে।"

"এই তো বললি ফুফার বাড়ি গিয়েছিলি। ফুফার বাড়ি কাছেই কোথাও?"

"কাছে লয় ঝাব্‌রিবাবু। তিন চার কোশ হবে। রাত কোর‍্যা আইস্যা লোবন্যার গোহালে ঢুক্যা বাছুরদুটার বাঁধন খুল্যা দিয়্যা রাতের ব্যালাতেই ফুফার বাড়িতে চোল্যা গেল্‌ছিল্যাম।"

ইমানি একদিন বললে—"ঝাব্‌রিবাবু, আপনি সাইকেল চালাতে পারেন?"

"না। তুই পারিস?"

ইমানি বললো—"হামি মোনাকষার ইসমাইল চোধ্‌রির বাড়িতে ক'মাস চাকরি কোর‍্যাছিলাম। ঘোড়ার আস্তাবলের কাজ। শুনেন তবে। ঘোঁড়ার সহিসের সঁতে (সঙ্গে) আমার দোস্তি হোয়্যা গ্যালো। উয়ার একটা সাইকেল ছিল। কহলাম, হামাকে সাইকেল চড়া শিখিয়্যা দিতে পারো? উ একদিন গাঁয়ের এক কড়ে (দিকে) লিয়্যা যেইয়া শিখ্যাতে লাগলো হামাকে। কহলো, সাইকেলের সাহাম্‌নের ডাণ্ডা ধোর‍্যা ডাঁড়িয়্যা থাক; সাইকেল যেন হিলে (নড়ে) না। উ য্যামোন কহলে, সাইকেল ধোর‍্যা ডাঁড়িয়্যা রহলাম। সাইকেল হিল্‌লো না। তারপর সে সাব্বাস কহ্যা আমাকে সাইকেলের ওপরে চড়িয়্যা দিলে। রেকাবের ওপর পাঁও (পা) দুটা রাখ্যা ঘুরিয়্যা ঘুরিয়্যা ক্যামোন কায়্যা ডাণ্ডাটা ধোর‍্যা চাল্যাতে হয়, ক্যামোন কোর‍্যা ডাণ্ডা ইধিক-

উদিক ঘুরিয়্যা ডাহিন কড়ে বাঁ কড়ে যেতে হয়, সব বুঝিয়্যা দিয়্যা কহলে, 'অ্যাখোন চালা।' হামি রেকাবের ওপর পাঁও ঘুরিয়্যা ঘুরিয়্যা চালান্থ। দু পাঁ যেয়্যাই সাইকেলের সাহামনের পেঁইহাটা (চাকাটা) বেঁইক্যা কাৎ হোয়্যা গ্যালো আর ঝোঁক্ সামলাতে না পেয়্যা সাইকেলটা লিয়্যা হামি একটা গাঢ়ার (গর্তের) ভিৎরে পোঢ়্যা গেন্থ। আর চোঢ়ি নি সাইকেলে। হামি একটু জখম হোলছিল্যাম। জখম হোল্ছিল সাইকেলটাও। সহিসটা কহ্যাছিল, সাইকেল পারবিন্যা তুই, তোকে হামি ঘোঁড়ায় চড়া শিখিয়্যা দিব।"

বললাম—"তুই ঘোড়ায় চড়তে পারিস ?"

"পারিস ?"—কী কহছো ঝাব্রিবাবু। ছ্যাও না একটা ঘোঁড়া। দেখিয়্যা দিই দুল্কি, কদম, ছারতকে চালিয়্যা হামার ক্যারামতি।

অনেক দিন দেখা নেই ইমানির। একদিন শেষ-রাত্রের দিকে আমার শোবার ঘরের পিছনের দিকে ইমানির কণ্ঠস্বর।

"ঝাব্রিবাবু!"

ঘুম ভেঙে গেল। বললাম—"কে রে ইমানি ? তুই এত রাত্তিরে কোত্থেকে এলি ?"

ইমানি আস্তে আস্তে বললো—"আপনার খিড়কির দরজাটা খুলেন না ঝাব্রিবাবু।"

খিড়কির দরজা খুলেই দেখি, সম্মুখে ইমানি। মাথায় একটা ধোপার মোটের মতো বোঁচ্কা। বললাম—"ওটা কিরে ?"

"কহছি, কহছি। একটু ধক্ (ধকল) সামলিয়্যা লিই, সবই কহছি।"

ব'লে সে বোঁচ্কাটা খুললো। দেখি পুরনো জামা-কাপড়ে ভর্তি। জিজ্ঞাসা করলাম—"এ সব কোথায় পেলি ? কে দিলে ?"

ইমানি বেশ সপ্রতিভ হয়ে বলে—"বোর্ডিং থেক্যা লিয়্যা এন্থ। ছোঁড়ারা মড়ার মতন লিদ্ (নিদ্রা) দিছে। হামি একটা লকড়ি দিয়্যা সব টেস্কা টেস্কা বাহির কোর‍্যা লিয়্যাছি।"

আমি একটা ধমক দিয়ে বললাম—"চুরি ক'রে এনেছিস ? যা, এখুনি যা বোর্ডিংএ। সব ফিরিয়ে দিয়ে আয়।"

কাঁদো কাঁদো হয়ে ইমানি বললে, "অরা হামাকে মারবে; হামি যাবো না। আপনি ইগুলা এখন রেখ্যা ত্যান। বিহান হ'লে উদের কাছে পাঠিয়্যা দিবেন।"

বললাম—"তা হয় না। তুই থাক এখানে। তোকে সঙ্গে নিয়ে আমি

বোর্ডিংএ গিয়ে ওদের জামাকাপড় দিয়ে আসব। ওরা কিছু বলবে না তোকে।"

রাজি হ'লো ইমানি।

আর দেখা নেই ইমানির।

আমাদের গ্রামের অনতিদূরে অরঙ্গাবাদের তাঁতিরা প্রতি বৎসর অনন্তব্রহ্মার পূজা করে। এই উপলক্ষে একটা বেশ বড় মেলা বসে সেখানে। একবার মেলা দেখতে গেছি। দেখি একটা মাঠের মধ্যে জনতা। চতুর্দিকে লোকজন। মাঝখানে পুলিস আর একটা সাদা ঘোড়া। লোকজন বলাবলি করছে—পুলিস একটা চোর ধরেছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি, পুলিস-পরিবেষ্টিত ইমানি। পুলিসের মুখেই শুনলাম—ইমানি আগের দিন সুরপুরের সাহেবের এই ঘোড়াটা চুরি ক'রেছিল। আমি বললাম—"ও পাগল। চুরি হচ্ছে ওর পাগলামি।"

পুলিসের দারোগা বললেন—"সেটা আমরাও বুঝতে পেরেছি। তা নৈলে চোরাই ঘোড়া চালিয়ে মেলার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়? কিন্তু কী আশ্চর্য—জিন নেই, রেকাব নেই, লাগাম নেই—ঘোড়ার উপর চ'ড়ে দিব্যি চ'লেফিরে বেড়াচ্ছে। আপনি ওকে চেনেন?"

"চিনি।

দারোগাবাবু বললেন, "ওকে আমরা ছেড়ে দেবো।"

দারোগার সম্মুখেই ইমানিকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুই ঘোড়া চুরি করলি কেন?"

ইমানি অসঙ্কোচে বলল—"চড়ব্যার লেগ্যা। বড্ড ভাল ঘোঁড়া ঝাব্‌রিবাবু। নিজের বুদ্ধির দোষে ধরা প'ড়ে গেনু। ঘোঁড়াটা সাদা। রাতারাতি যদি লাল রং দিয়্যা রঙিয়্যা লিত্যাম, ধরে কুন শালা।"

দারোগাবাবু শুনে হাসছেন।

৪০

১৯০৬। এই বছরেই বোধ হয় জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিমন্ত্রণে সপরিবারে নিমতায় এলেন নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্র সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ব্যাংবাবু। বয়সে আমার চেয়ে তিন চার বছরের ছোট হ'লেও অল্প দিনের মধ্যেই ব্যাংবাবুর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল।

অনেক কথা হয় ব্যাংবাবুর সঙ্গে। তাদের বাড়ি কলকাতায়, বাগবাজারে। সেখানে তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। সে এখানে তাকে নিয়মিত চিঠি দেয়। ব্যাংবাবু আমার কথাও তার কলকাতার বন্ধুকে জানিয়েছে। সে নাকি আমাকেও চিঠি দেবে। তার বন্ধুর নামটা পরে বলছি।

হঠাৎ একদিন ডাকে ব্যাংবাবুর সেই বন্ধুর চিঠি এল আমার নামে। চমৎকার চিঠি, চমৎকার ভাষা। পরে জেনেছি সে আমার চেয়ে দু বছরের ছোট। দেখা নেই, সাক্ষাৎ নেই পত্রালাপ চললো এই পেন্-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে পুরো চার বছর। দেখা হ'লো ১৯১০ সনের ডিসেম্বরে, তার কলকাতার বাড়িতে।

অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব রইলো বাহাত্তর বছর ধ'রে। গত ২০শে জানুয়ারি সাতাশী বছর বয়সে বন্ধু আমার পরলোকে চ'লে গেছে। মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগেও তার চিঠি পেয়েছি। বন্ধুর নাম পশুপতি ভট্টাচার্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক, শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের একান্ত অনুরাগী ভক্ত, একনিষ্ঠ সাধক, বহু গ্রন্থের গ্রন্থকার—বহুল-প্রচারিত তার অপূর্ব গ্রন্থ "কে এই মা"।

শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কৃপার ছত্রছায়াতলে আমরা দুটি বন্ধু বড় আনন্দে ছিলাম। আজ সে নাই!

যত দূর মনে হয়, ক্ষীরোদবাবুর নিমন্তিতায় আসার পরেই তাঁর প্রতাপাদিত্য নাটকের অভিনয় হ'লো হিন্দু থিয়েটারে। মহেন্দ্রবাবু—প্রতাপাদিত্য; বসন্ত মজুমদার—বসন্ত রায়; প্রাণহরি দায়—বিক্রমাদিত্য; সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—ভবানন্দ; যতীন্দ্রনাথ মজুমদার—শঙ্কর; রসরাজ ঘোষ—গোবিন্দ দাস; সুরেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী (কালীবাবু)—রডা; অবিনাশ—কল্যাণী; শচীন্দ্রনাথ অধিকারী—বিজয়া। আরো অনেকে নেমেছিলেন বিভিন্ন ভূমিকায়। বিন্দুমতীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম আমি। থিয়েটারে এই আমার প্রথম অভিনয়। এর পরে আরও দুটি একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মৃণালিনী' নাটকে গিরিজায়া। দুটি অতি ক্ষুদ্র ভূমিকায় একবার নেমেছিলাম আমি আর শ্রীশচন্দ্র সরকার। দুঃসাহসিক কার্য করতে হয়েছিল আমাদের। 'ঋষ্যশৃঙ্গ' নাটকে দুটি কৃষকের চরিত্র। মাত্র একটি দৃশ্যের অভিনয়। অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রাজাকে পরামর্শ দিলেন—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়ে যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হ'তে পারে। ঋষ্যশৃঙ্গ এলেন। যজ্ঞ হ'লো। প্রবল বর্ষণে বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো। অনাবৃষ্টিতে যেমন জমি-চাষ বন্ধ ছিল, অবিরাম বৃষ্টিতেও তাই। ঐ পরিস্থিতিতে দুই কৃষকের

বিরক্তিব্যঞ্জক সংলাপ। একাধিক বার অভিনয় হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ নাটকের। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের অভিনয়ে এই দুটি চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দুজন দিগ্-গজ অভিনেতা—মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আর যতীন্দ্রনাথ মজুমদার। হাস্য-রসাত্মক অভিনয়। ঐ দুটি অতি সামান্য চরিত্রকে তাঁরা দুজনে এমনই উপভোগ্য ও অসামান্য ক'রে তুলেছিলেন যে, এই চরিত্র দুটি অভিনয়ে অন্য কারও অবতীর্ণ হওয়া দুঃসাহসিক বৈ কি! অভিনয়ের দুদিন পূর্বে হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অভিনয়ের আগের দিন মহেন্দ্রবাবু আমাদের ডেকে বললেন—তোমাদের দুজনকে ঐ দুটি ভূমিকায় নামতে হবে। আমাদের তো চক্ষুঃস্থির। শ্রীশদা চায় আমার দিকে, আমি শ্রীশদার দিকে। মহেন্দ্রবাবুকে বললাম—"রিহার্সাল কখন হবে?"

মহেন্দ্রবাবু বললেন—"ওর আবার রিহার্সাল কি? তোমরা দুজনে যা-হয় ঠিক ক'রে নিয়ো।"

মহেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীশদা আর আমি—দুজনে পরামর্শ করতে বসলাম। শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'লো—নাটকের সংলাপ মুখস্থ করবার আর সময় নেই। মুখস্থ না ক'রে কেবলমাত্র প্রম্‌টারের উপর নির্ভর ক'রে আসরে নামলে সবই মাটি হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমরা পরস্পরের কথার পরে লাগসই কথা ব'লে যাবো। ওঁদের (মহেন্দ্রবাবু আর যতীনবাবু) অনুকরণ করা দূরে থাকুক, ও-পথ দিয়েই আমরা যাবো না। ঠিক হ'লো, আমরা দুজন যেন রাঢ়দেশের চাষী। রাঢ়দেশের বিশেষ উচ্চারণ-ভঙ্গীতে দুজনে কথা ব'লে যাবো।

অভিনয়ের দিন বন্ধুমহলে প্রচার হয়ে গেছে এবার আমি আর শ্রীশদা নামছি। আমাদের অভিনয় কেমন হয়, দেখবার জন্যে মহেন্দ্রবাবু প্রমুখ অনেকেই রঙ্গমঞ্চের ভিতরে। আমরা স্বচ্ছন্দভাবে রাঢ়দেশের ভাষায় আর উচ্চারণ-ভঙ্গীতে আগাগোড়া অভিনয় ক'রে গেলাম। বেশির ভাগ কথাই বৃষ্টির উদ্দেশে বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশে রসিকতাপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি। প্রায় প্রত্যেকটি ব্যঙ্গের ভাষায় দর্শকদের হাততালি। অভিনয় ক'রে চ'লে এলে মহেন্দ্রবাবু দুজনেরই পিঠ চাপড়ে সাধুবাদ জানালেন।

আমাদের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণনারায়ণ সিংহ অবসর গ্রহণের পর নিজের পল্লীভূমিতে চ'লে গিয়েছিলেন। অনেক দিন পরে এবারে তিনি নিমতিতায় এসেছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিবাস কাঁদি মহকুমার জজান গ্রামে। 'ঋষ্যশৃঙ্গ' অভিনয় তিনি দেখেছিলেন। পরের দিন আমার সঙ্গে দেখা হ'তেই বললেন—"হাঁ বাবা, আমার দেশের চাষাদের ভাষা তোমরা কোথায় শিখলে?"

আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগ দিতাম কোরাস গানে। দুবার একক গানও গেয়েছি। দুবারই একই কারণে: একবার থিয়েটার হচ্ছে। আমি স্টেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। কৃষ্ণনাথ মজুমদার মশায় বললেন, "দৃশ্যপট পরিবর্তনে একটু সময়ের দরকার। এই দৃশ্যের পর একটা পথের দৃশ্য দেবো। তুমি মিনিট পাঁচেকের মতো একটা গান গাইতে গাইতে যেন পথ দিয়ে চলে যাচ্ছ, পারবে?"

রাজি হলাম। গায়ের জামা খুলে মালকোচা এঁটে গুছিয়ে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় প'রে, একটা ঝাঁটা যোগাড় ক'রে একদিকের উইংস থেকে রাস্তা ঝাঁট দেবার ভঙ্গীতে ঝাড়ুদারের গান গাইতে গাইতে স্টেজে ঢুকলাম। রাস্তা ঝাঁট দেওয়া আর গান একসঙ্গে চললো। গানটি এই—

এইসা ছোটা কাম, বাবু হমনে ইস্তফা দিয়া।
কাম মে সালাম বাবু ইসমে হারামজাদা হুয়া।
নগ্‌দানগদ কাম করেঙ্গে লেঙ্গে নগদ কৌড়ি,
জালু হো কে জাল বহেঙ্গে, রাত মে হোঙ্গে বাবু ভেইয়া।

কোন মহাকবি এ গান রচনা করেছিলেন, জানি না। ছেলেবেলায় কার কাছে শিখেছিলাম, তাও মনে নেই। গান যেমনই হোক, কৃষ্ণনাথবাবু সিন সাজাতে গানটির যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন।

আর একবার ঐ একই কারণে। কি একটা নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে, মহেন্দ্রবাবু বললেন—

"বাউল সেজে একটা গান গাইতে হবে তোমাকে।"

"কী গান?"

"বাউলের গান। যা-হয়, একটা গেয়ে দিয়ো।"

আমি একটা গান লিখলাম। মামুলী কথা—

"দু'দিনের এই দুনিয়ায় মিছে বলা আমি আমার।"

ঐ রকমই একটা পথের দৃশ্যে গানটি গাইতে গাইতে চ'লে গেলাম।

৪১

এই বছরেই (১৯০৬) আমরা জাতীয় ভাবধারার একটা নতুন স্পর্শ পেলাম। বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ (অরবিন্দ ঘোষ) এসেছেন কলকাতায়। তা নিয়ে খবরের কাগজে নানা প্রশস্তি-প্রবন্ধ। মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি অল্প বেতনে জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আচার্য পদ গ্রহণ করেছেন।

এই বছরেই বেরিয়েছে 'বন্দেমাতরম্' আর 'যুগান্তর'। দুখানি সাময়িক পত্রেরই আদর্শ ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। আমাদের শ্রীশদা (শ্রীশচন্দ্র সরকার) যুগান্তরের গ্রাহক হলেন।

যুগান্তর প'ড়ে আমাদের কাছে জাতীয় আন্দোলনের আর একটা দিক খুলে গেল। জাতীয় আন্দোলন বলতে আমরা তখন বুঝতাম স্বদেশী আন্দোলন। বিলিতী জিনিস ব্যবহার ক'রবো না, সাদা চিনি খাবো না, বিলিতী কাপড় প'রবো না।

যুগান্তর বলে আরো অনেক-কিছু। যুগান্তর বলে ইংরেজ-রাজত্ব অবসানের কথা। সুস্পষ্ট ভাষায় বলে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা। এক একটা লেখার এক একটি অক্ষর যেন এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। "মুক্তি কোন্ পথে" আর "বর্তমান রণনীতি"—দুটি ধারাবাহিক প্রবন্ধেই প্রচ্ছন্ন থাকে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির কথা. যুগান্তরের ভাবধারায় আমরা খুবই প্রভাবিত হয়ে পড়লাম। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ।

সারা দেশের উপর দিয়ে জাতীয় ভাববন্যার প্রবাহ ব'য়ে চলেছে। একদিকে শাসকগোষ্ঠীর কড়া আইন, অপর দিকে দেশের নেতাদের বিভিন্ন বেআইনী ক্রিয়াকলাপ দিয়ে তার সমুচিত প্রত্যুত্তর।

পূর্ববঙ্গের ছোটলাট স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার সমগ্র প্রদেশে সভাসমিতি এমন কি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি পর্যন্ত নিষেধ ক'রে দিয়েছেন। এই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্যে বরিশাল শহরে এবারে (১৯০৬) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল সভার অধিবেশন। তার আগের দিনেই কলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান থেকে নেতৃবৃন্দ বরিশাল শহরে উপস্থিত হয়েছেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যেরা স্থানীয় শাসনকর্তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁরা আগন্তুক সদস্যদের অভ্যর্থনা করতে গিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করবেন না। প্রতিশ্রুতি পালনও করলেন তাঁরা। এই কথা শুনে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পরামর্শক্রমে অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যেরা অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ না ক'রে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহের বাড়িতে অবস্থান করলেন। পরে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল সমাগত প্রতিনিধিরা রাজাবাহাদুরের হাবলিতে সমবেত হয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করতে করতে শোভাযাত্রা সহকারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হবেন।

পুলিসপুঙ্গবেরা প্রস্তুতই ছিল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারিত না হ'তেই

প্রত্যেক প্রতিনিধির হাতে বন্দেমাতরম্ ব্যাজ দেখেই ক্ষেপে গেল পুলিস, লাল রঙের কাপড় দেখে ষাঁড় যেমন ক্ষ্যাপে। লাঠির পর লাঠির বৃষ্টিপাত চলল শোভাযাত্রীদের উপরে। যতবার লাঠির আঘাত পড়ে, ততবার তার প্রত্যুত্তর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে। এক গুরুতর আঘাতে পাশের পুকুরে পড়ে গেল মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র তরুণ কিশোর চিত্তরঞ্জন। জলের ভিতরেও লাঠির আঘাত আর প্রতি আঘাতে চিত্তরঞ্জনের মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। অবশেষে চিত্তরঞ্জনের সংজ্ঞাহীন দেহ পুলিসই তুললো পুকুরের পাড়ে।

যুগান্তর পত্রিকায় লিখতেন শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু (পরবর্তীকালে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন যুগান্তরের ম্যানেজার। অবিনাশ-চন্দ্রের কাছে শুনেছি—নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদেরও যাতায়াত ছিল যুগান্তর আপিসে।

সরকারের বিষদৃষ্টি ছিল যুগান্তরের উপরে। বেশিদিন গেল না। ১৯০৭ সনের জুলাই মাসে পুলিস হানা দিল যুগান্তর আপিসে। সম্পাদকের নামে ওয়ারেণ্ট ছিল। তখন সম্পাদকের নাম কাগজে প্রকাশ করা সম্বন্ধে কোনোরূপ বাধ্যতামূলক আইন ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদকরূপে স্বীকৃত হলেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদালতে ভূপেন্দ্রনাথের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। দু বছরের কারাবাসের আদেশ হ'লো মুদ্রাকরের প্রতি।

এর পর রাজরোষ পড়ল 'সন্ধ্যা' আর 'বন্দেমাতরম্'-এর উপরে।

'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদকীয়তে শ্রীঅরবিন্দ যে-সব কথা লিখতেন, সেগুলি রাজসরকারের বিশেষ প্রতিসুখকর ছিল না। তা ছাড়া ইংলিশম্যান প্রমুখ ইংরেজ-পরিচালিত সাময়িক পত্রগুলি শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সরকারকে নিয়মিত কুমন্ত্রণা দিয়ে যেতেন।

'বন্দেমারতম্' কাগজে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করেছিলেন—

"We want absolute autonomy free from British control." আরও বলেছিলেন—"A free national Government unhampered even in the least degree by foreign control." এবং তিনি এ কথাও সাহসের সঙ্গে বলেছিলেন—"Absolute Swaraj—self-government as it exists in the United Kingdom."

এ রকম কথা সে-যুগের নেতারা উচ্চারণ করতে সাহস করতেন না।

ইংরেজ সরকার সুযোগ খুঁজছিলেন—এক সংখ্যা বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁরা রাজদ্রোহের গন্ধ পেলেন। সে-সংখ্যা 'বন্দেমাতরম্'-এ সম্পাদকের নাম ছিল না। তবু উক্ত প্রবন্ধের লেখক ব'লে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন শ্রীঅরবিন্দ। সরকার-পক্ষকে প্রমাণ করতে হবে শ্রীঅরবিন্দই উক্ত প্রবন্ধের লেখক। বিপিনচন্দ্র পাল এককালে বন্দেমাতরম্-এর কর্ণধার ছিলেন। এখনও কাগজখানির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বিপিনচন্দ্র সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি মিথ্যা বলবেন না, উক্ত প্রবন্ধের লেখকের নাম নিশ্চয়ই তাঁর জানা আছে। তাই সরকার-পক্ষ সাক্ষী মানলেন বিপিনচন্দ্র পালকে।

আদালতে মোকদ্দমা উঠলো। আসামী শ্রীঅরবিন্দ এবং সরকারের সাক্ষী বিপিনচন্দ্র আদালতে উপস্থিত। সরকারী উকিল বিপিনচন্দ্রকে প্রবন্ধটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই প্রবন্ধটি কার লেখা আপনি জানেন?"

বিপিনচন্দ্র নীরব।

আবার ঐ একই প্রশ্ন।

বিপিনচন্দ্র নীরব।

"লেখকের নাম কি অরবিন্দ ঘোষ?"

পূর্ববৎ নীরব বিপিনচন্দ্র।

আদালত অবমাননার জন্যে বিপিনচন্দ্রের ছ'মাস কারাদণ্ড হ'লো। প্রমাণাভাবে ২৩শে সেপ্টেম্বর শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন।

শ্রীঅরবিন্দের মুক্তির জন্যে রবীন্দ্রনাথ 'নমস্কার' কবিতায় তাঁকে অভিনন্দিত করলেন:

*** "দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য-পানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক পরে
ছায়ার মতন।"

যে-দিন (২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিলাভ করলেন, সেইদিনই শুনানী আরম্ভ হ'লো 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মোকদ্দমার শুনানী কিন্তু বেশি দিন চালানোর প্রয়োজন হ'লো না। প্রথম দিনের শুনানীতেই তিনি বলেছিলেন—"ইংরেজের আদালতের বিচার তিনি মানেন না। তিনি সন্ন্যাসী। ইংরেজের সাধ্য নাই, তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।" সত্যবাক্ সন্ন্যাসীর কথা সত্যে পরিণত হ'লো। হাজতে থাকাকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্যাম্বেল হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হ'লো। হাসপাতালেই তিনি পরলোকগমন করলেন সাতাশে অক্টোবর তারিখে।

এই সব খবর আমরা খবরের কাগজে পড়ি আর বেশ উত্তেজনা অনুভব করি। শ্রীঅরবিন্দের মোকদ্দমায় বিপিনচন্দ্র পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে তাঁর শুনানীর সময় আদালতে অত্যধিক ভিড় হয়। অধিকাংশই তরুণ ছাত্র। হাঙ্গামা বাধে পুলিস আর ছাত্রদের মধ্যে। সুশীলচন্দ্র সেন নামে একজন পনেরো বছরের তরুণ ছাত্র বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে ওঠে। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সুশীলচন্দ্রকে পনেরো ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

'যুগান্তর' পত্রিকায় বেরোলো কঠোর মন্তব্য। সে মন্তব্যের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রচ্ছন্ন সংকেত ছিল।

এই বাতাবরণের মধ্যে আমরা পল্লীবাসী তরুণেরা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছি। নিজেরাই নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি মতো রাজনীতির চর্চা করি। দু'তিন জন বন্ধু একত্র হয়ে 'যুগান্তর' পড়ি। স্বদেশী গান গাই মনের আনন্দে।

এই সময় একজন ভদ্রলোক এলেন নিমতিতায় তাঁর আত্মীয়-বাড়িতে। নাম —অনুকূলবাবু। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। বয়সে অনেক তফাত হ'লেও তিনি দু-একদিনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে তুললেন। যেন আমাদের সমবয়সী বন্ধু।

একদিন তিনি আমাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—"তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে ভাই! তোমাদের বন্ধুগুলিকে বেশ ভাল লাগল। দেখলাম, তোমাদের এখানে 'যুগান্তর' আসে। যুগান্তর প'ড়ে কী মনে হয় তোমাদের?"

বললাম—"বেশ ভাল লাগে।"

"যুগান্তরে' যোগাধ্যাপার চিঠি পড়ো?"

"পড়ি বৈ কি। ঐটেই আগে পড়ি।"

মনে হ'লো ভদ্রলোকও যুগান্তর প'ড়ে থাকেন। আর 'যোগাধ্যাপার চিঠি' তাঁরও খুব প্রিয়।

এবারে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"বর্তমান রণনীতি' আর 'মুক্তি কোন্ পথে' কেমন লাগে?"

বললাম—"বর্তমান রণনীতি' পড়ি বটে, কিন্তু ভালো বোঝা যায় না। 'মুক্তি কোন্ পথে' অনেকটা বুঝতে পারি।"

তিনি বললেন—"বর্তমান রণনীতিতে লেখক বলতে চান— শত্রুপক্ষ যখন প্রবল, সম্মুখযুদ্ধে তাকে পরাস্ত করা অসম্ভব, তখন তার অজ্ঞাতসারে গুপ্ত স্থান থেকে তাকে আক্রমণ করা। এই রকমের যুদ্ধ ক'রেই ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়ানো যেতে পারে।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে চমকে উঠলাম। ইংরেজকে তাড়ানো! এবার আমিই জিজ্ঞাসা করলাম—"যুদ্ধ করবে কারা?"

ভদ্রলোক বললেন—"তোমরাই। নিজেকে দুর্বল ভেবো না, ভাই। তোমার মতো শত শত ছেলে এই যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে। তোমাকেও তৈরি হ'তে হবে। রাজি আছ?"

আমি যেন মন্ত্রাভিভূত হয়ে পড়েছি। মুখ দিয়ে স্বীকৃতি বেরিয়ে গেল— "আছি।"

বুকের ভিতরটা তোলপাড় করতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন—"কিন্তু এর জন্যে সব ছাড়তে হবে: আত্মীয়-স্বজন এমন কি নিজের প্রাণের মায়া পর্যন্ত। দরকার হ'লে বিনা দ্বিধায় প্রাণ পর্যন্ত দিতে হবে। পারবে?"

"পারব।"

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—"গীতা পড়েছো, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা?"

"না।"

"গীতা পড়লে, গীতার উপদেশ গ্রহণ করতে পারলে মৃত্যুভয় থাকে না। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ হচ্ছে গীতার বাণী। ভগবান যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। তিনি যা করাচ্ছেন, আমি তাই করছি। আত্মসমর্পণ যত নিবিড় হয়, বাইরের বন্ধন তত শিথিল হয়ে যায়,—চিন্তার বন্ধন পর্যন্ত।"

আমি নীরব।

ভদ্রলোক বললেন—"কয়েকটা বিষয়ে তোমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে

এক—বিবাহ করবে না। দুই—তুমি যে এ পথের পথিক—ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেবে না। এর নাম—মন্ত্রগুপ্তি। তিন—ডাক আসা মাত্র পিছনে না তাকিয়ে নির্দেশ পালন ক'রে যথাস্থানে চ'লে যাবে।"

"ডাক আসবে?"

"নিশ্চয়।"

আর বেশি কথা বললেন না ভদ্রলোক। সেই দিনই তিনি এখান থেকে চ'লে গেলেন।

ডাকের প্রতীক্ষায় রইলাম আমি।

৪৩

এ এক নতুন ভাবের জগতে আমি প্রবেশ করলাম। গীতা না পড়লেও ভগবানে আত্মসমর্পণের কথা শুনেছি। কীর্তন শুনতে গিয়ে কীর্তনীয়ার মুখে শুনেছি শরণাগতির কথা। কিন্তু সে-সব কথা কানে শুনলেও কোনো দিন মরমে পশে নি। আজ বেশ ভাবিয়ে দিলে।

'যুগান্তর' কাগজেও ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের কথা থাকে। আগে ততটা ভ্রূক্ষেপ করতাম না। এখন নিবিষ্ট চিত্তে পরি।

গীতা পাই কোথা? শুনলাম, ক্ষিতীনদের বাড়ীতে গীতা আছে। ক্ষিতীনের বাবা কলকাতার মাসিক পত্র ও একাধিক সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক। কয়েকটি আলমারি ভরা বইও আছে। কিন্তু সবই সেখানে গিয়ে পড়তে হয়। বাড়িতে আনা যায় না। গীতাও পড়তে হবে ক্ষিতীনদের বাড়িতে ব'সে। উপায় কি, তাই সই। একদিন গেলাম ক্ষিতীনদের বাড়িতে। গীতা খুঁজতে খুঁজতে দেখি একখানা গানের বই। বই-এর নাম সঙ্গীতসার সংগ্রহ। ২।৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রচুর গানের ভাণ্ডার। তার মধ্যে দেখি বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেক গান। সে-সব গান কীর্তনীয়াদের মুখেই শুনেছি, ছাপার অক্ষরে দেখবার সুযোগ কখনও হয়নি। মাথায় থাকল গীতা। আমি পড়তে বসলাম বৈষ্ণব পদাবলী। একটা নেশা ধ'রে গেল। রোজই যাই ক্ষিতীনদের বাড়ি। আর ওই সঙ্গীতসার সংগ্রহ নিয়ে বসি। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, প্রভৃতি মহাজনদের অনেক শোনা পদ যেন নতুন রূপ ধরে ফুটে ওঠে চোখের সম্মুখে। একদিন বাড়িতে এসে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম বৈষ্ণব পদাবলীর

ধরনের গান লিখতে। দুটি একটি গান রচনা করি প্রত্যহ। নিজেরই পছন্দ হয় না। এইরকম কিছুদিন অভ্যাস করার পর দুটি গান যেন বেশ নিজের মনের মতো হ'লো। মাকে দেখালাম। মা যে ভালো বলবেন, তা আমার জানাই ছিল।

ক্ষিতীনদের বাড়িতে দুখানা বাংলা সাপ্তাহিক আসে: 'বঙ্গবাসী' আর 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা'। 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা'—একসঙ্গে একত্র দুখানি সাময়িক পত্র। আনন্দবাজার পত্রিকায় থাকে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সংবাদ, আলোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি। আর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা অংশে কেবলমাত্র বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণব ধর্মসাধনা, বৈষ্ণব ভাবব্যঞ্জক কবিতা, গান প্রভৃতি। অনেক কবিতা গানের তলায় রচয়িতার নাম ও ঠিকানা ছাপা থাকে। এই 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা'র সম্পাদকের নাম শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

আমার সাধ জাগলো—দুটি গান সম্পাদকের নামে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। আমার নিজের বিচারে ভালোই লেগেছে। সম্পাদকের যদি ভালো না লাগে! এই দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে সে-দিন আর গান দুটি পাঠানো হ'লো না।

দ্বিধাগ্রস্ত হবার কারণ—একটি গান ছিল বিদ্যাপতির রচনাশৈলীতে লেখা। মৈথিলীমিশ্রিত বাংলা। এই গানটির সম্বন্ধেই সন্দেহ ছিল বেশি। অন্য গানটি নামকীর্তন। এটির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব ছিল না। ভেবেচিন্তে দু'তিন দিন পরে দুটি গানই পাঠিয়ে দিলাম শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদকের নামে।

ছাপা হয় কি না হয়, এই দুশ্চিন্তায় দিনের পর দিন গুনছি। ক্ষিতীনদের বাড়িতে গিয়ে পরের সংখ্যা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা দেখলাম। হতাশ হতে হ'লো। তার পরের সংখ্যায় বেরোলো আমার নামকীর্তনটি—"ভাই নে রে সুধামাখা হরিনাম।" এই আমার সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রথম রচনা। বলা আবশ্যক—গানটির তলায় ছাপানো হয়েছে ঠিকানা সমেত আমার নাম—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, সাং জগতাই, পোঃ অরঙ্গাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ। আমার আনন্দ আর ধরে না।

দুটি গানের মধ্যে ওই একটিই বেরোলো। অন্যটির আশা ছেড়ে দিয়েছি। দু সপ্তাহ পরে দেখি, আমার আত্মনিবেদনের গানটিও পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ঠিক আগের মতোই আমার নাম ও ঠিকানা দিয়ে। অধিকন্তু এ গানটির শেষে আমার ভণিতা দেওয়া ছিল। পদকর্তারা তাঁদের পদের শেষে ভণিতা যোগ

ক'রে দিতেন, আমিই বা দেব না কেন? গানটি শোনাই:

মাধব, অব হাম কি করি উপায়।
পাপ-কালিমা ঘন পৈঠল হিয়া মাহ,
নাহি গতি বিনা তো কৃপায়॥
নওল কিশোর ভৈ মাতনু লহু লহু
বহুত রভস-রসরঙ্গে।
তরুণী-কাঁতি পরি- রম্ভণে ভৈ গেনু।
উনমত লেহ-পয়সঙ্গে॥
ঘেরল ঘন ঘন ভীষণ রিপু ছয়॥
মুহু মুহু কাঁপই তরাসে।
দিঠি না গিরাইতে ফিরাইতে তৈখনে।
আগোরিয়া মানস গরগম॥
দিব্য অমিয়-মিঠ রূপ বিয়ান ত্যজি॥
অবগাহি রমণী বিলাসে।
তুয়া নাম-মাধবী তেজি উনমাতনু॥
অনুখন অসার পলাশে॥
আন গতি না হেরই মাগই হে মাধব,
তব চরণক রেণু আশে।
তারহ দীনহীন অধম নলিনী ইহ॥
পাপহিয় দাস-অনুদাসে।

৪৪

বৈষ্ণব পদাবলীর অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে 'যুগান্তর' পড়া। বন্ধু-বান্ধবরা মিলে যুগান্তর সম্বন্ধে আলোচনা করি। সকলেই মুগ্ধ হই, যুগান্তরের প্রবন্ধ কবিতা প'ড়ে। ইংরেজ-শাসনের তীব্র নিন্দা ও তীক্ষ্ণ মন্তব্য প'ড়ে যেমন আনন্দিত হই, যুগান্তরের অগ্নিগর্ভ কবিতাগুলি প'ড়ে তেমনি উত্তেজিত হই। একটি কবিতার দুটি চরণ এখনও মনে জাগে—

"রক্ত আমার উঠিছে নাচিয়া
রুদ্ধ ধমনী বাহিয়া,

জীবন আমার স্পন্দিছে আজ
মরণ-চুম্ব যাচিয়া।”

এ কবিতা যখন পড়ি, পদাবলীর পদ তখন আর স্মরণে থাকে না।

কিন্তু যুগান্তরও আর নিয়মিত আসে না। রাজদ্রোহাত্মক লেখার জন্য প্রায়ই যুগান্তর অফিস খানাতল্লাসী হয়। গ্রেপ্তার হন সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর। প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়, কাগজও বন্ধ হয় সাময়িকভাবে। দু'তিন সপ্তাহ পরে নতুন ঠিকানা থেকে আবার বের হয় যুগান্তর। যুগান্তরের এই রকম স্থানান্তর হ'লো এক বছরের মধ্যে অন্তত সাত-আট বার।

এই সময়ে পর পর অনেকগুলি ভীষণ সংবাদ বেরোতে থাকে খবরের কাগজে। প্রথম খবর, তখনকার ছোটলাট স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশের চেষ্টা। লাট সাহেব তাঁর স্পেশ্যাল ট্রেনে পুরী থেকে কলকাতায় ফির্‌ছিলেন, নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে তাঁর ট্রেনের একটি কামরার নীচে রেল-লাইনের উপর একটা সামান্য বিস্ফোরণ হয়। ট্রেনের বিশেষ ক্ষতি হয় নি। এ ঘটনার দস্তুরমতো তদন্ত হ'লো। গ্রেপ্তার হলো রেলের কয়েকজন কুলী। আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হ'লো তারা। বিচারে তারা সকলেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লো। (কিছুকাল পরে আলিপুর বোমার মামলায় প্রধান আসামী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ করেন—নারায়ণগড়ে লাট সাহেবের ট্রেন-ধ্বংসের জন্যে তাঁরাই রেল-লাইনের কাছে মাইন পুঁতে রেখেছিলেন। বেচারা নির্দোষ কুলীদের অপরাধী প্রমাণ ক'রে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে)।

কিছুদিন পরে আরেকটা খবর: ১১ই এপ্রিল (১৯০৮) তারিখে চন্দন-নগরের মেয়র মঃ তাদিভেল ডাইনিং টেবিলে ব'সে ডিনার খাচ্ছিলেন, হঠাৎ জানালার ফাঁক দিয়ে ঢুকে একটা বোমা ফাটলো তাঁর ঘরের মধ্যে। অবশ্য কোনো ক্ষতি হয় নি তাঁর বা অন্য কারও।

ঐ ঘটনার কয়েকদিন পরেই আর একটি ভীষণতর দুঃসংবাদ। কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড বদলী হয়ে জজের পদে বাহাল হয়েছেন মজঃফরপুরে। তিনি সন্ধ্যার সময় কিঞ্চিৎ আনন্দ-উপভোগের জন্যে সেখানকার ইউরোপীয় ক্লাবে গিয়ে থাকেন। রাত্রিকালে বাড়ি ফেরেন তাঁর ফিটন গাড়িতে। ৩০শে এপ্রিল (১৯০৮) তারিখে তাঁর গাড়ি যখন বাড়ির অভিমুখে ফিরছে, তখন হঠাৎ বোমা পড়লো আরোহীদের বসবার আসনের কাছে। ভাগ্যক্রমে কিংসফোর্ড সে সময় গাড়িতে ছিলেন না। ছিলেন দু'জন

ইংরেজ-মহিলা—মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি। মহিলা দু'জনে পরে মারা গেলেন।

হত্যাকারীদের সন্ধান আরম্ভ হ'লো। পরদিন ১লা মে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি চায়ের দোকানে রিভলভার সমেত ধরা পড়লো ক্ষুদিরাম বসু নামে একজন কিশোর বাঙালী।

ওদিকে ২রা মে তারিখে মোকামাঘাট স্টেশনে কলকাতাগামী ট্রেনের একটি কামরায় হুলুস্থূল কাণ্ড। সেই গাড়িতে যাচ্ছিলেন কলকাতার গোয়েন্দা পুলিসের ইনস্পেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মজঃফরপুরের দুর্ঘটনার কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেছে। পুলিসের একটা বিশেষ রকমের ঘ্রাণশক্তি আছে। রেলের কামরার মধ্যে একজন যুবককে দেখে তাঁর মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়। যুবকটিরও সন্দেহ হয় নন্দলালের আচরণে। যুবকটি ট্রেনের কামরা থেকে নেমে পড়ে। নন্দলালও সঙ্গে নেমে যুবকটির অনুসরণ ক'রে 'পুলিস, পুলিস' বলে চীৎকার করতে থাকেন। যুবকটি প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছেন, পিছনে পুলিসের দল। কিছুদূর গিয়ে নিজেরই রিভলভার দিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে যুবকটি আত্মহত্যা করল। নাম—প্রফুল্ল চাকী।

যুগান্তর খুব কমই আসে। ক্বচিৎ কখনো এসে পড়ে। এখন দৈনিক, সাপ্তাহিক কাগজ যোগাড় ক'রে পড়ি আমরা।

খবর বেরোলো—২রা মে তারিখে কলকাতার নানা জায়গায় হানা দিয়ে পুলিস বহু লোককে গ্রেপ্তার করেছে। মুরারিপুকুর রোডের একটি বাগানবাড়ি থেকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ আঠারো জন যুবক ধরা পড়েছে। ৪৮নং গ্রে স্ট্রীটের 'নবশক্তি' সাপ্তাহিকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য আর শৈলেন্দ্রকুমার বসু।

সারা দেশময় ধরপাকড়, খানাতল্লাসী। আমরা তরুণের দল তো আগ্রহী বটেই, আমাদের অঞ্চলের বৃদ্ধেরাও খবরের কাগজ পড়েন আর উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

খবরের কাগজে বেরোলো খানাতল্লাসীতে যত বোমা, ডিনামাইট আর যে পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া গেছে, তাতে কলকাতা শহরকে উড়িয়ে দেওয়া যেত।

'যুগান্তর' বেশ কিছুদিন ধ'রে আর আসে না। হঠাৎ এক সীট ফুলস্ক্যাপ কাগজে ছাপা এক কপি 'যুগান্তর' এল। এক পৃষ্ঠা ছাপা। তাতে মোটা

মোটা বড় বড় অক্ষরে ছাপা একটি কবিতা। গোড়ার ছুটি চরণ—

না হইতে মাগো, বোধন তোমার
ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গল-ঘট।
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আমার,
আবার পূজিব চরণ-তট।

৪৫

৪ঠা মে থেকে ১৯শে মে (১৯০৮) পর্যন্ত আলিপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এল. বার্লির এজলাসে ধৃত ব্যক্তিদের একে একে আনা হ'লো। বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ অনেকেই স্বীকারোক্তি করলেন। তাঁরা গোপনে কী করছিলেন, কেন করছিলেন—সব কথা দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া এই স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য। এই স্বীকারোক্তি কী ভাবে করা হবে, সেটা হয়তো তাঁরা জেলে ব'সেই ঠিক করেছিলেন—কতটা বলা যায় বা না যায়। সেটা পরে বুঝতে পারা গেল—রাজসাক্ষী নরেন গোসাঁই-এর বিবৃতিতে। নরেন গোসাঁই অনেক অপ্রকাশ্য বিষয় ও পুলিসের শেখানো কথা অম্লানবদনে বিবৃত করতে লাগলো আদালতে।

ইতিমধ্যে মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসুর বিচারের বিবরণ খবরের কাগজে বেরোতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন বিচারক। ১১ই আগস্ট (১৯০৮) ক্ষুদিরাম প্রাণ বিসর্জন দিল মজঃফরপুর জেলের ফাঁসির মঞ্চে।

আমরা কয়েকজন বন্ধু নিরম্বু উপবাস পালন করলাম। বেশ মনে পড়ে, কোনো কোনো প্রবীণ ব্যক্তি বাবা-মাকে বলেছিলেন, "এবার তোমাদের ছেলেকেও পুলিসে ধরবে।"

আমরা আলিপুর বোমার মামলার খবরের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি। যাঁরা খবরের কাগজের গ্রাহক তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত ধর্না দিই।

রাজসাক্ষী নরেন গোসাঁই-এর সাক্ষ্যের বিবরণে খবরের কাগজের পাতা ভর্তি। অনেক গোপন কথা বলছে নরেন গোসাঁই।

ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি তাঁর কোর্ট থেকে আলিপুর বোমার মামলা সেসন জজের আদালতে পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক দিন পরেই খবরের কাগজে বড় বড় হরফে

শিরোনামা দিয়ে সংবাদ বেরোলো—"আলিপুর জেলের মধ্যে নরেন গোসাঁইকে হত্যা।"

বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেল পরে। আসামী সত্যেন্দ্রনাথ বসু কাশিতে রোগাক্রান্ত হয়ে জেলখানার হাসপাতালে ভর্তি হলেন। দিনকয়েক পরে অন্যতম আসামী কানাইলাল দত্ত পেটের যন্ত্রণায় হঠাৎ কাতর হয়ে ডাক্তারের আদেশমতো ভর্তি হলেন ঐ হাসপাতালে। পূর্ব পরিকল্পনা মতো সত্যেন বসু ৩১শে অগাস্ট, ১৯০৮ খবর পাঠালেন নরেন গোসাঁই-এর কাছে। তিনিও রাজসাক্ষী হ'তে চান, এজন্যে কিছু পরামর্শের প্রয়োজন। সত্যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। নরেন গোসাঁই আসা মাত্র রিভলভার বার করতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে সে পলায়নে উদ্যত। একটু দূরে যেতেই সত্যেন গুলি ছুঁড়লেন তাকে লক্ষ্য ক'রে। গুলি পায়ে লেগে প'ড়ে যাবার মুহূর্তেই অন্যদিক থেকে কানাইলাল রিভলভার নিয়ে ছুটে এসে নরেন গোসাঁই-এর প্রতি গুলির পর গুলি। কানাইলালের গুলিতে বিদ্ধ হয়েই নরেন গোসাঁই-এর মৃত্যু।

পাগলা-ঘণ্টি বাজলো। ছুটে এল সব কারারক্ষীরা।

জেলের মধ্যে বসলো আদালত। বিচারে দু'জনেরই প্রাণদণ্ড হলো। কানাইলাল ১০ই নভেম্বর (১৯০৮) ও সত্যেন্দ্রনাথ ২১শে নভেম্বর ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা এই দুই শহিদের জন্যে ঐ দিন দু'টিতে উপবাস ক'রে শ্রদ্ধাদিবস পালন করলাম।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে আলিপুর বোমার মোকদ্দমা এল চব্বিশ পরগণার অ্যাডিশন্যাল সেসন্স জজ সি. পি. বীচ্‌ক্রফ্‌টের আদালতে। অভিযুক্ত সাঁইত্রিশ জন আসামী। সরকার পক্ষে কৌন্‌সিলি মিস্টার নর্টন প্রভৃতি চারজন আইনজীবী। এঁদের মধ্যে আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস অন্যতম। অভিযুক্তদের পক্ষে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, কুমুদনাথ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি দশ-বারো জন উকিল-ব্যারিস্টার। মিঃ চক্রবর্তী ও মিঃ চৌধুরী স্বল্পকাল মামলা পরিচালনা ক'রে স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করেন। অতঃপর কৌনসিলির মধ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

সেসন্‌স্ আদালতে মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌টের এজলাসে মামলা আরম্ভ হ'লো ১৯০৯ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে; শেষ হ'লো ৬ই মে তারিখে। এই প্রায় চার মাস কাল প্রধানত নর্টন সাহেব আর চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে তর্কবিতর্ক। নর্টন সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য শ্রীঅরবিন্দ। তাঁকে দোষী প্রমাণিত করবেনই নর্টন,

তার জন্যে নানা তথ্য উল্লেখ ক'রে যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশ নর্টনের প্রতিটি যুক্তি খণ্ডন ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে নির্দোষ প্রমাণিত করবার জন্যে মনীষাদীপ্ত প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। দুই কৌনসিলির তুমুল সওয়াল-জবাবের পর চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের আরগুমেণ্ট চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মামলা-মোকদ্দমার ইতিহাসে। আরগুমেণ্টের সর্বশেষ অংশে তিনি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন, তা যেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাপুরুষের উক্তি। তিনি তারস্বরে বলেছিলেন—

"Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India but across distant seas and lands."

[দীর্ঘকাল পরে এই বিতর্ক যখন নীরবতার মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, এই আন্দোলন ও আলোড়ন থেমে যাবার দীর্ঘকাল পরে, তাঁর মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল পরে তিনি দেশাত্মবোধের কবি, জাতীয়তার নবী ও মানবপ্রেমিক ব'লে প্রতীয়মান হবেন। মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল পরে তাঁর বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয়,—সুদূর সমুদ্র-পারে, ভূমণ্ডলে।]

বিচারক বীচ্‌ক্রফ্‌ট মোকদ্দমার রায় দিলেন ৬ই মে (১৯০৯) তারিখে। সে রায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর থেকে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন সতেরো জন। শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ অন্যান্য ব্যক্তিরা মুক্তি পেলেন বিচারকের আদেশে।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকর শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম ক'রে চিরবিদায় গ্রহণ করতেই তিনি বললেন—"ফাঁসি হবে না।"

হাইকোর্টের আপীলে ফাঁসির আদেশ বাতিল হ'লো। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকর।

মুক্তিলাভের পর শ্রীঅরবিন্দ দুখানি সাপ্তাহিক পত্র বের করলেন—কর্মযোগিন (ইংরাজী) ও ধর্ম (বাংলা)।

আমি 'ধর্ম'-পত্রিকার গ্রাহক হলাম।

৪৬

আলিপুর বোমার মামলার চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পরের একটি ঘটনার কথা এখানে বললে বোধ হয় নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমি সে-সময় পণ্ডিচেরি থেকে কলকাতায় গিয়ে একজন বন্ধুর বাড়িতে আছি। একদিন একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র পেলাম। আহ্বায়ক—শ্রীকমলচন্দ্র চন্দ্র। তাঁর বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ ইন্‌স্টিটিউট অব্ কালচার নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে, সেখানে সারদামঠের শঙ্করাচার্য শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেবেন। বিস্ময় বোধ করলাম বৈকি। কোনো শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে অনুরাগী হবেন, এ-কথা সহজে মন মেনে নিতে চায় না। ইনি তো শঙ্করপন্থীদের গুরু। শ্রীঅরবিন্দ আচার্য শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। সে-সব কথা মায়াবাদীদের শ্রুতিসুখকর নয়। সেইজন্যই যেমন বিস্মিত হলাম, তেমনি কৌতূহলীও হলাম ঐ মঠাধিপতি শঙ্করাচার্যের ভাষণ শোনবার জন্যে।

যথানির্দিষ্ট দিনে সভারম্ভের কিছুক্ষণ পূর্বেই কমলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। দেখি, কয়েকজন বন্ধুও এসেছেন।

স্বল্পক্ষণ পরেই এলেন শঙ্করাচার্য মহারাজ। খর্বাকৃতি সন্ন্যাসী। হাতে দণ্ড। সঙ্গে তিন চার জন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী এবং কয়েকজন গৃহী ভক্ত। কমল চন্দ্র মহাশয় সশ্রদ্ধভাবে অভ্যর্থনা ক'রে তাঁদের সভাকক্ষে নিয়ে এলেন। আমরাও সকলে দাঁড়িয়ে উঠে শ্রদ্ধানিবেদন করলাম তাঁর প্রতি।

দু'-পাঁচ মিনিট বিশ্রামের পর তিনি তাঁর ভাষণ আরম্ভ করলেন। তাঁর মুখের কথা হুবহু বলা এখন আর সম্ভব নয়। মোটের উপর যতটা মনে আছে, নিজের ভাষায় বলি। তিনি বললেন—

"উনিশ শো আট সন। আমার তখন ছাত্রজীবন। থাকি মহারাষ্ট্রে। আমাদের তরুণের দল সে-সময় বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের অনুগামী। তাঁর প্রভাবে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের উন্মেষ। তিলক মহারাজের উপর আমাদের যেমন শ্রদ্ধাভক্তি, তেমনি শ্রদ্ধাভক্তি শ্রীঅরবিন্দেরও প্রতি। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আমাদের কিরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল, একটা উদাহরণ দিলেই হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন। আমরা সে-সময় নিয়মিত গীতাপাঠ করতাম। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় যে-সব জায়গায় 'ভগবানোবাচ' শব্দ মুদ্রিত ছিল,

সেই সব জায়গায় গীতোক্ত ঐ কথাটি কেটে দিয়ে সেখানে আমরা লিখে দিয়েছিলাম 'অরবিন্দোবাচ'। এই দৃষ্টি দিয়েই আমরা শ্রীঅরবিন্দকে দেখতাম।

"শ্রীঅরবিন্দপ্রমুখ অভিযুক্তদের যখন আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার চলছে, সে-সময় খবরের কাগজে একটি আবেদনপত্র বেরোল। লেখিকা—সরোজিনী ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দের ভগিনী। ঐ পত্রে তিনি আলিপুর বোমার মামলার ব্যয়নির্বাহের জন্যে অর্থসংগ্রহের আবেদন করেছেন। অর্থ পাঠাবার ঠিকানাও ছিল ঐ পত্রে। আমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে দুজন বন্ধু কলকাতা যাত্রা করলাম। সঙ্গে ছিল একজন সুপরিচিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির দেওয়া আমাদের পরিচয়-পত্র।

কলকাতায় গিয়ে আবেদন-পত্রে উল্লিখিত ঠিকানায় গিয়ে সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে আমাদের পরিচয়-পত্র ও সংগৃহীত অর্থ দিয়ে বললাম, "যদি আপনাদের কোনো কাজে লাগতে পারি—এইজন্যেই এসেছি আমরা।" তাঁরা আমাদের সস্নেহে গ্রহণ করলেন।

কয়েকদিন যাতায়াতের পর ঘনিষ্ঠতা জন্মালো তাঁদের সঙ্গে। দুটি একটি ছোটখাটো কাজের ভারও পেলাম আমরা।

যেটুকু কাজ করবার, শেষ ক'রে আমরা প্রত্যহ আলিপুরে যাই আদালতে মোকদ্দমার শুনানি শুনতে। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে মোকদ্দমা স্থানান্তরিত হয়েছে দায়রা জজ মিঃ বীচক্রফটের আদালতে।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য জেরা প্রভৃতি শেষ হয়েছে। দু' পক্ষের কৌন্‌সিলিদের সওয়াল-জবাবের পালা। এই সময়ে অর্থসংগ্রহের আপিসে ব্রাউন রঙের লম্বা খামে একখানা চিঠি এলো। খাম খুলে দেখা গেল চিঠিপত্তর নেই, আছে কেবলমাত্র টাইপ-করা দু' পাতা ফুলস্ক্যাপ কাগজ। তাতে এক-দুই-তিন পর্যায়ক্রমে ঐ বোমার মামলা সংক্রান্ত কতকগুলি বিবরণ। আমরা ঐ কাগজ দুটি নিয়ে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ সাহেবের কাছে গেলাম।

দাশ সাহেব কাগজ দুটি প'ড়ে স্তম্ভিত। বললেন—"কে পাঠালে ?"

আমরা বললাম—"চিঠিপত্তর কিছুই ছিল না, মাত্র ঐ দু' শীট কাগজ। কী আছে ওতে ?"

"সব আছে ওর মধ্যে। অন্তত সাত দিন নথিপত্র ঘেঁটে আমাকে এই তথ্যগুলি খুঁজে বের করতে হ'তো। যিনিই পাঠিয়ে থাকুন, তিনি একজন অতি-বুদ্ধিমান আইনজ্ঞ ব্যক্তি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে পাঠালে ?"

দাশ সাহেবের কাছ থেকে আপিসে ফিরে এসে আমরা আলোচনায় বসলাম। আমাদেরও প্রশ্ন—কে পাঠালে ওই টাইপ-করা কাগজ? দাশ সাহেবের কথা শুনে মনে হয়েছে—মোকদ্দমার সমস্ত নথিপত্র ভাল ক'রে না জানা থাকলে ঐ সব অত্যাবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আর আশ্চর্যের বিষয়—ওই মূল্যবান তথ্যগুলি যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক! নানারকম জল্পনা-কল্পনা ক'রে আমরা শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম—নিশ্চয়ই ঐ টাইপ-করা কাগজ পাঠিয়েছেন স্বয়ং বিচারপতি বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌। এ আমাদের স্থির বিশ্বাস।

আমরা শুনেছিলাম শ্রীঅরবিন্দ ও বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ দু'জনেই একসঙ্গে আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে আলিপুরের আদালতে দুই সতীর্থের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। একজন আসামীর কাঠগড়ায়, অন্যজন বিচারকের আসনে। এই নাটকের যবনিকাপতন হ'লো বিচারক সতীর্থের রায়ে নিরপরাধ সতীর্থের মুক্তির আদেশ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সেদিন তাঁর সশ্রদ্ধ ভাষণে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত-পূর্ব কথা বলেছিলেন।

৪৭

আলিপুর বোমার মামলায় পরিসমাপ্তির পরে আমিও হতাশ হয়ে পড়লাম। বড় আশা ছিল—ডাক আসবে। আর আশা নেই।

এই সময় আমি দহরপাড় গ্রামের নীলকান্ত সেন মহাশয়ের পুত্র হিমাংশুকে প্রাইভেট পড়াতাম। নীলকান্তবাবু একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কাছ থেকে আমাদের জঙ্গিপুর মহকুমার সরকারী মহলের অনেক খবর পাওয়া যেত। একদিন নীলকান্তবাবু তাঁর একজন বন্ধুকে বললেন—"গবর্নমেন্টের বিশ্বাস, এখনও বহু বিপ্লবী সমগ্র দেশ ছেয়ে আছে। তাদের খুঁজে বের করবার জন্যে থানায় থানায় নোটিস এসেছে।"

নীলকান্তবাবুর কথায় একটু চিন্তিত হলাম। নিজের জন্যে নয়। আমি কিসের বিপ্লবী? চিন্তিত হলাম, আমাদের জঙ্গিপুর মহকুমার মধ্যে যদি কোনো

বিপ্লবী থাকে, তার জন্যে। কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলে কোনো বিপ্লবী আছে বলে মনে হয় না।

নীলকান্তবাবুর বাড়িতে মাস্টারি করতে করতে একদিন এডুকেশন গেজেটে একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপনে দেখলাম, মালদহ জেলার যদুপুর বোর্ড স্কুলের জন্যে একজন শিক্ষক প্রয়োজন। মাইনে কম কিন্তু আহার বাসস্থান ফ্রি। স্কুলের সেক্রেটারির নামে একটা দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দিলাম।

দিন পনেরোর মধ্যে নিয়োগ-পত্র এলো যদুপুর থেকে। সেক্রেটারি মহাশয় আমার পথযাত্রার যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই দেখে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। গোদাগাড়ি-কাটিহার লাইনের সামশি স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে যেতে হবে দশ-বারো মাইল। তথাস্তু। বাড়ি থেকে রওনা হলাম। গেলাম কাটিহার হয়ে। সামশি স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িও জুটলো। আমাদের দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) গরুর গাড়িতে যাবার একটা সুন্দর উপমা দিতেন। বলতেন, "এ যেন shake the bottle before use অবস্থা।" সেই অবস্থায় চললাম গরুর গাড়িতে। কয়েক মাইল যাবার পর রাজপ্রাসাদের মতো একটা বিরাট অট্টালিকা দেখা গেল। গাড়োয়ান বললে, "চাঁচোলের রাজবাড়ি"। আমাদের সুরসিক সাহিত্যিক বন্ধু শিবরাম চক্রবর্তীর বাল্য ও কৈশোরের কেলিকেন্দ্র।

যদুপুরের কাছে মথুরাপুর। এই মথুরাপুরেই সেক্রেটারি কিশোরীমোহন সিংহের বাড়ির ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো গরুর গাড়ি। গাড়ির কাছে যিনি এলেন, তিনিই সেক্রেটারি। বার্ধক্যের এলাকায় প্রবেশ করেছেন। আমাকে বেশ স্নেহভরেই গ্রহণ করলেন। তাঁর বাড়িতেই আমার আহার ও বাসস্থান। অবশ্য তার জন্যে তাঁর একটি ছেলেকে বাড়িতে পড়াতে হবে।

যদুপুর বোর্ড স্কুল নাম হ'লেও স্কুলটি কিন্তু মথুরাপুরে। যদুপুর আর মথুরাপুর পাশাপাশি গ্রাম। মথুরাপুর আমার কর্মক্ষেত্র কিন্তু আমার লীলাক্ষেত্র যদুপুর। যদুপুরে আমার সমবয়সী তরুণের দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম স্বল্পকালের মধ্যেই। তারা বোধ হয় একজন গাইয়ের অভাব বোধ করছিল। তারা একজন গায়ক খুঁজছিল তাদের গ্রামের যাত্রার দলে জুড়িতে গান গাইবার জন্যে। আমি তাদের প্রস্তাবে প্রথমত রাজি হইনি। মাস্টারী করতে এসে যাত্রার দলে গান গাইবো! লোকে বলবে কি? কিন্তু লোক বলতে তো তারাই। তারা আমাকে কিছুতেই ছাড়লে না। নামতে হ'লো যাত্রার দলে।

তিন চার মাস মাস্টারী করছি। এই স্বল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিমান সেক্রেটারি

মহাশয় আমাকে বেশ চিনে ফেলেছেন। তিনি জমিদার। রাজ-অমাত্যদের প্রতি আনুগত্য তাঁর স্বধর্ম। আমি যে তাঁর বিপরীতধর্মী, এটা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি সহজেই এবং বুঝে তাঁর ছেলেটির ভবিষ্যৎ-এর জন্যে চিন্তিত হয়েছিলেন। কেবল নিজের ছেলেই নয়, স্কুলের ছেলেদের জন্যেও চিন্তিত হয়েছিলেন তিনি। ভাবে-ভঙ্গীতে মনে হ'লো, আমার মাস্টারীর আয়ুও বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে।

ছ'সাত মাস চাকরি করবার পর সেক্রেটারি মহাশয়ের নির্দেশক্রমেই একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। আমি চাকরি ছাড়লাম কিন্তু যদুপুরের লোকেরা আমাকে ছাড়তে চায় না। মথুরাপুরের আস্তানা ছেড়ে চ'লে এলাম যদুপুরে। দুর্যোধন সিংহ মহাশয় তাঁর বাড়িতে আমার আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর ভাই সর্বন সিংহের সঙ্গে পূর্বেই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

১৯১০ সনের এপ্রিল মাস। খবরের কাগজে একটা চাঞ্চল্যকর খবর বেরোলো: হ্যালির ধূমকেতু নাকি আসছে পৃথিবীর আকাশের উপর। হ্যালি (Halley) সাহেব এই ধূমকেতুর আবিষ্কর্তা। তাই এর নাম হ্যালির ধূমকেতু। হ্যালি সাহেব গণনা ক'রে বলেছিলেন এ ধূমকেতুর উদয় হয় প্রতি ছিয়াত্তর বছরে একবার। এই ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল ১৭৫৯ আর ১৮৩৫ সনে। এবারে দেখা যাবে ১৯১০-এর ২০শে এপ্রিল তারিখে। হপ্তাখানেক কেটে গেল, ধূমকেতুর দেখা মিললো না আমাদের আকাশে। এর পর খবরের কাগজে বেরোলো মাদ্রাজ প্রদেশের কোদাইকানাল মানমন্দির থেকে ২৬শে এপ্রিল তারিখে হ্যালির ধূমকেতুর দেখা মিলেছে। দেখা গেছে সাতটি পুচ্ছ এ ধূমকেতুর!

জ্যোতির্বিদরা গণনা ক'রে বললেন, ১৮ই মে এই ধূমকেতুর পুচ্ছের সঙ্গে কক্ষপথে পৃথিবীর সংস্পর্শ ঘটতে পারে। কোনো কোনো জ্যোতিষীর মতে ধূমকেতুর পুচ্ছের সঙ্গে এই সংস্পর্শ সংঘর্ষেও পরিণত হতে পারে। তার ফলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পৃথিবীর অস্তিত্বলোপের সম্ভাবনা। এই ভয়ঙ্কর সংবাদে বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কাশীধামে যাত্রা করলেন ১৮ই মে তারিখে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শিবত্বপ্রাপ্তির আশায়। বলা বাহুল্য, তাঁদের শিবত্ব সম্ভব হয়নি।

যে-দিন ধূমকেতু দেখলাম, সে-দিনটি বোধ হয় ১৯১০-এর মে মাসের ৫ তারিখে। সন্ধ্যা থেকেই বন্ধুবান্ধব মিলে ধূমকেতুরই গল্প চলছে। জল্পনাকল্পনাতে রাত দুপুর গড়িয়ে গেল। বন্ধুরা যে যার বাড়ি চ'লে গেলেন। আমিও আশ্রয়

নিলাম আমার শয়ন-কক্ষে। চোখে ঘুম নেই। মাঝে মাঝে বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে এসে আকাশটা ভালো ক'রে দেখে যাই। সে-দিন ভোর চারটে নাগাদ উঠে দেখি—পূর্বাকাশে শুক্রগ্রহের অনতিদূরে একটা বিস্ময়কর অত্যুজ্জ্বল লম্বমান দৃশ্য। ঠিক সাদা ঘোড়ার ল্যাজের মতো। পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে ধূমকেতুটিকে পাঁচ-ছ' ফুটের বেশি দীর্ঘাকার ব'লে ম'নে হয় নি। মুখের দিকে একটি গোলাকার উজ্জ্বল তারকা। পিছনটা ঘোড়ার ল্যাজের মতোই অনেকটা দেখতে। পরে জানলাম পিছনের দিকটাকে বৈজ্ঞানিকরা ধূমকেতুর ল্যাজই বলে। প্রথম দিনটিতে ধূমকেতুর যে আকার দেখলাম, পরের দিন দেখি তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় এবং আরও খানিকটা উপরে অগ্রসর হয়েছে। এইরকম দিনের পর দিন বেড়ে বেড়ে মাসখানেকের মধ্যে আধখানা আকাশ জুড়ে তার বিরাট বপু। যেমন বিশাল, তেমনি ভয়ঙ্কর।

ধূমকেতু নাকি রাতের ভালে অমঙ্গলের তিলক-রেখা। কথাটা নেহাৎ কবির কল্পনাপ্রসূত নয়। এই ধূমকেতু ওঠার পরেই ৬ই মে পরলোকগমন করলেন ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড। আর আমাদের দেশের কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের মৃত্যু হ'লো ঐ ১৯১০ সনেরই ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে।

ধূমকেতুটিকে যেদিন প্রথম দেখি, সেই রাত্রে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটলো আমার শয্যাপার্শ্বে। আমার একজন পিসতুতো দাদা মোহিনীমোহন সরকারের কথা আগে ব'লেছি। এই দাদা আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। দাদা তখন কাঞ্চনতলা হাই স্কুলের হেড্‌মাস্টার। অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই মোহিনীদার সঙ্গে। দেখা হ'লো এই ধূমকেতু ওঠার রাত্রিকালে। বিছানায় শুয়ে আছি। ধূমকেতু দেখবার আশায় চোখে ঘুম নেই। মাঝে মাঝে উঠে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ আকাশ-পানে চেয়ে থেকে হতাশ হয়ে ফিরে আবার শুয়ে পড়ি। এই অবস্থায় মুদ্রিতনেত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ মনে হ'লো—কে যেন আমার মাথার কাছে এসে বসেছে। চোখ মেলে দেখি মোহিনীদা! চমকে উঠে বললাম—"মোহিনীদা, আপনি!"

মোহিনীদা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ধূমকেতু দেখতে বন্ধুরা যখন এলেন, তাঁদের বললাম এই অলৌকিক দর্শনের কথা। তাঁরা হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, "তুমি স্বপ্ন দেখেছো।"

তিন-চার দিন পরে বাবার চিঠি পেলাম। বাবা জানিয়েছেন, ঠিক সেই রাত্রিতেই মোহিনীদা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন!

৪৮

আমার কলকাতার বন্ধু পশুপতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ চলেছে। আমার মাধ্যমে তার আরো একজন পত্র-বন্ধু মিলেছে। নাম—লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তখন তার কাকা যোগেন্দ্রনাথ সেন উকিলের বাড়িতে থেকে বহরমপুর কলেজে পড়ে।

পশুপতি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই লেখে কলকাতায় যাবার জন্যে। লক্ষ্মীনারায়ণ একবার লিখলে, পশুপতি কলকাতায় যাবার জন্যে তাকেও বারংবার অনুরোধ করে।

একবার আমরা দুজনে কলকাতা যাওয়া স্থির করলাম। কথা হ'লো, আমি বহরমপুরে যাব, সেখান থেকে একসঙ্গে কলকাতা রওনা হব দুজনে।

আমি যদুপুরের পাট তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তারপর কলকাতা যাবার জন্যে লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে গেলাম বহরমপুরে।

কলকাতা যাওয়ার ব্যাপারে কাকা যোগেন্দ্রনাথ লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, শুনলাম। সহযাত্রীরূপে আমাকে দেখে তাঁর মুখ যেন বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বড়দিনের সময়ে কলকাতায় যাচ্ছ, কত টাকা সঙ্গে নিয়েছো?"

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলাম—"কোথায় পাবো টাকা? সামান্য পঁচিশ টাকা নিয়ে যাচ্ছি।"

"পঁচিশ টাকা যার কাছে সামান্য, তার উপার্জন কত?"—কটাক্ষসহকারে যোগেনবাবুর প্রশ্ন।

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

১৯১০ সনের বড়দিনের সময় আমরা দু'জনে শিয়ালদহ স্টেশনে নামলাম। এই আমার প্রথম কলকাতা-দর্শন।

সে-সময় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের পুত্র ব্যাংবাবু কলকাতায়। পশুপতির সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, কিন্তু ব্যাংবাবু আমাদের দু'জনেরই চেনা। শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই দেখি, ব্যাংবাবু আর তার সঙ্গে অপরিচিত এক সুদর্শন তরুণ—নিশ্চয়ই পশুপতি।

পশুপতি আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললো তারই বাড়িতে। বাড়ির নাম ক্যানাল ভিলা। বাগবাজার খালধারে কাছে প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি।

কলকাতা শহর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তখনও কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী। মাসখানেক আগে লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লাট হয়ে কলকাতায় এসেছেন। পশুপতি, ব্যাংবাবু ও তাদের একজন বন্ধু কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি আমাদের দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। সেই প্রথম চড়লাম ট্রামগাড়িতে, প্রথম চড়লাম মোটরগাড়িতে, প্রথম দেখলাম কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কলকাতার থিয়েটার। দেখেছিলাম গিরিশচন্দ্রের ছত্রপতি শিবাজী আর দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকের অভিনয়।

কলকাতা, বিশেষ ক'রে তখনকায় বড়দিনের কলকাতার রূপৈশ্বর্য অবর্ণনীয়, অপরূপ। কলকাতা শহরের এই বিস্ময়কর স্মৃতি নিয়ে সপ্তাহকাল পরে গ্রামের মানুষ গ্রামে ফিরে এলাম।

৪৯

আমাদের পল্লীগ্রামাঞ্চলে তখন ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। হেন বাড়ি নেই যেখানে ম্যালেরিয়া রোগী নেই। কিছুদিনের মধ্যেই আমাকেও আক্রমণ করলো এই কাল-ব্যাধি। সত্যিই কালব্যাধি। দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস পার হয়ে যায়, পল্লীগ্রামে থেকে যতদূর চিকিৎসা সম্ভব, সব-কিছুরই ব্যবস্থা হয়ে চলেছে কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম নেই। বছরখানেক পর চিকিৎসকেরা বললেন, এ ম্যালোরিয়া এখন কালাজ্বরে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসা চলছে—অবিরাম জ্বর, হজমশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। চিকিৎসকেরা আশা ছেড়ে দিলেন; নিষ্ফল চিকিৎসা। বাঁচবার কোনও সম্ভাবনা নেই জেনে আমার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করতে মা একদিন আমাকে বললেন, "হাঁ রে, কী খেতে ইচ্ছা হয়?"

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কচ্ছপের মাংস।"

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, "কাছিম? কাছিম খাবি তুই?"

"হাঁ মা, কাছিম খেতে ইচ্ছা করছে।"

কেন যে এ-ইচ্ছা আমার মনে জাগল ইচ্ছাময়ই জানেন। মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, কখনও কোনো রকম মাংস আমাদের হেঁসেলে প্রবেশ করেনি। একেবারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের বাড়ি। মায়ের কথা আমি আগে অনেকবার বলেছি,

তিনি ধর্মপরায়ণা। আমার কাছিমের মাংস খাবার কথা শুনে তিনি কানে আঙুল দিয়েছিলেন কি না জানি না। কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যেই আমার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হলো: মা আমাকে কাছিমের মাংস খাওয়ালেন।

শুনলাম আমাদের শুঁড়ি প্রজাদের ব'লে কাছিম সংগ্রহ ক'রে, তাদের দিয়েই কাটিয়ে ছাড়িয়ে আনিয়ে মা নিজেই সেই মাংস রান্না করেছিলেন।

প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর জন্যে সকলেরই সশঙ্ক প্রতীক্ষা।

এই দুর্বল দেহেও আমি একেবারে চলচ্ছক্তিহীন নই, যদিও শয্যাগত অবস্থাতেই দিনরাত্রির অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হয়। বিছানার পাশে তিনচারটা বালিশ স্তরে স্তরে সাজানো থাকে, মাঝে মাঝে উঠে ঐ সব বালিশে হেলান দিয়ে বসি।

একদিন সকালবেলা। বেলা আন্দাজ আটটা-ন'টা। শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে দেখি—মা ঘরে ঢুকছেন, পিছনে একজন সন্ন্যাসী। মাথায় কান-ঢাকা টুপি, হাতে কমণ্ডলু, আজানুলম্বিত বহির্বাস। ললাট ভস্মলিপ্ত। চেহারায় কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

এই অতিসাধারণ সাধুটির চেহারার মধ্যে আমার মা কী বস্তু যে খুঁজে পেলেন, তা তিনিই জানেন। সাধু এসেছেন ভিক্ষা করতে। পথ-চলতি এমন কত সাধুই তো আসে যায়। মুষ্টিভিক্ষা দিতে গিয়ে মা সাধুর কাছে প্রার্থনা জানালেন, "বাবা, আমার ছেলে অনেকদিন অসুখে ভুগছে;—তুমি একবার দেখবে?"

তাই সাধু কৃপা ক'রে এসেছেন আমার কাছে। আমার দিকে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"ক্যা বাচ্চা, ক্যা হুয়া? উঠ্।"

এমনভাবে কথাগুলি বললেন যেন আমার সঙ্গে তাঁর কতকালের পরিচয়। যেন আমার অসুখের খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন আমাকে দেখতে। আমি আস্তে আস্তে উঠে বালিশগুলিতে হেলান দিয়ে বসলাম। সাধু স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে 'ঠিক হ্যায়' মাত্র এইটুকু ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মনের মধ্যে সাধুর চিন্তা জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রশ্ন জাগে: কে এই সাধু? কোত্থেকে এলেন?

কিছুক্ষণ পরে বাবা এলেন আমার কাছে। তাঁর কাছে শুনলাম, সাধু রইলেন আমাদের বাড়িতে। তিন দিন থাকবেন। বাবা সাধুর নাম জিজ্ঞাসা করায় সাধু বলেছিলেন—রামদাস। রামের দাস ব'লে তিনি রামদাস, না রামদাস-ই তাঁর নাম—এ প্রশ্ন বাবার মনে জাগেনি।

সাধু আছেন আমাদের বাড়িতে। ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকেন তাঁর আসনটিতে। গ্রামের দু'চারজন কৌতূহলী লোক তাঁকে দর্শন করতে আসে। প্রণাম ক'রে চ'লে যায় তারা। কারও প্রতি সাধুর আগ্রহ নেই, অবজ্ঞাও নেই। সাধু থাকেন নিজের ভাবে বিভোর হয়ে। তাঁর সেবার ভার মায়ের উপর। মায়ের সঙ্গেই যা দুটি-একটি কথা হয় সাধুর। আমার কাছে এসে মা-বাবা দু'জনেই সাধুর গল্প করেন। সাধু তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন—আমার অসুখ সেরে যাবে। বাবার মন দ্বিধাগ্রস্ত কিন্তু মায়ের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। মায়ের বিশ্বাস, তাঁর পুত্রের আরোগ্যের জন্যেই সাধুর আগমন। মায়ের মতে এ আগমন নয়—আবির্ভাব।

আমি শুয়ে শুয়ে সব শুনি। শুনলাম—সাধু মায়ের কাছ থেকে একটি বড় বোতল চেয়ে নিয়েছেন আমার ওষুধের জন্যে।

তৃতীয় দিবসে একটি আসন্ন সন্ধ্যায় মা এসে আমাকে বললেন, "সাধু ডাকছেন।"

অতি ধীর মন্থর গতিতে চ'লে উপস্থিত হলাম সাধুর কাছে। সাধুর আসনের অনতিদূরে একটি আসন পাতা। তারই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে সাধু আমাকে বললেন—"বৈঠো।"

আমাকে বসিয়ে দিয়ে মা তাঁর নিজের কাজে চ'লে গেলেন। হয়তো সাধুর সেইরূপই নির্দেশ ছিল।

সাধু গল্প জুড়ে দিলেন আমার সঙ্গে। সারা ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির পুণ্যকথা। ভাষা হিন্দি হলেও আমার কাছে আদৌ অবোধ্য হচ্ছিল না, বরং কথাগুলি ভারি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছিল তাঁর বর্ণনার গুণে। কথা আর ফুরোয় না। ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির মানচিত্র তিনি তুলে ধরেছেন যেন আমার সম্মুখে। কেদার-বদরী, কৈলাস-মানসসরোবর থেকে আরম্ভ ক'রে কন্যাকুমারী, সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে এসে যখন তিনি গল্প-বলা শেষ করলেন, তখন রাত্রি আন্দাজ এগারোটা। এই দীর্ঘ সময় কী ক'রে ঠায় ব'সে কাটালাম, ভাবলে বিস্মিত হই।

এই মধ্যরাত্রিতে সাধু একটি পাউলি (ছোট ঘটি) আমার হাতে দিয়ে তাঁর হিন্দি ভাষায় যা বললেন তার মর্মার্থ এইরূপ: "বেটা, এই লোটাটি নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাও। লোটা হাতে নিয়েই গঙ্গায় একটি ডুব দেবে। ডুব দিয়ে উঠে ওই জলভরা লোটা নিয়ে সটান আমার কাছে চ'লে এসো। পিছন থেকে যদি কেউ ডাকে, তার দিকে চেয়ো না বা তার ডাকে সাড়া দিয়ো না।"

সে সময় আমাদের বাড়ি থেকে গঙ্গার দূরত্ব প্রায় আধ মাইল। এতটা পথ যাওয়া-আসা করা তখন আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এই দুর্বলতার কথা তখন আর মনেও এলো না। পাউলিটি হাতে ক'রে সেই নিশীথ রাত্রে রওনা হলাম গঙ্গাস্নানে। নিঝুম নিস্তব্ধ পল্লীগ্রামে নীরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ ক'রে কায়ক্লেশে গঙ্গাতীরে এসে পৌঁছলাম। বহুদিন গঙ্গাদর্শন হয় নি। অনেক বার মা-গঙ্গার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু গঙ্গাস্নানের নয়—গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা। সেই গঙ্গায় আজ অবগাহন ক'রে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম, অন্তর-বাহিরের সমস্ত গ্লানি যেন ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

জলভরা পাউলি নিয়ে ফিরে এলাম সাধুর কাছে। যাবার সময় বা ফেরবার পথে পিছন থেকে কারও কোনো ডাক শুনতে পাইনি। সাধুর কাছে এসে দেখি, তিনি তাঁর ধুনির সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বৃত্ত রচনা করেছেন। বৃত্তের পরিধিটি ধুনির কাঠের কুচি দিয়ে গড়া। সাধু আমার হাত থেকে জলভরা সেই পাউলিটি নিয়ে আমাকে সেই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে বসতে বললেন। আমি তাঁর আদেশ যথাযথ পালন করলাম। তারপর সাধু সেই বৃত্তের পরিধির কাঠের কুচি-গুলিতে অগ্নিসংযোগ ক'রে দিলেন। কোনো কুচি জ্বললো, কোনোটা-বা জ্বললো না। তিনি কাঠের কুচিগুলি বেশ নিরীক্ষণ ক'রে একটি জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড তুলে নিয়ে সেটিকে বৃত্তের মধ্যে আমার সম্মুখে রেখে পাউলির গঙ্গাজল দিয়ে কয়লার আগুন নিভিয়ে দিলেন। আর, কয়লাটি গঙ্গাজলে ঘষে আঙুলের ডগায় কালো কর্দমের খানিকটা তুলে একটি ফোঁটা পরিয়ে দিলেন আমার ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে। তারপর আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "অব্ ঘর যাও।"

ঘরে ঢুকতেই বাবা-মা আমার চেহারা দেখে অবাক: ভিজে কাপড়, ভিজে মাথা—সর্বাঙ্গ ভিজে। গা-হাত-পা মুছে, কাপড় বদলে, তাঁদের সব কথা ব'লে শুয়ে পড়লাম।

সুখনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কেটে গেল। সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই দেখি, একটি বড় বোতল হাতে ঘরের মধ্যে সাধু প্রবেশ করছেন। এই বোতলটিই আগের দিন তিনি মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। যেন চুনের জলের বোতল। বোতলের তলার দিকে প্রায় ইঞ্চিখানেক জায়গায় চুনের মতো সাদা পদার্থ থিতিয়ে আছে। উপরের দিকটা পরিষ্কার জলে ভর্তি। সাধু ব্যবস্থা করলেন, এই বোতলের জল আধ ছটাক আন্দাজ প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় পান করতে হবে। প্রতি বারে ওষুধের জল ঢেলে নিয়ে প্রতি বারেই গঙ্গাজল দিয়ে বোতলটি ভ'রে রাখতে হবে। বোতল কখনও খালি থাকবে না। ওষুধ খেতে হবে একুশ দিন।

আর এই একুশ দিন মাছ, মাংস ও তেল একেবারে নিষেধ। প্রধান খাদ্য——ছোলা। নানা রকমে এই ছোলা খাবার ব্যবস্থা: ছোলা-ভেজা, ছোলার ডাল, তরকারির মধ্যে ছোলা, ছোলার ছাতু ইত্যাদি। যত বেশি ছোলা খাওয়া সম্ভব হবে, রোগও তত শীঘ্র সেরে যাবে। তেলের বদলে রান্নার ব্যবস্থা ঘী-য়ে। ইত্যাদি ব'লে সাধু তখনই আমাদের বাড়ি থেকে চ'লে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

বাড়ির কারও ইচ্ছা নয় যে, সাধু সেইদিনই আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় হন। সকলের মনেই সাধুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, অগাধ ভক্তি জেগেছে। কিন্তু বাবার মনে একটি সংশয় দেখা দিয়েছে পথ্যের কথা শুনে;—যকৃতের ক্রিয়া যার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, পাকস্থলী নিষ্ক্রিয় সে এই ছোলার রকমারি খাদ্য হজম করবে কী ক'রে? বাবা সাধুকে আরো দু'চারদিন থাকবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বাবার মনের কথা সাধু বুঝতে পেরেছিলেন কি না, তিনিই জানেন। বাবার অনুরোধ তিনি একেবারে প্রত্যাখ্যান করলেন না। একটি দিন অর্থাৎ সেই দিনটিই থাকতে রাজি হলেন। কেবল থাকাই নয়, সাধু বললেন, যখন সে-দিনটি রইলেনই তখন তিনি নিজ হাতে রান্না ক'রে আমাদের বাড়িসুদ্ধ সকলকে খাওয়াবেন। মায়ের উপর হুকুম হলো ছোলা ভেজাবার। আদেশ হ'লো ছোলার ছাতু, ছোলার ডালের।

বাড়ির মেয়েরা সাধুর আদেশ পালনের জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন। গালে হাত দিয়ে বসলেন বাবা। রোগীর হজম তো দূরের কথা, এই সব ছোলাবহুল ব্যঞ্জন তিনি নিজে পরিপাক করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

দুপুর নাগাদ রান্না হয়ে গেল: ছোলার ডাল আর ছোলা মেশানো ঘৃতপক্ব তরকারি। সাধু আমাদের সকলকে নিয়ে খেতে বসলেন। সাধুর পাশেই বসলাম আমি। গরম ভাতের উপর ঘী আর ডাল-তরকারি বৎসরাধিক কাল চোখে দেখি নি। বড় তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম সেদিন।

সন্ধ্যায় আরও সমারোহ-ব্যাপার। সাধু 'লিট্টি' তৈরি ক'রে আমাদের খাওয়াবেন,—ছোলার ডাল, আর 'লিট্টি'। লিট্টি বস্তুটির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ময়দায় (আটায়) বেশ ক'রে ঘীএর ময়ান দিয়ে মেখে রাজভোগ আকারে এক-একটা বলের মতো নেচি তৈরি করা হ'লো। সেই নেচিকে বাটির আকার ক'রে তার খোলের মধ্যে ছোলার ছাতু পুরে আবার এক-একটি গোলা তৈরি করা হ'লো। তারপর সেই গোলাকে চ্যাপটা করা হ'লো করতলের উপরে চাপ দিয়ে। দেখতে যেন আধ ইঞ্চি পুরু একটি ছোট্ট রুটি। সেই রুটিতে

বেশ চপ্‌চপে ক'রে ঘী মাখিয়ে একটা হাতার মধ্যে রেখে প্রবেশ করানো হ'লো জলন্ত অঙ্গারের মধ্যে। বারংবার ঘী মাখিয়ে সেঁকে সেঁকে যখন সেটি লালচে বাদামী রঙের রূপ ধারণ করলো, তখন তার নাম হ'লো লিট্টি। রাত্রে আমি ছোলার ডাল দিয়ে দুখানি ঘৃতাক্ত লিট্টি পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ফেললাম। বলা আবশ্যক যে, দুখানির বেশি লিট্টি খাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় নি। এই গুরুভোজনের পরিণতি সম্বন্ধে প্রত্যেকেই একটু চিন্তিত হয়ে রইলেন। আর আমার পরিণতি তো কিছুকাল আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে আর শঙ্কাই বা কী আর চিন্তাই বা কী।

সকাল হ'লো। কারও অসুখের কোনো লক্ষণ নেই। বরং যার অসুখ ছিল, সে সেরে গেল। বৎসরাধিক কালের অবিরাম জ্বরের চিহ্ন দেখা গেল না তাপমান যন্ত্রের মধ্যে। অকর্মণ্য পাকাশয়েও খাদ্যবস্তু পরিপাকে কিছুমাত্র গোলযোগ ঘটে নি, দেখা গেল।

সেই সকালবেলাতেই আমাদের বাড়ি থেকে সাধু চ'লে গেলেন। আমাদের প্রণামের জন্যে রেখে গেলেন তাঁর আসনের সম্মুখে নির্বাণোন্মুখ ধুনির ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি।

৫০

আমাদের জগতাই-নিমতিতা থেকে ছ'মাইল দূরে এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র ধুলিয়ান। ধুলিয়ানেই সমশেরগঞ্জ থানার মূল ঘাঁটি। মিউ-নিসিপ্যালিটি আছে। হাতে-তৈরি তুলট কাগজ তৈরি হয় এখানে। পীতাভ রঙের কাগজ। কলকাতাতেও চালান যায়। সেকালে গণৎকাররা এই কাগজে কোষ্ঠী তৈরি করতেন।

ধুলিয়ানের পাশেই কাঞ্চনতলা। কাঞ্চনতলা বঙ্গজকায়স্থ-অধ্যুষিত সুসমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম। এখানেও একজন সম্পদশালী জমিদারের বাস। কাঞ্চনতলার জমিদার-বাড়িটিও বিরাট রাজপ্রাসাদের মতো। স্বনামধন্য জমিদার ভগবতীচরণ রায় মহাশয়কে আমি দেখি নি। দেখেছি শচীন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ রায়, জিতেন্দ্রনাথ রায়, সমরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি বংশধরদের। এই কাঞ্চনতলাতেই খ্যাতিমান্ গৃহীযোগী বরদাচরণ মজুমদারের বাস।

কাঞ্চনতলায় আমি কয়েকবার গেছি। একবার গিয়ে একজনের কাছে শুনলাম—সেখানে একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক বাস করেন, নাম কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস। তখনও কোনো ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ব্যক্তির সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয় নি।

অরঙ্গাবাদ বাজারে দেখেছি সাহেব খৃষ্টান, দিশী খৃষ্টান। তাঁরা খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে মাঝে মাঝে আমাদের গ্রামাঞ্চলে আসতেন। ব্রাহ্ম ভদ্রলোককে দেখবার জন্যে কৌতুহল হ'লো। স্থানীয় একজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে দেখতে গেলাম। তাঁর বাড়িতে ঢুকতেই দেখি—গৌরবর্ণ, সৌম্যকান্তি, আবক্ষলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু এক ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধ। দর্শন করা মাত্র আভূমিপ্রণতি নিবেদন করলাম তাঁকে। আমাকে তিনি সস্নেহে গ্রহণ করলেন। স্থানীয় বন্ধুটি আমার পরিচয় দিলেন তাঁর কাছে। দেবার মতো পরিচয় কী বা ছিল। পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি জানিয়ে দিলেন আমার গান গাইতে পারার কথা। গানের কথা শুনেই বৃদ্ধ আমাকে গান শোনানোর জন্যে উপরোধ করলেন।

আমি পূর্বে কোনো ব্রাহ্মকে না দেখলেও ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা ছিল। জানতাম—ব্রাহ্মরা নিরাকারবাদী, পৌত্তলিকতার বিরোধী। তাই তাঁকে কী গান শোনাবো ভাবছি—রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত একটিও জানা নেই। আমরা তখন সাধারণত শ্যামাসঙ্গীত, শ্যামসঙ্গীত—এই রকম গানই গেয়ে থাকি। আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বৃদ্ধ বললেন—'চুপ ক'রে ব'সে রইলে যে। গেয়ে ফেল একটা।'

ভাবতে ভাবতে দুটি গান আমার স্মৃতিতে জেগে উঠ্‌লো—দুটিই রামপ্রসাদের গান। প্রথমে গাইলাম—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে মিছে খাটি মাটি নিয়ে।
করে অসি মুণ্ডমালা,
শ্যামাটি কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিভাইয়ে।
মায়ের আছে তিনটি নয়ন—
চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন,
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে।
শুনেছি মার বরণ কালো,
সে-কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মতন হয় কি কালো মাটিতে রঙ্ মাখাইয়ে।
অশিবনাশিনী কালী,
সে কি মাটি খড় বিচালি,
কে ঘুচাবে মনের কালি প্রসাদে কালী দেখাইয়ে।

গান শেষ হতেই বৃদ্ধের যেন একটু চমক ভাঙলো। বললেন—'এ গান রামপ্রসাদের ? রামপ্রসাদের এ-রকম গান আরো আছে ? তুমি জানো ?'

এবারে আমি গাইলাম—

এমন দিন কি হবে মা তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে,
মনের আঁধার যাবে টুটে,
আমি ধরাতলে পড়বো লুটে তারা ব'লে হব সারা।
ঘুচে যাবে ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
তখন শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদে রটে,
মা বিরাজে সর্বঘটে,
আঁখি অন্ধ দ্যাখ্ রে মাকে, মা তিমিরে তিমিরহরা।

বৃদ্ধ ভাবতে পারেন নি, "তারা আমার নিরাকার" থাকতে পারে কোনো শ্যামাসঙ্গীতে। তিনি বার বার আমাকে বললেন, "তুমি যখনই এদিকে আসবে, আমাকে গান শুনিয়ে যেয়ো।"

বন্ধুটির কাছে শুনলাম, ইনি আকুমার ব্রহ্মচারী। কাঞ্চনতলাতেই থাকেন। বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোন না। আরও অনেক কথা শুনলাম তাঁর সম্বন্ধে। প্রথম দর্শনেই আমি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে এবং বৃদ্ধের কাছ থেকে আন্তরিক স্নেহসম্পদ নিয়ে ফিরে এলাম। স্বল্পকালের ব্যবধানে আবার গেলাম তাঁর স্নেহের আকর্ষণে।

৫১

কয়েক সপ্তাহ ধ'রে খবরের কাগজে আন্দোলন শুরু হয়েছে কায়স্থ ও বৈদ্য—এই দুই জাতির উচ্চনীচ পদমর্যাদা নিয়ে। আদমসুমারির খাতায় নাকি ব্রাহ্মণের পর বৈদ্য—তৃতীয় স্থান কায়স্থের। কলকাতার কায়স্থসমাজের শিরোমণি ব্যক্তিরা এ সরকারী শ্রেণীবিভাগে অপমানিত বোধ ক'রে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন গবর্নমেন্টের কাছে। গবর্নমেন্টের আমলারা বলেছেন—বৈদ্যজাতি কায়স্থের চেয়ে

উচ্চস্থানাধিকারী নানা কারণে: বৈদ্যের পৈতা আছে, কায়স্থের নেই, বৈদ্য মৃতাশৌচ পালন করে পনেরো দিন, কায়স্থের মৃতাশৌচ-পালন শূদ্রাচারে ত্রিশ দিনে। বেদে অধিকার আছে ব'লে জাতির নাম বৈদ্য। কায়স্থের পেশা দাসত্ব, চাকরি। বৈদ্য ভিষক্—চিকিৎসা তার বৃত্তি।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্র আঁতিপাতি ক'রে খুঁজে একশ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তি প্রমাণ করলেন—কায়স্থ শূদ্র নয়, ক্ষত্রিয়। যমরাজার দপ্তরের হিসেবনবিশ চিত্রগুপ্ত হচ্ছেন কায়স্থজাতির আদি পুরুষ। চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়, সুতরাং কায়স্থও ক্ষত্রিয়। অতএব বর্তমান কায়স্থজাতিকে সর্বতোভাবে ক্ষত্রিয়ে পরিণত করো। কায়স্থের উপনয়ন-সংস্কার হোক, এক মাসের পরিবর্তে মৃতাশৌচপালন হোক বারো দিনে।

এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়লো আমাদের জগতাই-নিমতিতায়। কলকাতা থেকে প্রচারক এলেন। জঙ্গিপুর-আদালতের প্রবীণ উকিল, বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের বরেণ্য ব্যক্তি কৃষ্ণবল্লভ রায়ের সভাপতিত্বে নিমতিতায় একটি মহতী সভার অধিবেশন হ'লো। এ অঞ্চলের প্রায় সকল কায়স্থসন্তানই উপস্থিত হয়ে সভার শোভাবর্ধন করলেন। কলকাতার প্রচারক মহাশয় শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত ক'রে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ ক'রে কায়স্থসন্তানদের স্বাজাত্যগৌরবে উদ্বুদ্ধ করলেন। খুব আশান্বিত হয়েই তিনি কলকাতায় ফিরলেন।

কিছুকাল পরে তিনি একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে আবার এলেন আমাদের গ্রামে। তাঁর কাছে শুনলাম—কাঞ্চনতলার জমিদারবাবুদের বাড়ির সকলেরই উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন ক'রে তিনি এখানে এসেছেন। আশা করছেন, এখানেও অনেকে উপবীত গ্রহণ করবেন। কিন্তু নানা অছিলায় গ্রামের দুটি বাড়ি ছাড়া কোনো বাড়ির কায়স্থসন্তানেরা উপবীতগ্রহণে রাজি হলেন না। রাজি হলেন কেদারনাথ মজুমদার আর আমার বাবা নিকুঞ্জবিহারী সরকার। যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান পালন ক'রে উপনয়ন সংস্কার হ'লো কেদারনাথ মজুমদার আর তাঁর দুই ছেলে যতীন্দ্রনাথ মজুমদার আর ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের এবং সেই সঙ্গে আমার বাবার ও আমার।

সমস্ত গ্রামময় হৈ হৈ প'ড়ে গেল।

এখন থেকে আমরা ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হলাম। আমাদের গলায় পৈতে, পদবীর শেষে বর্মা শব্দটি যুক্ত হ'লো। এখন থেকে ক্ষত্রিয়াচারে মৃতাশৌচ বারো দিন, তেরো দিনে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান।

ওদিকে বৈদ্যরাও হাত গুটিয়ে ব'সে নেই। তাঁদের কায়স্থের উচ্চস্তরে

থাকতে হবেই। কায়স্থ শূদ্রত্ব ঘুচিয়ে ক্ষত্রিয় হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের চেয়ে উচ্চাসন গ্রহণ করতে গেলে তাঁদের ব্রাহ্মণ হতে হয়। তাঁরাও শাস্ত্রসমূহ মন্থন ক'রে প্রমাণ করলেন তাঁরা ব্রাহ্মণ। জাতিতে তাঁরা বৈদ্য নন, পেশায় তাঁরা বৈদ্য। ব্রাহ্মণজাতিবাচক শর্মা পদবী তাঁরা জুড়ে দিলেন তাঁদের প্রচলিত পদবীর প্রান্তদেশে। তাঁরা এখন সেন শর্মা, গুপ্ত শর্মা ইত্যাদি। যাঁদের দাস পদবী ছিল, দাস-এর দন্ত্য স তুলে দিয়ে সেখানে বসালেন তালব্য শ। দাস হলেন দাশ। তার ফলে দাশ শর্মা, দাশগুপ্ত শর্মা ইত্যাদি। কায়স্থেরা বারো দিন অশৌচ পালন করেছেন, তাঁরা পনেরো থেকে কমিয়ে দশ দিনে অশৌচান্ত করবার সিদ্ধান্ত করলেন। ব্রাহ্মণের অশৌচান্ত দশ দিনে।

কায়স্থেরা বৈদ্যকে উচ্চস্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারলেন না।

কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির আকস্মিক অভ্যুত্থান দেখে অন্যান্য সমাজের কুলপতিরাও উচ্চশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার জন্যে সচেষ্ট হলেন। শূদ্র-পরিচয়ে কেহই সন্তুষ্ট নন। সব সমাজেই আলোড়ন দেখা দিল। ফলে বণিক জাতি বৈশ্য ব'লে নিজেদের ঘোষণা করলেন। আগুরি জাতি হ'লো উগ্রক্ষত্রিয়। কৈবর্ত হলেন মাহিষ্য। গোয়ালাজাতির নাম হ'লো যাদব। এইরকম অনেক জাতির মধ্যে এই আত্মোন্নতির প্রয়াস দেখা দিল।

আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্মানবোধও নতুন ক'রে জেগে উঠলো এঁদের মধ্যে। এই পরিবর্তনকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করলে লাঞ্ছিতও হতে হয়েছে অনেককে। কয়েক বছর পরে একদিন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমানিত হতে হয়েছিল, কয়েকজন মাহিষ্য যুবকের কাছ থেকে। তিনি নাকি তাঁর একখানি উপন্যাসে একটি মাহিষ্য চরিত্রকে কৈবর্ত জাতি ব'লে উল্লেখ করেছেন, এই তাঁর অপরাধ।

৫২

আমরা পৈতে গলায় ঝুলিয়েই কেবল কর্তব্যসম্পাদন করি না, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী-জপও করি।

এইভাবে দিন কেটে যায়। মাস ছয়েক পর বাবা মারা গেলেন। সমস্যা দেখা দিল বাবার পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান নিয়ে। কুল-পুরোহিত মশায় বললেন,

"তুমি পৈতে গলায় রাখতে পারো, কিন্তু তোমাকে এক মাস অশৌচপালন করতে হবে। তেরো দিনে তোমার বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।"

শুনেছিলাম কাঞ্চনতলার জমিদারবাবুরা উপবীতগ্রহণের পর একজন পুরোহিত কলকাতা থেকে আনিয়ে স্থায়ীভাবে তাঁদের বাড়িতে রেখেছেন। আমার অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে কাঞ্চনতলার জমিদার শচীন্দ্রনাথ রায়ের কাছে তাঁদের পুরোহিত প্রার্থনা ক'রে চিঠি দিলাম। শচীনবাবু জানালেন আমাকে নিশ্চিন্ত থাকবার জন্যে। পুরোহিত নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে উপস্থিত হবেন।

পুরোহিতের জন্যে দুশ্চিন্তা দূর হ'লো। মা বললেন—"পুরোহিত তো মিললো কিন্তু ব্রাহ্মণভোজনের কী হবে?"

মাকে বললাম—"ঐ পুরোহিত মশায়কে খাওয়ালেই তো ব্রাহ্মণভোজন হবে।"

মা তাতে রাজি নন। একজন ব্রাহ্মণসন্তানকে ভোজন করানো চাই পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্যে।

কোথায় পাবো ব্রাহ্মণ? আমাদের গ্রামের, কেবল ব্রাহ্মণ কেন, আত্মীয়-স্বজনদেরও ধারণা, একমাস অশৌচপালন না করলে আমাদের শুচিতা সম্ভব হবে না। শুদ্ধ হবো না আমরা। কায়স্থের তেরো দিনে অশৌচান্ত হয় না। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কেহই আমার বাড়িতে সেদিন জলগ্রহণ করবেন না।

এই ব্রাহ্মণভোজন-সমস্যার একটা সমাধান মনের মধ্যে জেগে উঠল। একখানা চিঠি দিলাম কাঞ্চনতলার সেই ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বৃদ্ধ কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস মহাশয়কে। লিখলাম—"অমুক তারিখে আমার পিতা স্বর্গত হয়েছেন। অমুক তারিখে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। এ-দিনে ব্রাহ্মণভোজন প্রয়োজন। আমাদের এ অঞ্চলে তথাকথিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞ আছেন কি না, আমি জানি না। আপনি যদি ঐ দিন আমার বাড়িতে এসে মধ্যাহ্নভোজন করেন, তাহ'লে আমার ব্রাহ্মণভোজনের সাধ পূর্ণ হয় এবং আমার পরলোকগত পিতার আত্মাও তৃপ্তিলাভ করে। ইতি

চিঠি উত্তর এলো—তিনি আসবেন।

দ্বাদশ দিনে কাঞ্চনতলায় পুরোহিত এলেন। ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। পুরোহিত মশায় যথাবিধি অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করলেন। গ্রামস্থ আত্মীয়স্বজন কেহই আসেন নি। এসেছেন কেবল সদ্য-উপবীতধারী কেদারনাথ মজুমদার, তাঁর ছেলেরা ও তাঁর বাড়ির মহিলারা।

সকালবেলাতেই এলেন কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস। মা তাঁর চেহারা দেখেই ভক্তিপূর্বক তাঁর পদস্পর্শ ক'রে প্রণাম নিবেদন করলেন। একটু আড়ালে আমাকে ডেকে নিয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন—"ইনি কে?"

আমি বললাম—"সদ্ ব্রাহ্মণ।"

মা খুশী হলেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হ'লো। কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস, পুরোহিত ও সপরিবার কেদারবাবু মধ্যাহ্নভোজন করলেন। আমি পিতৃদায় থেকে মুক্ত হলাম।

কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস মহাশয়কে উদ্দেশ ক'রে মাকে পরে বললাম—"মা ইনি ব্রাহ্মণ নন, ব্রাহ্ম। সাধু পুরুষ।"

মা ব্রাহ্ম সম্বন্ধে জানবার জন্যে বিশেষ কৌতূহলী হলেন না, সাধু পুরুষ শুনেই তিনি খুশী। তাঁর বিশ্বাস—সাধু পুরুষের ভোজ্যগ্রহণে ব্রাহ্মণভোজনেরই ফল হয়েছে।

পিতৃশ্রাদ্ধ তো চুকে গেল। কয়েকমাস পরে এল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। বাড়িতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি আছে। তারই পূজা হয় প্রতি বছরে কোজাগরী লক্ষ্মী-পূজার দিনে। মা বললেন, আমাদের পুরোহিত তো আসবেন না, কাঞ্চনতলার পুরোহিতকে খোঁজ ক'রে ত্যাখ্ না। খোঁজ ক'রে খবর পাওয়া গেল, কাঞ্চনতলার জমিদারবাড়িতে লক্ষ্মীপূজা। পুরোহিতের আসা অসম্ভব।

মা চিন্তিত হয়ে বললেন, "কী হবে তাহ'লে?"

মাকে বললাম—"ত্যাখো না কী হয়।"

ক্ষিতীনদের বাড়িতে দেখেছিলাম 'পুরোহিত দর্পণ' নামে একখানা বই। সেই বইএর মধ্যে পেলাম লক্ষ্মীপূজার বিধিব্যবস্থা। মাকে দেখালাম বইখানা। বললাম—"আমি তোমার লক্ষ্মীপূজা করবো।" আমার পৌরোহিত্য করবার খবর পেয়ে গ্রামের বন্ধুরা সব ছুটে এলো।

পূজা করলাম আমিই।

৫৪

ত বছর (১৯১০) মে মাসে পিতা সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর পঞ্চম জর্জ ংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যাভিষেকের আয়োজন 'লো ভারতের দিল্লী নগরীতে। সস্ত্রীক সম্রাট পঞ্চম জর্জ এলেন ভারতে। ৯১১ সনে ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে তাঁর দরবারের অধিবেশন। সারা দেশের জা-মহারাজা-রাজন্যবর্গ প্রভৃতির সমবেত শোভাবর্ধন ও সমারোহের মধ্যে

রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হ'লো দিল্লীতে। এই অনুষ্ঠানে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রহিত ক'রে লর্ড কর্জনের কলঙ্ক অপনোদন করলেন। বলা বাহুল্য, সম্রাটের এই ঘোষণায় দেশবাসী, বিশেষত বঙ্গবাসী, যথেষ্ট খুশী হলেন। খুশী হলেন দেশের রাজনৈতিক নেতারাও।

কিন্তু ভাঙা বাংলা আবার জোড়া লাগার শ্রুতিসুখকর সংবাদ থাকলেও ঐ ঘোষণার মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ বাঙালী-মানস বিক্ষুব্ধ ক'রে তুললো। ঘোষণায় তিনি বললেন কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করবার কথা।

পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের দিন পনেরো পরে, ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো কলকাতায়। বঙ্গভঙ্গরহিত করবার ঘোষণার জন্যে পুলকিত হয়ে কংগ্রেসনেতারা সম্রাট পঞ্চম জর্জকে অভিনন্দিত করতে প্রয়াসী হলেন। শোনা যায়, এই অভিনন্দন উপলক্ষে একটি গান রচনায় ভার পড়ে রবীন্দ্রনাথের উপরে। কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে যে-গান তিনি রচনা ক'রে দিলেন, সে-গানের মধ্যে প্রথম স্তবকে 'ভারতভাগ্যবিধাতা' থাকলেও তৃতীয় স্তবকটি বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে লেখা, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবু এক শ্রেণীর সমালোচক পরবর্তী কালে গানটিকে পঞ্চম জর্জের অভিনন্দন-গীতি ব'লে সমালোচনা করেন। সে-সমালোচনার দূষিত আবহ এখনও লুপ্ত হয় নি। সেবারের কংগ্রেসে পঞ্চম জর্জের প্রশস্তিগান রচনা ক'রে দিয়েছিলেন রামভুজ দত্ত চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ নন। রামভুজ দত্ত চৌধুরীর গানটি হিন্দুস্থানী ভাষায় লেখা। প্রথম চরণ—'যুগ জীব্ মেরা পাদশা চঁহু দিশ্ রাজ সবায়া।'

১৯১২ সনের মার্চ মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লাট হয়ে এলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গকে একসঙ্গে জুড়ে দিলেন। রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হ'লো দিল্লী শহরে।

কিন্তু ২৩শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন মহা সমারোহ ক'রে বিরাট শোভা-যাত্রার অগ্রভাগে হাতীর উপর চ'ড়ে নতুন রাজধানী দিল্লীতে পথ-পরিক্রমা করছিলেন, তখন সকলের অগোচরে অনতিদূর থেকে একটি নিক্ষিপ্ত বোমা পড়লো তাঁর উপরে। আহত হ'লেন তিনি।

আবার বোমা! আমরা মনে করেছিলাম, আলিপুর বোমার মামলায় কয়লালা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বোমার আওয়াজ বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল। এবারের

বোমা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ির উপরে নয়—খোদ বড়লাটের হাতীর হাওদার উপর। সারা দেশ স্তম্ভিত। পুলিস খুঁজে খুঁজে অপরাধীদের বের করলো। খাড়া হ'লো দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা। বিচারে ফাঁসি হ'লো দুজনের, কারাদণ্ড হ'লো কয়েকজনের। কিন্তু বিপ্লবী দলের যিনি অধিনায়ক, কিছুতেই পুলিস তাঁর সন্ধান পেলে না। দেশব্যাপী এই অনুসন্ধানের কালেই শোনা গেল—দলের নায়ক রাসবিহারী বসু পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আরাম উপভোগ করছেন জাপানের টোকিও শহরে।

৫৫

১৯১৩ সনের বর্ষাকালে খবরের কাগজে বর্ধমানে বন্যার দারুণ দুঃসংবাদ বেরোলো। দামোদর নদের প্রলয়ঙ্কর বন্যা। বন্যার সে-রকম প্রকোপ বর্ধমান অঞ্চলের লোকেরা কখনও দেখে নি। খবরের কাগজেই পড়ি, বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে বর্ধমান অঞ্চলে অহোরাত্র সেবাকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই সময় পূজোর ছুটিতে এলো ফণী। ফণী আমাদের জগতাই গ্রামের ছেলে—পুরো নাম ফণিভূষণ চৌধুরী, বহরমপুর কলেজে পড়ে। ফণী এসেই আমাকে বললো, "আপনারা বর্ধমানের বন্যার জন্যে কিছু করছেন?"

"কী আর ক'রবো ফণী। খবরের কাগজে যা পড়েছি, ভীষণ অবস্থা। এখান থেকে কতটুকুই বা সাহায্য করা যায়?"

ফণী বললে, "আপনাদের কল্যাণী সমিতি থেকে কিছু কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল সংগ্রহ ক'রে পাঠান না?"

ফণী জানে, আমরা এখানে কল্যাণী সমিতি নামে একটা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন স্থানীয় মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাধাশ্যাম সিংহ। রাধাশ্যাম সিংহ স্কুলের কাজ ছেড়ে ভাগলপুরে ওকালতি করতে যাবার পর থেকে অনেকেরই উৎসাহ ক'মে যায়। আমিও দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম। ফলে কল্যাণী সমিতির কাজকর্ম এখন প্রায় বন্ধ। অবশ্য, কাজও এমন কিছু দুঃসাধ্য নয়। গ্রামের প্রতি বাড়িতে একটি ক'রে মাটির কলসী জাতীয় পাত্র রেখে আসা, সেই পাত্রে বাড়ির গৃহিণীরা একমুঠো ক'রে চাল রান্নার সময় রেখে দেন, সপ্তাহান্তে সেই চাল সংগ্রহ ক'রে আনা। তাও নিয়মিত হয়ে উঠতো না। এখন আমি সেরে উঠেছি অবশ্য।

কর্মক্ষমও আগের মতোই। কিন্তু আর কল্যাণী সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় নি।

ফণীর সঙ্গে এই সব আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু সে এসেছে আমার কাছ থেকে একটা প্রত্যাশা নিয়ে। ফণীকে বললাম, "একটু ভেবে দেখি, কী করা যায়? কাল একবার এসো।"

পরদিন ফণী এলো। ফণীকে বললাম—"মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। ভিখিরীর মতো ভিক্ষা করতে পারবে?"

ফণী একটু হাসলো। বললো, "শুনিই না আইডিয়াটা।"

বললাম—"চার-পাঁচটি গান লিখি। বিষয়—বর্ধমানের বন্যা। সাধারণ ভাষা, সাধারণ বাউলের সুর। চলো, আমরা দু'জনে এই গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহ করি।"

ফণী রাজি হ'লো। আমি গান লিখতে বসলাম। চারটি গান লিখলাম। ফণী এলো। গান চারটি গেয়ে তাকে শোনালাম। ফণী খুশী হ'লো। একটি গানের গোড়ার দিককার ক'টি চরণ এইরূপ—

তোরা দ্যাখ্ রে বারেক চেয়ে—
কাদাভরা মাঠের মাঝে
কাঁদে ছেলেমেয়ে।
আছিস তোরা দুধে ভাতে,
তারা খালি পেটে দিন ও রাতে
উপোস ক'রে ব'সে আছে
দেহখানা নিয়ে;—
নাইকো ধন নাইকো ধান,
সব খেয়েছে দারুণ বান,
প্রাণটুকু যা আছে ধড়ে
তাও যেতে চায় ধুয়ে।
দ্যাখ্ রে বারেক চেয়ে॥

বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। দু'জনেরই পরনে ধুতি, গায়ে গেঞ্জি, তার উপর চাদর, পায়ে চটিজুতো। সঙ্গে একটি বাদ্যযন্ত্রও নিলাম—খঞ্জনি। স্থান-কাল-পাত্র বুঝে খঞ্জনি বাজিয়ে গানগুলি গাইবো—সর্বত্র নয়। আগে চাওয়া। চেয়ে না পেলে গাওয়া। খঞ্জনিটি থাকতো আমার বগলে, চাদরে ঢাকা।

স্থির হ'লো প্রথমে যাবো পাকুড় রাজবাড়ি। তখন সবে ধুলিয়ান গ্যাঞ্জেস থেকে বারহারোয়া রেল লাইন খুলেছে। আমরা ধুলিয়ান থেকে বারহারোয়া হয়ে পাকুড় গেলাম। সরাসরি গিয়ে উঠলাম রাজবাড়িতে। একজন উচ্চপদস্থ অমাত্যের সঙ্গে দেখা ক'রে আমাদের প্রার্থনা জানালাম। টাকাকড়ির ব্যাপার, আমাদের কোনো পরিচয়-পত্র নেই, উদ্দেশ্য সাধু কিম্বা অসাধু—তারও কোনো প্রামাণিক দলিল নেই, লোকে টাকাপয়সা দেবে কেন, আগে এ-সব প্রশ্ন মনে জাগে নি। জাগলো পাকুড়ে। পাকুড়ের রাজ-অমাত্য আমাদের হতাশ করলেন। ভদ্রভাবে বললেন—"আমরা বাংলার গবর্ণরের ফাণ্ডে এক হাজার টাকা দিয়েছি। আর দেওয়া সম্ভব নয়।"

দুজনে মুখ চুন ক'রে রাজবাড়ি থেকে ফিরলাম। প্রথম পদক্ষেপেই নিষ্ফল হলাম বটে কিন্তু নিরুৎসাহ হলাম না।

রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ গিয়েই দেখলাম দাতব্য ঔষধালয়। সেখানে ঢুকলাম। দেখি, বসে আছেন একজন ভদ্রলোক, বোধ হয় কম্পাউণ্ডার। ভদ্রলোক আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন—"কোত্থেকে আসছেন?"

বললাম, "আমরা বর্ধমানের বন্যায় দুর্গতদের জন্যে অর্থসংগ্রহে বেরিয়েছি, আপনি অনুগ্রহ ক'রে যদি কিছু দেন।"

গায়ের চাদর হয়তো কাঁধ থেকে স'রে গিয়ে থাকবে, ভদ্রলোক খঞ্জনিটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বললেন—"ওটি কী?"

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম—"ওটি খঞ্জনি।"

"খঞ্জনি! আপনি কি গানও করেন?"

"করি। কেউ যদি গান শুনতে চায়, শোনাই।"

ভদ্রলোক বেশ আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "তাহলে শোনান না আমাদের।"

এর মধ্যে দু'একজন ভদ্রলোক, দুটি-একটি দুস্থ মেয়ে শিশি হাতে হাজির হয়েছে ডিস্‌পেনসারিতে।

গান আরম্ভ করলাম। পর পর চারটি গানই গাইলাম খঞ্জনি বাজিয়ে। গান শুনে পথ-চলতি দু'চারজন লোকও এসেছে।

গান শেষ হ'লো। শ্রোতারা প্রত্যেকই কিছু কিছু দিলেন, দুটি টাকা দিলেন কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোকটি। চার-পাঁচটি টাকা মিললো ঐ ডিস্‌পেনসারি থেকে। যারা ওষুধ নিতে এসেছিল, তাদের ওষুধপত্র দিয়ে বিদায় করলেন কম্পাউণ্ডার। কর্তব্যকর্ম সমাপনের পর তিনি আমাদের সৎপরামর্শ দিলেন, পাকুড়ের কোন্ কোন্ বাড়িতে গেলে সাহায্য মিলতে পারে। এইসব কথা

হচ্ছে, এমন সময় একটি বর্ষীয়সী মেয়ে এসে আমাকে বললেন, "বাবু, আপনাদের একবারটি রাজবাড়িতে যেতে হবে।"

আমি বললাম, "আমরা প্রথমেই রাজবাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে এখানে এসেছি।"

মেয়েটি বললেন. "রাণীমায়েরা আপনাদের গান শুনতে চান। আমি শুনে গিয়ে তাঁদের বলতে, তাঁরা আমাকে পাঠালেন আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে। আমি রাজবাড়ির ঝি।"

চিন্তায় পড়লাম। রাণীমায়েদের গান শোনাতে কোথায় যাবো। অন্তঃপুরে? রাজ-অমাত্যেরা এবারে হয়তো অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেবেন। যাবো কি যাবো না ইতস্তত করছি। কম্পাউণ্ডারই সাহস দিয়ে বললেন, "যান, যান, রাণীমায়েরা হয়তো কিছু দিতেও পারেন।"

গেলাম আবার রাজবাড়িতে। ভালো ব্যবহারই পেলাম। একজন অমাত্য বললেন, "আপনারা গানও গেয়ে থাকেন? আপনাদের গানের জন্যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে।" ঝিকে বললেন, "এঁদের নিয়ে যাও।"

সদর আর অন্দর—দুইএর মধ্যবর্তী এক জায়গায় একটি কম্বল পাতা। ঝি বললো—"এইখানে আপনারা বসুন।"

ব'লে ভিতরে চ'লে গেল ঝি। অল্পক্ষণ পরেই দেখি, অন্তঃপুরিকারা অন্দর-বাড়ির দোতলায় খোলা জানালার সমুখে দাঁড়িয়েছেন। দূরত্ব খুব বেশি নয়।

ঝি ফিরে এল আমাদের কাছে। বললে, "রাণীমায়েরা সব এসেছেন। এবারে গান করুন আপনারা।"

ঝি দাঁড়িয়েই রইলো। আমি একে একে চারটি গান গাইলাম। আমাদের সঙ্গে একখানি খাতা থাকতো। যাঁরা এক টাকা বা তার বেশি সাহায্য করেন, তাঁদের নাম আর ঠিকানা লিখে রাখি খাতায়। সেই খাতাখানি ঝিকে দিয়ে বললাম—"এটি রাণীমায়েদের দাও গে।"

মিনিট পাঁচেক পরে ঝি ফিরে এসে খাতাখানি আমার হাতে দিয়ে বেশ গর্বভরে বললো, "ওর মধ্যে টাকা আছে।"

খুলে দেখি, খাতার ভিতরে পাঁচখানা দশ টাকার নোট!

বেশ বুঝতে পারলাম—গানই আমাদের পরিচয়-পত্র।

পাকুড়-পর্ব শেষ ক'রে আমরা বাড়িতে ফিরে এসে দু'তিন দিন পরে আবার বেরোলাম। এবারে গেলাম হিলোড়া গ্রামে। হিলোড়া জগভাই-নিয়ন্ত্রিত

থেকে দশ-বারো মাইল পথ। রাঢ়দেশ, বহু সমৃদ্ধ জোতদারের বাস। জঙ্গীপুর স্কুলের ছাত্র, আমার বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ি হিলোড়ায়। বন্ধুর বাসভূমি ব'লেই হিলোড়ায় যাওয়া। হিলোড়ার দেবার মতো পরিচয় আরও একটি আছে : বর্তমান চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতিমান পরিচালক তপন সিংহের বাড়ি এই হিলোড়ায়। যদিও তপন সিংহ সে-সময় জন্মগ্রহণ করেন নি।

হিলোড়ায় সর্বপ্রকারে সাফল্য লাভ ক'রে এলাম জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জে। সেখান থেকে স্টীমারে আমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন প্রতি বৎসরে কয়েক মাস ভাগীরথীতে হোরমিলার কোম্পানীর স্টীমার চলতো—জিয়াগঞ্জ থেকে ধুলিয়ান পর্যন্ত। আমাদের নিকটবর্তী স্টেশন ছিল অরঙ্গাবাদ ঘাট।

জঙ্গীপুরে উঠে স্টীমারের দোতলার পাটাতনে একটা সুবিধামতো জায়গায় ব'সে গায়ের চাদরখানি সামনে বিছিয়ে দিয়ে বন্যার গানগুলি গাইতে আরম্ভ করলাম। স্টীমারের অনেক আরোহী চতুর্দিক ঘিরে ফেললো। কেউ কেউ সিকি, দুয়ানি, আধুলি এমন কি টাকাও ছুঁড়ে দিলেন চাদরের উপর।

গান গাইতে গাইতে একবার একটু বিশ্রাম নিয়েছি, যাত্রীদের ভিতর থেকে একজন আমাকে প্রশ্ন করলেন—"আপনার নাম কি? কোথায় বাড়ি?"

উত্তর শুনে ভদ্রলোক বললেন—"আপনি গ্রামোফোনে গান দেবেন?"

আমি তো বিস্ময়বিমূঢ়। গ্রামোফোনে আমার গান! এ যে স্বপ্নেও ভাবি নি কখনো। বললাম—"আপনি কি গ্রামোফোন কোম্পানির লোক?"

ভদ্রলোক বললেন—"আমার নাম মণীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি গ্রামোফোন কোম্পানির কাটোয়ার এজেন্ট। আর্টিস্টও সংগ্রহ ক'রে থাকি। আপনি যদি গ্রামোফোনে গান দিতে চান, আমি ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।"

"আমার গান চলবে?"

"চলবার মতো মনে না করলে আপনার কাছে এ প্রস্তাব ক'রবো কেন?"

কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, "আমার রিপোর্ট পেলে কোম্পানি আপনাকে ডেকে পাঠাবে। যাবেন যেন।"

স্টীমার এসে পৌঁছলো অরঙ্গাবাদ স্টেশনে। ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে নেমে পড়লাম, তিনি গেলেন ধুলিয়ানে।

বাড়ি এসে বন্ধুদের কাছে সগর্বে বললাম আমার গ্রামোফোনে গান দেবার কথা। বন্ধুরা খুশী হ'লো।

অপেক্ষায় রইলাম গ্রামোফোন কোম্পানির চিঠির জন্যে। মাসের পর মাস চ'লে যায় কিন্তু চিঠি আসে না। প্রায় পাঁচ ছয় মাস অপেক্ষা ক'রে যখন চিঠির

আশা ছেড়ে দিয়েছি, তখন একদিন এলো গ্রামোফোন-যন্ত্রের সামনে বসা কুকুরের ছবি ছাপা একখানি খাম। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে এসেছে। তার মধ্যে ইংরাজিতে টাইপ-করা চিঠি। চিঠিতে লেখা—"আমাদের প্রতিনিধি মিঃ এম চ্যাটার্জির সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে তোমার ভয়েস রেকর্ড করার জন্যে। এজন্যে তুমি যদি এত নম্বর আপার চিৎপুর রোডে আমাদের রিহার্সাল-বাড়ি বিষ্ণু ভবনে অমুক তারিখে সকাল দশটা নাগাদ সাক্ষাৎ করো, তাহ'লে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা হ'তে পারে।"

এবারে আনন্দ আরো বেশি। চিঠিতে লেখা দিনক্ষণ অনুযায়ী বিষ্ণু ভবনে গিয়ে হাজির হলাম সসঙ্কোচে। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক—নাম ভগবতী ভট্টাচার্য —তখন সেখানকার কর্মকর্তা। ভগবতীবাবু আমাকে সস্নেহে গ্রহণ ক'রে একটি ঘরে অপেক্ষা করতে বললেন। ঘরে ঢুকে দেখি, চার-পাঁচ জন ভদ্রলোক সেখানে এক একখানি চেয়ারে ব'সে। আমিও একখানি চেয়ার দখল করলাম। যাঁরা ব'সে ছিলেন তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হ'লো, তাঁরা সকলেই আমার মতন নবাগত আর্টিস্ট। শুনলাম—আজ আমাদের ভয়েস পরীক্ষার দিন। এই পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হবেন, কেবলমাত্র তাঁদেরই গান রেকর্ড করা হবে। খবরটা পেয়ে মাথা ঘুরে গেল। যদি ফেল হয়ে যাই। আসবার সময় দেশে বন্ধুদের কাছে বড়াই ক'রে ব'লে এসেছি, কলকাতায় গান রেকর্ড করতে যাচ্ছি। ফেল করলে তাদের কাছে গিয়ে মুখ দেখাবো কী ক'রে?

আমরা ছিলাম মোট ছ'জন। অল্পক্ষণ পরেই একজনের ডাক পড়লো। তিনি গেলেন এবং মিনিট দশেক পর ফিরে এলেন। এমনি একে একে আমরা গেলাম এবং ফিরে এলাম। পরে ডাক পড়লো একজনের। তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাড়ি কাটোয়ার কাছে একটি পল্লীগ্রামে। তিনি ফিরে এলেন না। এবারে আমার ডাক পড়লো। আবার গেলাম। গিয়ে শুনলাম—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে দুজন: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর আমি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

ভগবতীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কী ধরনের গান গেয়ে থাকেন? যে-গানটি শুনিয়েছেন, সেটি তো রজনী সেনের লেখা। অন্য কোনো স্টাইলের গান জানেন?"

বললাম—"কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী, প্রাচীন কবিদের গান, হাসির গান—এই সব গানই গেয়ে থাকি।"

মহা উৎসাহে তিনি বললেন—"হাসির গান গাইতে পারেন? শোনান দেখি, দুটি একটি।"

পর পর ছুটি হাসির গান গাইলাম। ভগবতীবাবু বললেন—"থামলেন কেন, যদি আরও জানা থাকে, শোনান না।"

পর পর ছটি গান গাইলাম। ভগবতীবাবু বললেন,—"আমরা আপনার এই ছটি গানই রেকর্ড ক'রবো।"

রেকর্ডিং-এর দিনও ঠিক হ'লো। কথা হ'লো, আমি সেদিন সকালে দশটার সময় এখানে আসবো। এখান থেকেই এঁদের সঙ্গে রেকর্ড করতে যাবো।

ঠিক দিনটিতে এসে এঁদের গাড়িতে রওনা হলাম রেকর্ডিং-এর জন্যে। রেকর্ডিং-এর প্রতিষ্ঠান তখন বেলেঘাটায়। সেখানে গিয়ে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'লো, নাম অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজে থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনিও গ্রামোফোন কোম্পানির হাসির গানের গায়ক। আরেকজন গায়কের হাসির গান রেকর্ড হবে শুনে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। আলাপ হ'লো। ভালো লোক।

ডাক পড়লো রেকর্ডিং-এর জন্যে। গেলাম স্টুডিয়োয়। দেখি, একটা বেশ বড় টেবিলের মাঝখানে একটি হারমোনিয়াম আর একপাশে তবলা-বাঁয়া। সম্মুখে একটা কালো রঙের কাপড়ের পর্দা। পর্দার গা থেকে দুটো বড় বড় টিনের চোঙা বেরিয়ে এসেছে। একটি চোঙা হারমোনিয়ামের কাছে, আরেকটি তবলা-বাঁয়ার সম্মুখে। রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশমতো আমি হারমোনিয়ামের কাছে গিয়ে বসলাম। ইঞ্জিনিয়ার আমার মুখ আর ঐ চোঙার মুখ তাঁদের হিসেবমতো ঠিকভাবে রেখে তবলা-বাঁয়ার স্থানও ঐভাবে ঠিক ক'রে দিলেন। যিনি বিষ্ণু ভবনে আমার গানের পরীক্ষা নিয়েছিলেন, এখানে দেখি তিনি তবলা-বাঁয়া নিয়ে বসেছেন। শুনলাম—তাঁর নাম মোন্তা।

রেকর্ডিং আরম্ভ হবার আগে, দু'একবার পরীক্ষামূলক ভাবে একটি গানের দু' এক কলি গাইতে হ'লো।

প্রতিটি গান গাইবার নির্দিষ্ট সময় মাত্র তিন মিনিট। তিন মিনিটের মধ্যে গান শেষ করবার রিহার্সাল দিয়ে এসেছি বিষ্ণু ভবনে। সবই ঠিক ছিল। একটি সমস্যা দেখা দিল নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাওয়ার ব্যাপারে। কোলের উপর হারমোনিয়াম আর চোঙার সামনে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে গান গাইতে হবে। মুখ নীচু ক'রে হারমোনিয়ামের দিকে চাইতে গেলে চোঙা থেকে গান ফসকে যাবে। আগে এটা জানা থাকলে সেইভাবে প্র্যাকটিস ক'রে আসতাম কিংবা অন্য কারও দ্বারা হারমোনিয়ামে সঙ্গত করিয়ে রিহার্সাল দিয়ে প্রস্তুত হতাম। কিন্তু কোনোটাই হয় নি। একটু অসুবিধা হ'লো বৈ কি। অগত্যা

নিজে বাজিয়েই গাইতে হ'লো। দুটি একটি গানে গোলমাল হয়ে যাওয়ায়, একই গান দু'বার রেকর্ড ক'রতে হ'লো। যাই হোক, এই সব ফাঁড়া কাটিয়ে ছ'টি গানই রেকর্ড করলাম।

ইঞ্জিনীয়ারবাবু বাইরে এসে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"ভালো হয়েছে আপনার গান।"

৫৬

বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পরে জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী একদিন আমাকে বললেন—"ওহে, আমাদের কাছে তোমার বাবার কিছু দেনা আছে, জানো ?"

"শুনেছি।"

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কত টাকা দেনা, জানা আছে ?"

আমি বললাম, "তা জানি না।"

"শ্রীশকে ডাকো।"

শ্রীশচন্দ্র সরকার আমার বন্ধু। জমিদারদের মহাফেজখানার কর্মচারী।

শ্রীশচন্দ্র এলে, আমার দেনার হিসেব দাখিল করবার জন্যে মহেন্দ্রবাবু তাঁকে নির্দেশ দিলেন। আমাকে বললেন, "কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।"

পরের দিন গেলাম। মহেন্দ্রবাবু জানালেন, বাবা আমাদের দিয়াড়ার ত্রিশ বিঘা জমি বন্ধক রেখে তাঁদের কাছে থেকে পাঁচশো টাকা কর্জ নিয়েছিলেন। তমসুক অনুযায়ী সুদে আসলে সেই দেনার পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে এগারোশো টাকা।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, "টাকাটা কিভাবে দেবে ?"

আমি বললাম—"আপনি তো আমার অবস্থার কথা সবই জানেন। কিভাবে দেওয়া সম্ভব, আপনিই বলে দিন।"

মহেন্দ্রবাবু বললেন, "শ্রীশ কালই আমাকে তোমার দেনার হিসেব দিয়েছিল। আমি ভেবেচিন্তে একটা সিদ্ধান্তে এসেছি : যাতে তোমার অসুবিধে না হয়, তাই ঠিক করেছি। তুমি দেনার আসল ঐ পাঁচশো টাকাই দাও, সুদের দরুন ছশো টাকা তোমাকে দিতে হবে না। আর ঐ পাঁচশো টাকা দেবারও একটা ব্যবস্থা করেছি। মনে হয়, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।"

আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছি। আমার দিকে চেয়ে বললেন—"তোমার তো দোফসলা জমি। বছরে দু'বার ফসল পাও,—বৈশাখ মাসে চৈতালি, আর আশ্বিন মাসে ভাদুই ধান। আমি বলি—তুমি ঐ পাঁচশো টাকা দশ বছরে

শোধ করো। প্রতি বছরে পঞ্চাশ টাকা। চৈতালি ফসলের সময় বৈশাখ মাসে দাও পঁচিশ টাকা আর আশ্বিনে ধানের সময় পঁচিশ টাকা। দু'বারে পঞ্চাশ টাকা। এতে মনে হয়, তোমার অসুবিধে হবে না। কি বলো?"

আমি অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে। কী আর ব'লবো। নীরবে প্রণাম ক'রে চ'লে এলাম।

প্রথম বছরে এবং দ্বিতীয় বছরে যথাক্রমে প্রতি কিস্তি পঁচিশ টাকা হারে চার কিস্তিতে একশো টাকা শ্রীশদার কাছে জমা দিয়ে এসেছি। তৃতীয় বছরে দুটি কিস্তির একটিরও টাকা দেওয়া সম্ভব হ'ল না। শ্রীশদা তাগাদা দিয়ে বললেন—"এটা ভালো করলে না ভাই। যে-কোনো রকমে সংগ্রহ ক'রে টাকাটা দেওয়া উচিত ছিল। কিস্তি খেলাপ করাটা অন্যায় হয়েছে।"

শ্রীশদা আমার হিতৈষী বন্ধু। কিস্তি খেলাপের কথা তিনি মহেন্দ্রবাবুর গোচরে আনেন নি।

পরের বছর।

আমাদের অঞ্চলে চাষের জমিতে রবিশস্য ও ধান ছাড়া আরো একটি ফসল পাওয়া যেতো। সেটা ভূমিজাত নয়—বৃক্ষজাত। জমিতে কুলগাছ থাকলে সেই কুলগাছের ডাল থেকে পাওয়া যেত লাহা। লাক্ষাকে আমরা বলি লাহা। সময়ে সময়ে লাহার দরও বেশ ভালো দেখা দিত। এই দেনাশোধের চতুর্থ বৎসরে আমি লাহা থেকে বেশকিছু টাকা পেলাম। হিসেব ক'রে দেখলাম—আমার এই লাহার আয় থেকে অনায়াসেই দুশো টাকা দেনাশোধের জন্য খরচ করা যায়।

দুশো টাকা নিয়ে গেলাম জমিদার-বাড়িতে। মহেন্দ্রবাবু বাড়ির বারান্দায় আরাম-কেদারায় ব'সে আছেন। সকালবেলা। তখনও তাঁদের কাছারির কাজকর্ম আরম্ভ হয় নি। আমি গিয়েই প্রণাম করলাম মহেন্দ্রবাবুকে। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—"কী ব্যাপার?"

আমি বললাম—"লাহা বেচে কিছু টাকা পেয়েছিলাম, তাই দেনার খাতে জমা দিতে এনেছি।"

"কত টাকা?"

বললাম—"দুশো।"

মহেন্দ্রবাবু খুশি হয়ে বললেন—"বেশ, বেশ।" ব'লে বললেন—"শ্রীশ বোধ হয় এসেছে, ওর কাছে জমা দিয়ে এসো।"

আমি দাঁড়িয়েই আছি।

আমার দিকে চেয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন—"কিছু বলবে?"

আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বললাম—"এই দুশো টাকা নিয়ে আপনি আমাকে দেনা থেকে রেহাই দিন।"

মহেন্দ্রবাবু বললেন—"তোমার পাঁচশো টাকা দেবার কথা না?"

"হ্যাঁ।"

"এ পর্যন্ত কত দিয়েছো?"

"একশো।"

মহেন্দ্রবাবু বললেন—"মাত্র একশো? আর, আজ এনেছো দুশো। মোট তিনশো টাকায় পাঁচশো টাকা পরিশোধ! আসল টাকা থেকেও দুশো টাকা কম!"

ব'লে ঈষৎ হাসলেন। বললেন—"ছাখো, শ্রীশ এসেছে কি না। যদি এসে থাকে, তোমার বাবার তমস্থকখানা নিয়ে আসতে বলো।"

দপ্তরখানায় গিয়ে দেখলাম—শ্রীশদা এসেছেন। শ্রীশদা কাগজপত্র খুঁজে দলিলখানা বের করলেন। দু'জনেই এলাম মহেন্দ্রবাবুর কাছে। মহেন্দ্রবাবু দলিলখানায় দেখলেন—মূল দেনা পাঁচশো, সেই পাতার উল্টোদিকে চার কিস্তিতে একশো টাকা উস্থল দেওয়া আছে। শ্রীশ দাদাকে বললেন—"নলিনী দুশো টাকা এনেছে। ওটা নাও।"

শ্রীশদা আমার দিকে চাইতেই আমি টাকাটা তাঁকে দিলাম।

মহেন্দ্রবাবু শ্রীশদাকে বললেন—"নলিনী বলে কি জানো?—তিনশো টাকা নিয়ে তাকে পাঁচশো টাকার দেনার দায় থেকে মুক্তি দিতে হবে। আবদারট ছাখো।"

মহেন্দ্রবাবুর বলার ভঙ্গী দেখে শ্রীশদার স্মিত হাসি। আমি চিন্তিত।

এবারে মহেন্দ্রবাবু প্রসন্নমুখে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"তিনশো টাকাতেই তোমাকে মুক্তি দিলাম। এই নাও তোমার দলিল।"

ব'লে তিনি আমাকে সেই রেহানি তমস্থকখানা ফিরিয়ে দিলেন। আমি দলিলখানা নিয়ে মহেন্দ্রবাবুকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম।

কিছুদূর এসেছি। পিছনে থেকে শ্রীশদার চীৎকার—"এই, নলিনী, শোনো শোনো!"

কাছে আসতেই শ্রীশদা বললেন—"মহেন্দ্রবাবু তোমাকে ডাকছেন।"

কাছে আসতেই মহেন্দ্রবাবু বললেন—"দলিলখানা নিয়ে চ'লে তো যাচ্ছ। এর পর তুমি বিপদে পড়বে, তোমার জেলও হ'তে পারে। আমি থানায় খবর দিচ্ছি—অমুক নম্বরের দলিলখানা আমাদের দপ্তর থেকে চুরি গেছে। তোমার বাড়ি খানাতল্লাস ক'রে পুলিস চোরাই মাল বের করবে। তোমার হাতে হাতকড়ি পড়বে। শেষ পর্যন্ত জেল হবে তোমার। দলিল দাও আমাকে।"

আমি বিস্মিত। দলিলখানা দিয়ে চ'লে আসছি, তিনি বললেন—"একটু অপেক্ষা করো।"

শ্রীশদাকে বললেন—"দোয়াত কলম আনো তো।"

দোয়াত কলম এলো। তিনি দলিলখানার প্রতি পৃষ্ঠার উল্টো পিঠে কী যেন লিখলেন। লেখা শেষ ক'রে দলিলখানা আমার হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"এবারে যাও।"

আবার দলিল নিয়ে রওনা হলাম। দেখি, শ্রীশদা পিছন পিছন আসছেন। আমার কাছে এসে বললেন—"দেখি দলিলখানা। কী লিখলেন?"

দেখা গেল—প্রতি পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ঋণের দরুন পুরো প্রাপ্য টাকা পাইয়া এই দলিল দলিলদাতাকে ফেরত দিলাম। শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। তারিখ…।

৫৭

কয়েক বছর পরে আবার অসুখে পড়লাম। সেবারে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে একজন সন্ন্যাসী আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। এবারে তেমন দুরারোগ্য ব্যাধি না হলেও দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছি। মা বিশেষ চিন্তিত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলছে। ডাক্তার ভরসা দিয়েছেন—সেরে যাবে। ওষুধ ফুরোলে নিজেই যাই চিকিৎসকের কাছে।

একদিন বেলা নটা নাগাদ ডাক্তারের কাছে যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি, বেরোবার মুখে সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেই সন্ন্যাসী। চমকে উঠলাম, এ কি স্বপ্ন!

"ক্যা বাচ্চা, ফিন বেমার হুয়া?"—সন্ন্যাসী বললেন।

সন্ন্যাসীকে প্রণাম ক'রে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এলাম। মা তাঁকে দেখে যেন স্বর্গ হাতে পেলেন। গলায় আঁচল জড়িয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলেন।

মায়ের পরনে থান কাপড় দেখে সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন, মা বিধবা হয়েছেন। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মায়ের দিকে। পরে তাঁর ঝুলির ভিতর থেকে চালের মতো দুটি বস্তু বের ক'রে তার একটি আমাকে খাইয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় চালটি আমার হাতে দিয়ে তাঁর ভাষায় বললেন—"এটি যত্ন ক'রে রেখে দাও। অমুক মাসের অমুক তিথিতে এটি খাবে। দেখবে, সারাজীবনে কোনো অসুখ হবে না।" আমার ঠিক মনে নেই। কোজাগরী পূর্ণিমা কিংবা রাসপূর্ণিমার দিন চালটি খেতে ব'লেছিলেন।

সাধু ওঠবার উপক্রম করতেই মা তাঁকে অনুরোধ করলেন সে-দিনটা থেকে যাবার জন্যে। সনির্বন্ধ অনুরোধেও তিনি রাজি হলেন না।

বলা বাহুল্য, আমি সেরে উঠলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা—দ্বিতীয় চালটি হারিয়ে গেল। সাধুর আদেশমতো নির্দিষ্ট দিনটিতে সেই চালটি খুঁজে পেলাম না!

আমি সেরে উঠ্‌লাম বটে কিন্তু মাসখানেক পরে মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমাদের গ্রামের দু'একটি বাড়িতে বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছিল। একদিন দারুণ জ্বরের পরে মায়ের দেহে দেখা গেল বসন্তরোগের গুটি। জাত বসন্ত—মসুরিকা। স্বল্প পক্ষ। মাসীমা এগিয়ে এলেন সেবাপরিচর্যার জন্যে।

চিকিৎসক বললেন—"দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, ভিতরের বিষ সারা দেহে বেরিয়ে পড়েছে। সেরে যাবে।"

রোগীর জন্যে তো বটেই, মাসীমার দুশ্চিন্তা আমার জন্যেও। এই সংক্রামক রোগ পাছে আমাকে ধরে। বাইরের কাজকর্ম করা, ওষুধপত্র-পথ্যাদি আনা প্রভৃতির জন্যে আমাকে সুস্থ রাখা দরকার। মাসীমা আমাকে রোগীর ঘরে যেতে দিতেন না। খেতে দিতেন মশারির মধ্যে,—পাছে খাদ্যবস্তুর উপর মাছি বসে। এইরূপ সতর্কতার মধ্যে আমি থাকি। আর, মাসীমা থাকেন রোগীর কাছে, রাত্রে শুয়ে থাকেন রোগীর পাশে। সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠেন, দেখি মাসীমার হাতে, গালে পুঁজের চামড়া, কাপড়ে পুঁজরক্তের চিহ্ন। আমার ভয়, এবার মাসীমার পালা। এ রোগ মাসীমাকে আক্রমণ করবেই। কিন্তু মাসীমা সুস্থ রইলেন। আর, আশ্চর্যের বিষয়—অতো সতর্কতার মধ্যে থেকেও আমার দেহে দেখা দিল জ্বর, দেখা দিল বসন্তের গুটিকা। কিন্তু এ গুটিকা জাত-বসন্তের নয়—জলবসন্তের।

অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রেও মাকে এই কালব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করতে পারলাম না। মা চ'লে গেলেন। আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

এবারে আমার মায়ের স্থান অধিকার করলেন মাসীমা। আমার বাড়ির সংসার মাসীমার বাড়ি। একমাত্র সন্তান ভগবতীচরণকে নিয়ে তাঁর সংসার।

অতি কষ্টের সংসার। চরম দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে মানুষ করছেন ভগবতী-চরণকে। ভগবতী তখন নিমতিতা হাই স্কুলে পড়ে।

বছরখানেক আগে—১৯১৩ সনের জানুয়ারি মাসে নিমতিতা মাইনর স্কুল পরিণত হয়েছে হাই স্কুলে। নাম—গৌরসুন্দর দ্বারকানাথ ইনস্টিটিউসন। প্রধান শিক্ষক—আশুতোষ মুন্সী। সহকারী শিক্ষক হয়ে পরের বছর এলেন বরদাচরণ মজুমদার। পরবর্তীকালে বরদাবাবু নিমতিতা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন।

৫৮

জুলাই, ১৯১৪। ইয়োরোপে মহাসমর ঘোষিত হ'লো। দুটি দলে যুদ্ধ: মিত্রশক্তি আর অক্ষশক্তি। ব্রিটেন, ফ্রান্স আর রাশিয়া—এদের সমন্বয়ে মিত্রশক্তি। আর জার্মানি,অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি আর তুরস্ক মিলে অক্ষশক্তি।

এই মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারতের বিপ্লবীদল আবার আত্মপ্রকাশ ক'রে সক্রিয় হয়ে উঠলো। পাঞ্জাব, উত্তরভারত আর বাংলায় গুপ্তসমিতির নায়কেরা খুন-ডাকাতি প্রভৃতির পরিচালনা ক'রে ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললেন।

আমাদের জগতাই গ্রামের হৃদয়নাথ মজুমদারের বিবাহ হয়েছিল পাবনায়। হৃদয়নাথের শ্যালক গোপেশচন্দ্র রায় মাঝে মাঝে তাঁর ভগিনীর সঙ্গে দেখা করতে আমাদের গ্রামে আসতেন। এই আসা-যাওয়ার ফলে আমাদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর একটা প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল।

গোপেশবাবু একবার এসে বিকেলের দিকে আমার বাড়িতে উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—"আপনারা নাকি স্বদেশী আন্দোলনের সময় খুব তৎপর হয়ে কাজ করেছিলেন, শুনলাম।"

আমি হেসে বললাম—"কার কাছে শুনলেন? কোথায় কাজ? রাস্তায় রাস্তায় দল বেঁধে গান গেয়ে বেড়িয়েছি। একে যদি কাজ বলতে চান, বলতে পারেন।"

গোপেশবাবু বললেন—"ঐ গান গাওয়া পর্যন্ত? আর কিছু করেন নি? শুনলাম খুদিরাম, কানাই দত্ত, সত্যেন বসুর ফাঁসীর দিন উপোস ক'রেছিলেন আপনারা।"

"তা ক'রেছিলাম। ওতে দেশের কাজ এমন কী হয়েছে?

গোপেশবাবু বললেন—"তা হয়েছে বৈ কি? দেশের কাজ করবার জন্যে আপনাদের মন তৈরি হয়েছে তো? একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, উত্তর দেবেন? আপনাদের এই মন তৈরি করলে কে?"

ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে থেকে যদি ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকতো, তাহ'লে পুলিসের গোয়েন্দাই ভাবতাম। কিন্তু গোপেশবাবু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে ভালো ক'রেই জানি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—কোনোদিন তিনি এ ধরনের প্রশ্ন বা আলোচনা করেন নি।

গোপেশবাবুকে সব বললাম। যুগান্তর ও ধর্ম পড়া থেকে অনুকূলবাবুর কথা পর্যন্ত। অনুকূলবাবু কয়েকটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ডাক এলেই সব ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। ডাক কিন্তু এলো না! সবই বললাম। আর এখন বলতেই বা আপত্তি কি।

গোপেশবাবু ঈষৎ হেসে বললেন—"যদি এখন সেই ডাক আসে, সাড়া দেবেন?"

গোপেশবাবুর মুখের দিকে ভালো ক'রে চাইলাম। বললাম—"কোথেকে ডাক আসবে? ডাক দেবে কে? আপনি?"

আবার একটু হাসলেন গোপেশবাবু। বললেন—"কী মনে হয় আমাকে?" বললেন—"ক্রমে সবই জানতে পারবেন। এখন কেবল এইটুকুই বলি: আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে। আমি অনুশীলন সমিতির হয়ে কাজ করছি। আপনার সঙ্গে তো নতুন পরিচয় নয়। তা ছাড়া, অনেক কথা শুনেছি আপনার সম্বন্ধে। আপনি আসুন অনুশীলন সমিতিতে। আপনার উপর কিছু কাজের ভার দিতে চাই।"

গোপেশবাবুকে যেন নতুন রূপে দেখলাম। বললাম—"কী কাজ করতে হবে বলুন।"

"আপনি তো বাড়িতে একা। মাঝে মাঝে দু'একটি ছেলে এলে তাদের স্থান দিতে হবে আপনাদের বাড়িতে। দু'চারদিন থেকে তারা অন্যত্র চ'লে যাবে।"

রাজি হয়ে গেলাম।

গোপেশবাবু বললেন—"কিছু ভালো ছেলে সংগ্রহ করুন। আপনাদের এ অঞ্চলের ইস্কুল থেকে ভালো ছেলে বেছে নেবেন। পরে তাদের আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।"

সে যাত্রা এই পর্যন্ত। গোপেশবাবু কোথায় যেন চ'লে গেলেন।

আমি কৃতার্থ হলাম। এতদিনে আমার আশা পূর্ণ হ'লো।

মাঝে মাঝে দুটি একটি তরুণ আমার বাড়িতে আসে। মাসীমার কাছে পরিচয় দিই—আমার জঙ্গিপুরের সহপাঠী বন্ধু। গোপেশবাবুর নির্দেশমতো তাদের পরিচয় নেবার প্রয়োজন হয় না। নিজেই তাদের নামকরণ ক'রে সেই নামেই ডাকি। অথচ অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো সদালাপ চলে যতদিন থাকেন।

একবার একটি যুবক এলেন, বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বেঁটেখাটো মানুষটি। এসে বললেন, কিছুদিন তাঁকে এখানে থাকতে হবে। কিন্তু আমার বাড়িতে নয়। আমার বাড়িতে বেশিদিন থাকলে গ্রামের লোকের মনে নানা প্রশ্ন জাগবে। তাই অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। চিন্তায় পড়ে গেলাম।

এখানে যে কয়জন স্কুলের ছাত্র আমার প্রভাবে পড়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—প্রভাতকুমার চৌধুরী, সৌরীন্দ্রনাথ মজুমদার, সুকুমার মুখোপাধ্যায় আর ননীগোপাল সরকার। এদের মধ্যে গোপেশবাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে সৌরীন্দ্রনাথ আর সুকুমার। প্রভাতকুমার আর ননীগোপাল—দু'জনেই খুব উৎসাহী, দু'জনেই বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

ননীগোপালের কাছে ঐ নবাগত তরুণ বিপ্লবীকে কোনোরূপে রাখা যায় কি না, ভাবছি। আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে চাই তাঁকে। আমাদের গ্রাম থেকে দু'মাইল দূরে বাজিতপুরে ননীগোপালের বাড়ি। মাথার উপরে অভিভাবক তার বাবা রাজেন সরকার। মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে সে। ননীগোপালকে বললাম—তোমার বাবাকে বলো, "একজন ভদ্রলোক এখানে চাকরি খুঁজছেন। যতদিন না চাকরি মেলে—থাকা ও খাওয়ার বিনিময়ে বাড়ির ছেলেদের প্রাইভেট পড়াতে পারেন। ভদ্রলোক শিক্ষিত। বাবাকে বুঝিয়ে ব'লে তোমার প্রাইভেট টিউটার ক'রে রাখবার ব্যবস্থা করো।"

বাবার আদুরে ছেলে ননীগোপাল, জিদ ধ'রে বসলো বাবার কাছে। বাবা রাজেন সরকারের একটি বাসনের দোকান ছিল অরঙ্গাবাদ বাজারে। রাজেনবাবু রাজি হ'লেন। ঐ বাড়ির দোতলায় একখানি ঘর ছিল, সেই ঘরে হ'লো মাস্টার মশাই-এর থাকার ব্যবস্থা। আহার ননীগোপালদের সঙ্গেই। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

সুকুমার বয়সে ননীগোপালের চেয়েও ছোট। কিন্তু অতি বুদ্ধিমান আর দুঃসাহসী।

বিপ্লবী দল থেকে তখন দুখানি কাগজ গোপনে বিলি করা হ'তো—স্বাধীন ভারত (বাংলা) আর লিবার্টি (ইংরাজি)। গোপেশবাবু একদিন এসে একগাদা লিবার্টি আমাকে দিয়ে গেলেন কোনো উপযুক্ত স্থানে ওগুলো বিলি করবার ব্যবস্থা করতে। বিলি করার মানে সেই স্থানের প্রকাশ্য স্থানে ওগুলো দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দেওয়া। সুকুমারকে বললাম—"পারবে ?

তৎক্ষণাৎ সুকুমার রাজি।

সুকুমারের বাড়ি বীরভূম জেলার মুরারই গ্রামে। এখানে থাকে দহরপাড় গ্রামে। দহরপাড়ে তার মামার বাড়ি। সুকুমার একদিন মুরারই যাবার নাম ক'রে এক বাণ্ডিল লিবার্টি আর একটা টিনের কৌটায় আঠা নিয়ে রওনা হ'লো বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির উদ্দেশে। একদা সুপ্রভাতে সিউড়ির লোকেরা চোখ চেয়ে ছাখে, সারা শহরের দেয়ালে দেয়ালে লিবার্টি। হৈ চৈ প'ড়ে গেল শহরময়। হাকিম হুকুম দিলেন পুলিসকে দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করতে। পুলিস যখন দুষ্কৃতকারীর সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত সুকুমার তখন সুস্থ দেহে, সানন্দ চিত্তে আমার কাছে ব'সে সিউড়ি শহরে লিবার্টি আঁটার গল্প শোনাচ্ছে।

যতদূর মনে হয়, এ সময়ে বরদাচরণ মজুমদার নিমতিতা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কালীপদ মিশ্র তাঁর সহকারী। বরদাবাবুর যোগশক্তির কথা আমরা শুনেছি।

বরদাবাবু ও কালীবাবু দু'জনেই স্কুলের বোর্ডিংএ থাকেন। স্কুলের কয়েকজন ছাত্রকে বেছে নিয়ে বরদাবাবু একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর ঘরে যোগসাধনা শিক্ষা দেন। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল সুকুমার, শৈলেশচন্দ্র রায়, কুলেশচন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি।

যোগীপুরুষ বরদাচরণের মনে এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ জাগে নি যে সুকুমার, শৈলেশ আর কুলেশ বিপ্লীদের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

নিমতিতা, কাঞ্চনতলা, পাকুড়, রামপুরহাট আর জঙ্গিপুর—এই কয়টি জায়গার স্কুলের ছাত্রদের ভিতর থেকে আমি বিপ্লবীদলের ছেলে সংগ্রহের চেষ্টা করছি। ক্লাসে যারা ভালো ছেলে, তাদের সঙ্গেই আলাপ করছি। কারণ বুদ্ধিমান ছেলেই আমাদের দরকার। কিন্তু দেখি, ভালো ছেলেরা প্রায় সবাই ভালো মানুষ। দুঃসাহসী, বেপরোয়া, স্বার্থত্যাগী ছেলে মেলা খুবই কঠিন।

জঙ্গিপুরের কাছে মিঠিপুর গ্রামে কয়েকজন ছেলের সন্ধান পেলাম।

সেখানে লেখাপড়ায় ভালো ছেলে না মিললেও বেশ বুদ্ধিমান ও সাহসী ছেলে পেলাম কয়েকটি। তাদের মধ্যে একজনের নাম চণ্ডী। বারকয়েক ঐ গ্রামে যাতায়াতের পর চণ্ডী কোথা থেকে একটা রিভলভার সংগ্রহ ক'রে এনে দিলে আমাকে। অন্য গ্রামের কার বাড়ি থেকে আনা চোরাই মাল।

জঙ্গিপুরের একটি ছেলে—নাম শশিভূষণ মাইতি—এনে দিলে একটা পুরোনো পিস্তল। শশী থাকতো জঙ্গিপুরের জমিদার সুরেন সিংহের বাড়িতে। জানি না, সেটি তাঁদের বাড়িরই কি না। শশী কিন্তু মালিকের নাম বলে নি।

ভালো ছেলে পাই বা না পাই, দুটি আগ্নেয়াস্ত্র পেলাম এখানে। এ-দুটি আমার বাড়িতে রইলো। আমার বিশ্বাস ছিল, পুলিসের লুব্ধ দৃষ্টি আমার উপরে পড়ে নি সুতরাং আমার বাড়ি খানাতল্লাসী হবে না।

সে-সময় আমাদের সুতী থানার সাব-ইনস্পেক্টর ছিলেন প্রভাতচন্দ্র দত্ত। থানায় জঙ্গিপুর মহকুমার পুলিসদের প্রীতি-সম্মেলনে প্রভাতবাবু দু'একবার আমাকে গান গাইতে নিয়ে গিয়েছিলেন। দারোগা প্রভাত দত্তের প্রীতিভাজন ছিলাম আমি। কেবল পুলিসই বা কেন, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এডি সাহেব এসেছেন নিমতিতায়, জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আদেশে আমি ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবুতে গিয়ে গান গেয়ে তাঁকে আনন্দ দিয়ে এসেছি। কে বলবে আমি বিপ্লবী দলের লোক?

৫৯

আমার সাহিত্য-সাধনা মন্থর গতিতে চলেছে। কলকাতার দু'একটি কাগজে আমার কবিতা বেরোচ্ছেও। তখন একখানা সাপ্তাহিক ছিল, নাম—সুলভ সমাচার। সম্পাদক জলধর সেন। সুলভ সমাচারের প্রথম পৃষ্ঠাতে প্রতি সংখ্যায় একটি ক'রে কবিতা থাকতো। আমি সাহসে ভর ক'রে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলাম সুলভ সমাচারের আপিসে। পরের সপ্তাহেই বেরিয়ে গেল কবিতাটি। কবিতার শিরোনামা 'তুমি ও আমি'।

কলকাতার কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের মুখপত্র "তত্ত্বমঞ্জরী" মাসিক পত্রে বেরিয়েছিল অনেকগুলি গান ও কবিতা।

এই সময় আমাদের অঞ্চলে ফুটবল খেলার একটা মরশুম প'ড়ে গেছে। কাঞ্চনতলায় হচ্ছে জিতেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতা।

আমাদের নিমতিতার ও আরো অনেক জায়গার অনেকগুলি দল যোগ দিয়েছে এই প্রতিযোগিতায়। আমরা নৌকা ক'রে যাই, নৌকাতেই ফিরে আসি। আমি আমাদের দেশী গ্রাম্য ভাষায় ছড়ার আকারে এই খেলার বিবরণ লিখতাম হাস্যরসাত্মক ভঙ্গীতে। পরের দিন কাঞ্চনতলায় যাবার সময় আমার ঐ ছড়া নৌকার উপর গাইতে গাইতে যেতাম। সহযাত্রী বন্ধুরা দোহার হয়ে আমার সঙ্গে গানের ধুয়া ধরতো। আনন্দের, হাসির ঢেউ উঠতো নদীর উপর।

বেশ খানিকটা লেখা হ'লে 'কাঞ্চনতলার কাপ' শিরোনামা দিয়ে সেই পাণ্ডুলিপি জঙ্গিপুর সংবাদে ছাপাবার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম সম্পাদক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দাদাঠাকুরের কাছে। পাবার সঙ্গে সঙ্গে পরের সংখ্যার জঙ্গিপুর সংবাদে দাদাঠাকুর কাঞ্চনতলার কাপের প্রথম কিস্তি প্রকাশ করলেন। আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। আমি এক-একটা খেলা দেখে আসি, আর সেটি ছড়ায় বেঁধে দাদা-ঠাকুরের কাছে পাঠিয়ে দিই। ফাইন্যাল খেলা পর্যন্ত লিখে আমার কাঞ্চনতলার কাপ লেখা শেষ হ'লো। নিজের খরচে কাগজ কিনে, ছাপাবার কোনো খরচ না নিয়ে দাদাঠাকুর আমার 'কাঞ্চনতলার কাপ' পুস্তিকাটি ছেপে দিলেন। আমার আনন্দ আর ধরে না। আমি এখন গ্রন্থকার। একটু গর্ববোধ হচ্ছে বৈ কি? জমিদার মহেন্দ্রবাবু একশো কপি বই কিনে আমাকে উৎসাহিত করলেন।

কলকাতার মাসিকপত্রে দেখি, বই-এর সমালোচনা বেরোয়। আমার মনে সাধ জাগল, আমার বই-এর সমালোচনার জন্যে। কলকাতার কয়েকখানি মাসিক পত্রে কাঞ্চনতলার কাপ পাঠিয়ে দিলাম। দেখি, দুখানি কাগজে আমার ঐ বারো পৃষ্ঠার বইএর সমালোচনা বেরিয়েছে। 'প্রবাসী'র পূর্ণ এক কলম প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা। সমালোচক—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মানসী' পত্রিকায় পুরো এক পৃষ্ঠা সুখ্যাতিমূলক সমালোচনা। সমালোচক—রাখালরাজ রায়। দুটি পত্রিকাতেই আমার কাঞ্চনতলার কাপ থেকে রসাত্মক উদ্ধৃতি ছিল।

৬০

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ভগবতীচরণ নিয়োগীর নাম দেখে মাসীমা খুবই খুশী। ছেলে পরীক্ষায় পাস করেচে! ভগবতী ভর্তি হ'লো বহরমপুর কলেজে।

ছেলে চ'লে যাবার পর মাসীমা আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই মাসীমা মাঝে মাঝে সংসার-পরিচালনায় অক্ষমতার

কথা বলেন। আর তার প্রতিবিধানের জন্যে বাড়িতে একটি বৌ আনা অবশ্যপ্রয়োজন। প্রতিবারই আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। এবারেও এই নিয়েই মাসীমার সঙ্গে আমার তর্ক বিতর্ক চলছে, সন্ধ্যাকাল—বাড়িতে একজন অতিথির আবির্ভাব। হাতে একটি টিনের ট্রাঙ্ক। প্রথম সম্ভাষণ—"এসে গেলাম দাদা!" যেন তাঁর এই আসা নিয়ে আগে থেকেই আমার সঙ্গে পত্রালাপ চলছিল। আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত তাঁকে আহ্বান ক'রে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। বলা প্রয়োজন—নবাগত ব্যক্তি একজন বিপ্লবী এবং আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমারই সমবয়সী। তাকে নিয়ে আমার শোবার খাটের উপরে বসিয়ে তাঁর আসার কারণটি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন—"ঐ ট্রাঙ্কটি রামপুরহাটে পৌঁছে দিতে হবে। অন্য কোনো ছেলের দ্বারা নয়—আপনাকেই যেতে হবে। রামপুরহাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি ছেলে আপনার কাছ থেকে ট্রাঙ্কটি নেবে। আপনি তাকে না চিনলেও সে আপনাকে চেনে।"

ট্রাঙ্কটি তিনি রেখেছেন খাটের নীচে। মাসীমা বাড়ুন-হাতে ঘরে ঢুকলেন। বাড়ুন বস্তুটি হচ্ছে একজাতীয় তৃণের তৈরি ঝাঁটাবিশেষ। মাসীমা ঘরের মেঝে ঝাঁট দিতে দিতে হঠাৎ ব'লে উঠলেন—"এ বাক্সের মধ্যে কী আছে বাবা? নড়ানো যায় না।"

নবাগতের স্বগতোক্তি—"সর্বনাশ।" সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে নেমে মাসীমাকে বললেন, "আমি যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ করি। ওর মধ্যে কতকগুলো লোহালক্কড় আছে, তাই অতো ভারি।"

পরদিন সন্ধ্যার ট্রেনে সেই টিনের ট্রাঙ্ক নিয়ে আমরা দুজনে সজনীপাড়া স্টেশন অভিমুখে রওনা হলাম। হাওড়াগামী ট্রেন। উনি যাবেন কলকাতা, আমি মাঝপথে আজিমগঞ্জ জংশন স্টেশনে নেমে পড়ব রামপুরহাট যাবার জন্যে। আজিমগঞ্জ থেকে নলহাটি হয়ে রামপুরহাট যেতে হবে। নলহাটির ট্রেন ছাড়বে ভোরে। রাত দশটা নাগাদ আমি ট্রাঙ্ক নিয়ে আজিমগঞ্জ জংশন স্টেশনে নেমে পড়লাম। বাকি রাতটা কাটাতে হবে এখানে। শীতকাল। হাড়কাঁপানো শীত। সঙ্গে বিছানাপত্র নেই। শীতনিবারণের জন্যে গায়ে একখানা আলোয়ান মাত্র। প্ল্যাটফর্মের লাগোয়া 'শেড'-এর নীচে ব'সে সারারাত্রি কাটানো কষ্টকর। আশ্রয় খোঁজবার জন্যে এদিক ওদিক ঘুরতেই দেখি সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমটি খোলা। যাত্রী যদিও তৃতীয় শ্রেণীর, সাহসে ভর দিয়ে ঢুকে পড়লাম ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামকক্ষে। যাত্রীশূন্য কক্ষ। বেতে ছাওয়া একটা লম্বা বেঞ্চের উপরে শুয়ে পড়লাম; মাথার কাছে রইলো ট্রাঙ্কটি। আপাদমস্তক মায় ট্রাঙ্কটি পর্যন্ত

আলোয়ানে ঢাকা। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। এই ঘুমের ঘোরেই মনে হ'লো—বেঞ্চ সমেত আমার মাথার দিকটা যেন উপরে উঠে যাচ্ছে। খানিকটা উঠেই ঢুম ক'রে পড়লো মেঝের উপরে। লাফিয়ে উঠে পড়লাম। চেয়ে দেখি, সম্মুখে দাঁড়িয়ে রেল কোম্পানির কালো পোশাক-পরা একজন সাহেব। দৃষ্টি বিনিময় হ'তেই সাহেব টিকেট দেখতে চাইলেন। আমি সঙ্কোচের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেটখানি আমার পকেট থেকে বের করলাম। টিকেটের উপর চোখ পড়া মাত্র 'গেট আউট, গেট আউট' বলার সঙ্গে সঙ্গে সবুট লাথির পর লাথি। ঘরের বার না হওয়া পর্যন্ত এই পাদুকাঘাত চলল আমার দেহের উপর।

বাইরে ট্রাঙ্কটি নিয়ে এক জায়গায় বসে ভাবছি, ট্রাঙ্কের মধ্যে কী বস্তু আছে জানি না। কিন্তু যা আছে, অনুমানে মনে হয়, তা ঐ সাহেবনিধনেরই সরঞ্জাম হ'লেও হতে পারে। বাক্সের চাবিও আমার কাছে। একবার খুলে দেখবো নাকি ? কিন্তু কৌতূহল দমন করলাম। ট্রাঙ্ক খোলার নির্দেশ নেই। তা ছাড়া, যদি সাহেবনিধনেরই অস্ত্রশস্ত্র থাকে, তবে সে-অস্ত্র নিশ্চয়ই একজন রেলের গার্ড বা ড্রাইভারকে মারার জন্যে নয়। ইত্যাদি চিন্তায় চিন্তায় বাকি রাতটুকু কেটে গেল। ভোরবেলায় ট্রেনে উঠে নলহাটিতে গাড়ি বদল ক'রে রামপুরহাট পৌঁছলাম। আমার জন্যে অপেক্ষমাণ ব্যক্তির হাতে ট্রাঙ্কটি সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

বাড়ি ফেরার দিনকয়েক পরে এক দুর্ঘটনা ঘটলো স্কুলের বোর্ডিং-এ। বোর্ডিং খানাতল্লাস ক'রে পুলিস শৈলেশ আর কুলেশকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চ'লে গেল। খবর পাওয়া গেল বহরমপুর কলেজ হোস্টেল থেকে ভগবতীকেও পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। পরদিনই রাত্রিতে অকস্মাৎ গোপেশচন্দ্র এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, ননীগোপালের মাস্টারটিকে কোনো নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করতে হবে। দুজনে পরামর্শ ক'রে সিদ্ধান্ত হ'লো জঙ্গিপুর বা রঘুনাথগঞ্জে পলাতক বিপ্লবীদের জন্যে একটি আস্তানার ব্যবস্থা করা। জঙ্গিপুরে শ্যামাপ্রসাদ সিংহ নামে আমাদের একজন বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন। তাঁরই সাহায্যে একটি বাড়ি ভাড়া করা হ'লো রঘুনাথগঞ্জে। আর ঐ ননীগোপালের মাস্টারমশায়ের জন্যে স্থানীয় এক ব্যক্তির একটি ছেলেকে পড়াবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন শ্যামাপ্রসাদ। আমি তাঁদের তত্ত্বাবধানের জন্যে দাদাঠাকুরের জঙ্গিপুর সংবাদ কাগজ ও পণ্ডিত প্রেসে স্থান সংগ্রহ করলাম। এর বিশদ বিবরণ আমার দাদাঠাকুর গ্রন্থে আছে।

কিছুকাল নিরুপদ্রবে কাটানোর পর এখানেও একদিন সঙ্কট দেখা দিল।

ছ'জন পলাতক বিপ্লবী এসে জানালেন, হাওড়া স্টেশন থেকে দুটি লোক তাঁদের অনুসরণ ক'রে জঙ্গিপুর রোড স্টেশন পর্যন্ত এসেছে। হয়তো তারা এ বাড়িটির সন্ধান পেয়ে থাকবে। যে-কয়জন বিপ্লবী সেদিন সে-বাড়িতে ছিলেন, সকলকেই সরিয়ে ফেলা হ'লো রাতারাতি। পরদিন ভোরবেলায় বাড়ি ঘেরাও ক'রে থানাতল্লাসি হ'লো। কিন্তু কিছুই মিললো না। বাড়ি শূন্য।

সেই সঙ্গে মাস্টারমশাইও অন্তর্ধান করেছেন এবং শ্যামাপ্রসাদও। দিনকয়েক পরে খবর পেলাম গোপেশচন্দ্রও গ্রেপ্তার হয়েছেন কলকাতায়। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমায় তিনি অন্তরীণ অবস্থায় আছেন।

৬১

আমার রঘুনাথগঞ্জের আসল কাজ ফুরিয়েছে। বাড়ি এলাম। জগতাই-নিমতিতার আবহাওয়াতেও প্রকৃতির গুরুগম্ভীর ভাব। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে শুনলাম—বাড়িতে থাকাও আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। স্থানীয় কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি আমার প্রতিকূল।

মন বিক্ষিপ্ত। কলকাতায় গেলাম। কলকাতায় গিয়ে একজন বন্ধুর সাহায্যে একটি চাকরি জুটলো। ভিক্টোরিয়া ক্লাবের ম্যানেজার হয়ে গেলাম পুরীতে। ভিক্টোরিয়া ক্লাব একটি অভিজাত হোটেল। ভিক্টোরিয়া ক্লাবে থাকা-কালে একজন বয়ঃকনিষ্ঠ তরুণ বন্ধু পেয়েছিলাম, ভবিষ্যৎ-জীবনে যিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। নাম—নির্মলকুমার বসু। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ এবং মহাত্মার সহচর ও সচিব। পুরীতে হঠাৎ সংক্রামক হয়ে দেখা দিল দুরন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা। সকলে বলে, ওয়ার ফিভার। পুরীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়।

কলকাতায় থাকি হ্যারিংটন স্ট্রীটে। একদিন সন্ধ্যার পর এস্প্ল্যানেডে ট্রাম থেকে নেমে চৌরঙ্গি রোড্ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি হ্যারিংটন স্ট্রীটে। হোয়াইটঅ্যাওয়ে লেড ল'র দোকানের উল্টোদিকে কর্পোরেশন স্ট্রীটের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড) মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রায় ছ'ফুট লম্বা গৌরকান্তি একজন মুসলমান ফকির। গায়ে আগুল্ফলম্বিত কালো আলখাল্লা, গলায় নানা রঙের নানা রকমের পাথরের মালা। আমার দিকে চেয়ে ফকির বললেন তাঁর হিন্দুস্থানী ভাষায়—"কী বাবা, শরীর ভালো যাচ্ছে না? হজমের গণ্ডগোল হচ্ছে?"

সে-সময় আমার কোনো অসুখবিসুখ ছিল না। তবু যেন মনে হ'লো, দু'-একদিন বোধ হয় বদ্‌হজমে ভুগেছিলাম।

ফকির বললেন—"কোনো চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমাকে ওষুধ ব'লে দিচ্ছি। এ ওষুধ খেলে রোগ সেরে যাবে। ওষুধের জন্যে কোন দাম দিতে হবে না তোমাকে। সেরে গেলে পর একটি অভুক্ত লোককে খাইয়ে দিয়ো। এ অভুক্ত লোকও তুমি পাবে।"

এই কথা ব'লে তিনি দশ-বারোটি বস্তুর নাম করলেন। এইগুলো গুঁড়ো ক'রে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রত্যহ খেতে হবে। যে-কয়টি বস্তুর নাম করলেন, তার ছ'সাতটির নাম আমার জানা ছিল। বাকি চার-পাঁচটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে-কয়টি ওষুধের নাম আমি কিছুতেই রপ্ত করতে পারলাম না। তখন তিনি বললেন—"কাছাকাছি কোনো মশলার দোকান থাকতে পারে, চলো দেখি যদি মেলে।"

কর্পোরেশন স্ট্রীটে কিছুদূর গিয়েই একটি মুদির দোকান পাওয়া গেল। সেখানে কয়েকটি ওষুধ মিললো। মুদি বললে—বাকি ওষুধগুলি হকিমের ওষুধের দোকানে পাবে। একটু এগিয়ে গেলেই বাঁদিকে একটি গলির মধ্যে হকিমের দাওয়াইখানা মিলবে, সেইখানে পাবে ঐ ওষুধগুলি। ফকিরের সঙ্গে খানিকটা পথ এগিয়ে বাঁদিকে একটা গলি পাওয়া গেল। ঐ গলির মধ্যে বেশ কিছুদূর গিয়ে মিললো হকিমের দাওয়াইখানা। একটি ফরাসপাতা তক্তাপোশের ওপর ব'সে আছেন হকিম। ফকির ওষুধগুলোর নাম উল্লেখ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে চাইলেন, আছে কি না। সব ওষুধই পাওয়া যাবে, হকিম সাহেব জানালেন।

ফকির একে একে ওষুধের নাম ও পরিমাণ ব'লে যান, আর হকিম নিক্তিতে ওজন ক'রে একটি পাথরের বড় খলের মধ্যে সেগুলি রাখেন। মুদির দোকানে যে কয়টি ওষুধ পাওয়া গিয়েছিল, কোনোটিরই দাম চার আনা ভরির বেশি নয়, এবং পরিমাণও এক ভরি মাত্র। কিন্তু হকিমের এক একটা ওষুধের দাম যখন দু টাকা থেকে শুরু ক'রে পাঁচ টাকা ভরিতে ঠেকলো এবং পরিমাণও পাঁচ ভরিতে দাঁড়ালো, তখন আমি হকিমকে বললাম—"আমার কাছে অত টাকা নেই।"

হকিম বললে, "তোমাকে নিতেই হবে।"

গলার স্বর আর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারলাম, আমি কোথায় এসেছি আর কাদের খপ্পরে পড়েছি। ঘরের মধ্যে থেকে ফকির আমার অজ্ঞাতসারে কখন অন্তর্ধান করেছেন। ঐ হিংস্রদৃষ্টি হকিমের গুহায় তখন আমি আর সে।

অনন্যোপায় হয়ে পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের ক'রে হকিমের হাতে দিয়ে মিনতি ক'রে বললাম—"এই দশ টাকা অগ্রিম নাও, কাল এসে বাকি টাকা দিয়ে সব ওষুধ নিয়ে যাবো।"

হকিম টাকা নিয়ে পাশের বাক্সের মধ্যে রেখে দিলে। আমি উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় ঐ ঘর দিয়ে অন্দরমহলে ঢোকবার দরজা থেকে হুকুম করার মতো গর্জন-ধ্বনি কানে এলো—"অ্যায়, ইধার আও।"

দেখি, সেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক ভীষণ-মূর্তি। কিন্তু মুখখানি পরিচিত। সেই ফকির! সে-ফকিরী বেশভূষা নেই, সে মৃদুমধুর কণ্ঠস্বর নেই। তীব্র দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। একাধিকবার আদেশ—"ইধার আও।"

অকস্মাৎ গলিতে জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ। চেয়ে দেখি—ঐ গলির উপর, হকিমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন পুলিস-কনস্টেবল। আমার মুখচোখের অবস্থা দেখে পুলিস হকিমের ওষুধের দোকানের মধ্যে ঢুকে আমাকে হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি এই রাত্রিতে এখানে কেন?"

আমি সংক্ষেপে সবই বললাম। সব শুনে হকিমকে পুলিস বললেন—"এঁর দশ টাকা ফিরিয়ে দাও।"

দশ টাকার নোটখানি হকিম আমাকে ফিরিয়ে দিলে। ওদিকে অন্দরে যাবার দরজা থেকে সেই ফকির কোন্ ফাঁকে স'রে পড়েছে। কনস্টেবলটি আমার হাত ধ'রে ঘরের বাইরে এনে গলির মধ্যে চলতে চলতে বললেন, "খুব প্রাণে বেঁচেছো তুমি। কোথায় থাকো তুমি?"

"হ্যারিংটন স্ট্রীটে।"

কনস্টেবল বললেন—"জানো, তুমি কোথায় এসেছিলে? এ কুখ্যাত জানবাজারের গলি। গুণ্ডাদের আড্ডা এখানে। হামেশাই দু'একজন খুন হয়।"

কনস্টেবলটি আমাকে চৌরঙ্গির মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

হ্যারিংটন স্ট্রীটে আমার থাকার একটা কারণ আছে। এটি কুমার অরুণচন্দ্র সিংহের বাড়ি। কুমার বাহাদুরের শ্যালক সন্তোষকুমার ঘোষ হাজরা আমার বন্ধু। বর্ধমানের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে যখন হিলোড়া গিয়েছিলাম, সেই সময় আলাপ হয়েছিল সন্তোষের সঙ্গে। সন্তোষ তখন তার অন্যতম ভগিনীপতি হিলোড়ার জমিদার ত্রিদিবেশ সিংহের বাড়িতে ছিল। এই ত্রিদিবেশ সিংহেরই পুত্র প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক তপন সিংহ।

সন্তোষ অনুরোধ করেছিল কলকাতায় গেলে যেন হ্যারিংটন স্ট্রীটে উঠি। সেখানে বোনের বাড়িতে থেকে সে কলেজে পড়ে।

হ্যারিংটন স্ট্রীটকে কেন্দ্র ক'রে নানা জায়গায় যাই। তার মধ্যে প্রধান গন্তব্য-স্থল কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দির মণ্ডপে ব'সে অনেকক্ষণ কাটিয়ে আসি। যোগোদ্যানে ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে স্বামীজীদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হয়। মণ্ডপে দু'একদিন গানও করি।

একবার একটি উৎসবের দিনে যোগোদ্যানে গিয়ে পরিচালক স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের কাছে আমাকে দীক্ষাদানের প্রস্তাব করলাম। স্বামীজী সম্মত হলেন। দীক্ষামন্ত্র দানের পর স্বামীজী বললেন—"দোতলায় মা আছেন, প্রণাম ক'রে এস।"

মা সারদামণি এই উৎসব উপলক্ষে যোগোদ্যানে এসেছেন। দোতলায় উঠে গিয়ে দর্শন করলাম শ্রীমা সারদামণিকে। ছবিতে দেখেছি। হুবহু সেই মূর্তি। সেইরকম শাড়ি পরা। প্রণাম ক'রে ধন্য হলাম।

যেন একটা নতুন জীবন আরম্ভ হ'লো। বিপ্লবসংস্থাগুলি ভেঙে গেছে, বিপ্লবী বন্ধুরা অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়েছেন। নিরবলম্ব অবস্থায় আমি যেন অকূলে ভেসে চলছিলাম। এবারে কূল পেলাম। অশান্ত জীবনে শান্তি ফিরে এলো।

বেশ কিছুদিন র'য়ে গেলাম যোগোদ্যানে। আমি এখন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের অনেকেরই গুরুভাই। গুরুভাইয়েরা আমাকে ব্রহ্মচারী হয়ে যোগোদ্যানে থেকে যাবার প্রস্তাব করেন। আমিও সম্মত। কিন্তু একবার বাড়ি যাওয়া দরকার। কারণ—বৈষয়িক। বাড়িঘর, জমিজায়গার একটা ব্যবস্থা ক'রে আসা প্রয়োজন। মাসীমা আছেন, ভগবতী আছে। জানি না, এ সংসারত্যাগীর ভূসম্পত্তি তাঁরা গ্রহণ করবেন কি না। এই সব চিন্তা নিয়ে বাড়ি এলাম।

৬২

আমাকে দেখামাত্র মাসীমা ব'লে উঠলেন—"এসেছিস? রোজ ভাবছি তোর কথা: কবে আসছিস, কখন আসছিস।"

আমি মাসীমাকে প্রণাম ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার সঙ্গে যে-সব জিনিসপত্র ছিল এক কোণে রেখে আমার খাটে বিছানার উপর বসলাম নীচে পা ঝুলিয়ে। সবে সন্ধ্যা। মাসীমা হ্যারিকেনটি জেলে আমার খাটের কাছেই মেঝের উপর ব'সে পড়লেন।

এ-কথা সে-কথার পর মাসীমা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"তোর বিয়ে ঠিক করেছি।"

আমি স্তম্ভিত।

মাসীমা ব'লে চললেন—"আর কতদিন বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরবি। বিয়ে ক'রে সংসারে মন দে।"

আমি গম্ভীর হয়েই মাসীমাকে বললাম—"আপনাকে আমি কতোবার ব'লেছি—বিয়ে ক'রবো না। কেন আপনি বার বার এ কথা বলেন?"

মাসীমা দৃঢ়স্বরে বললেন—"তোকে বিয়ে করতেই হবে। আমি বিয়ে ঠিক ক'রেছি। কন্যাপক্ষকে কথা দিয়েছি।"

আমি এবারে একটু উষ্মা প্রকাশ ক'রে বললাম—"কেন আপনি কথা দিতে গেলেন? আপনি ভালো ক'রেই জানেন যে, আমি বিয়ে ক'রবো না।"

মাসীমাও একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন—"কেন বিয়ে করবি না। বিয়ে তোকে করতেই হবে।"

আমি ততোধিক রুক্ষস্বরে বললাম—"কিছুতেই বিয়ে করবো না।"

মাসীমা কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন—"তুই আর না বলিস না বাবা, আমার কথা রাখ্।"

ব'লে আমার পা দু'খানি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন।

আমি চমকে উঠে বললাম--"এ কী করলেন আপনি, আমার পায়ে হাত দিলেন! ছেড়ে দিন পা।"

তখনও আমার পায়ের পাতা মাসীমা দৃঢ়মুষ্টিতে ধ'রে আছেন। ঐ অবস্থাতেই বললেন—"বিয়ে করবি বল্। নৈলে ছাড়বো না।"

আমাকে বলতেই হ'লো—"ক'রবো বিয়ে, আপনি পা ছাড়ুন।"

মাসীমা হয়তো খুশীই হলেন, আমার অন্তরটি গ্লানিতে ভ'রে উঠলো। মনের মধ্যে কেবল জাগছে—মাসীমা আমার পায়ে হাত দিলেন!

যোগোত্থান থেকে একটা পরম প্রশান্তি নিয়ে এসেছিলাম। বাড়ি এসে জীবনে ধিক্কার জন্মে গেল! রাত্রে ঘুম হ'লো না। নানা চিন্তার মধ্যে সব চেয়ে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে—মাসীমা আমার পায়ে ধরেছেন।

বিয়ের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল গ্রামের মধ্যে। যেখানে যাই, সেখানেই বিয়ের কথা শুনতে হয়। কেউ বা টিটকারি দেয়, কেউ বা ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। বাড়িতে আমি বিয়ের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। গ্রামে দূরসম্পর্কীয় একজন কাকার সঙ্গে মাসীমার শলাপরামর্শ হয়। আর কন্যাপক্ষের একজন আত্মীয় থাকেন আমাদের গ্রামে, তাঁর সঙ্গে চলে বিয়ের দিনক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা।

একটি স্থান ব্যতীত নিশ্চিন্ত মনে কিছুক্ষণ আনন্দে কাটাবার দ্বিতীয় জায়গা নেই আমার। সেটি হচ্ছে বয়োজ্যেষ্ঠদের বৈঠক। সেখানে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীপদ মিশ্র, ডাক্তার রাধারমণ 'সংহ প্রভৃতি একত্র হয়ে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ক'রে থাকেন। এই বৈঠকে প্রত্যহ উপস্থিত থাকতেন, তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদার। কিন্তু তিনি নিমতিতা স্কুল ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন লালগোলায়। বরদাবাবু এখন লালগোলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বরদাবাবুর অভাবে বৈঠকের বিশেষ অঙ্গহানি হয়েছে। আমি প্রত্যহ বিকেলে যাই এই বৈঠকে।

বৈঠকে কথাপ্রসঙ্গে ক্ষীরোদবাবু আমাকে একদিন বললেন,—"তুমি তো কবিতা লিখে থাকো, গল্প-প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করো না কেন?"

নিমতিতার একটি মেধাবী ছাত্র কলকাতায় হিন্দু হোস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো। নাম—ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার। হিন্দু হোস্টেলের ছাত্রদের একটি হাতে-লেখা সাময়িক পত্র ছিল। ক্ষিতীশের অনুরোধে আমি একটা নক্সা ধরণের রচনা লিখেছিলাম। ক্ষিতীশ সেটি তাদের হাতে-লেখা কাগজে বের করেছিল।

ক্ষীরোদবাবুকে সেই লেখাটির কথা বললাম। ক্ষীরোদবাবু বললেন—"নক্সা? সামাজিক বা রাজনৈতিক চিত্র?"

আমি বললাম—"না, না—সে-রকম কিছুই নয়। ওটি একটা ক্যারিকেচার মাত্র। ভারতচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ—এঁদের রচনার অনুকরণ করেছি লেখাটির মধ্যে। একটু হাস্যরস ফোটাবার চেষ্টা করেছি মাত্র।"

ক্ষীরোদবাবু বললেন—"লেখাটির কপি আছে তোমার কাছে?"

"আছে।"

"তুমি কাল এনো লেখাটি, আমি দেখবো।"

পরদিন পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে গেলাম সেই বৈঠকে। ক্ষীরোদবাবু লেখাটি আদ্যন্ত পড়ে বললেন—"এই লেখা তুমি ঐ হাতে-লেখা কাগজে দিয়েছো? যে-কোনো মাসিক পত্রে বেরোতে পারে তোমার এ লেখা। তুমি এটি 'ভারতবর্ষে' পাঠিয়ে দাও, নিশ্চয়ই বেরোবে।"

এই কথা ব'লে ডাক্তার রাধারমণ সিংহের কাছ থেকে একটুকরা কাগজ

ক্ষীরোদবাবু চেয়ে নিলেন। সেই কাগজটুকুর ওপরে লিখলেন, "ভাই হরিদাস, আমি এখানে একজন লেখক আবিষ্কার করেছি। তার এই রচনাটি জলধরবাবুকে দিয়ো।"

হরিদাস হচ্ছেন ভারতবর্ষের অন্যতম মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষীরোদবাবু ঐ কাগজটুকু আমাকে দিয়ে বললেন, "তোমার এই লেখাটির প্রথম পাতার কোণে এটি আলপিন দিয়ে গেঁথে 'ভারতবর্ষ' আপিসে পাঠিয়ে দাও।"

ক্ষীরোদবাবুর কথামত লেখাটি পাঠিয়ে দিলাম 'ভারতবর্ষে'র ঠিকানায়। সঙ্গে একখানি চিঠিও দিলাম আমি।

সেটা বোধ হয় ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ। পরের মাসের গোড়ার দিকে আমার নামে বুকপোস্টে আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষ' এলো। খুলে দেখি, আমার লেখা—সাহিত্য-সংস্কার। লেখক নিশ্চিড়ানন্দ নকলনবিশ। আমি ঐ ছদ্মনামই ব্যবহার করেছিলাম।

৬৩

আমার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। বিয়ে ময়মনসিংহ জেলার একটি পল্লীগ্রামে। কন্যার পিতা ফরিদপুরবাসী কিন্তু সেই পল্লীগ্রামের জমিদারী কাছারীতে তাঁর কর্মজীবন।

বরযাত্রীর দল সঙ্গে নিয়ে ময়মনসিংহের সেই গ্রামটিতে গিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন ক'রে একটি কিশোরা বধূ এনে মাসীমার হস্তে সমর্পণ ক'রে আমি আমার কর্তব্য পালন করলাম। বাড়িতে এসেও আনুষঙ্গিক কার্য সম্পন্ন হ'লো। কিন্তু বধূটি রইলেন মাসীমার বধূ হয়ে। আমার নয়। প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে অসহযোগ। কয়েকদিন পরে আমি শ্বশুরালয়ে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। এইমাত্র তাঁর সঙ্গে আমার সহযোগিতা।

মাসীমা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম ক'রে নববধূকে পিত্রালয় থেকে নিজের আলয়ে আনালেন। স্বামী ছেড়ে দিল তার নিজের আলয়। মাসীমা বৌ নিয়ে রইলেন আমার বাড়িতে, মাসীমার বাড়িতে রইলাম আমি। কেবলমাত্র স্নানাহার আমার নিজের বাড়িতে।

কিন্তু অস্বস্তির অন্ত নেই। মাসীমার সাধ্যসাধনা তো আছেই, গ্রামের মহিলারা এসে নানা সদুপদেশ দিয়ে আমার কর্তব্যবুদ্ধি জাগাবার চেষ্টা করেন।

কোনো কোনো বয়স্ক ব্যক্তির কাছে থেকে রূঢ় মন্তব্যও শুনতে হয়। বন্ধুরা আড্ডা দিতে এসে অনেক হিতকথা শুনিয়ে যায়।

আমি একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিনাতিপাত করছি: না সংসারধর্ম-পালন, না বৈরাগ্যসাধন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। এক-একবার মনে হয়, বাড়ি ছেড়ে কোথাও চ'লে যাই। এতদিন ধ'রে যা-কিছু সঞ্চয় করলাম, তা বুঝি নিঃশেষ হ'তে চলেছে। যে বিগ্রহ গ'ড়ে তুললাম, তা বুঝি ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়! জানি না ঠাকুরের কী ইচ্ছা।

৬৪

সিউড়ি থেকে আমি গেলাম কলকাতায়। একটু প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য—একবার 'ভারতবর্ষ' আপিসে গিয়ে সম্পাদক জলধর সেন মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। বলা বাহুল্য, অন্য কাজ প'ড়ে রইলো, কলকাতায় পৌঁছে আহারাদির পর বেলা তিনটে নাগাদ গিয়ে হাজির হলাম 'ভারতবর্ষে'র ঠিকানায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে। নীচে একতলায় একটি বড় ঘরের দু'দিকে চেয়ার টেবিল পেতে বসে আছেন দুটি ব্যক্তি—একজন সুদর্শন তরুণ, অপরজন প্রৌঢ়। দু'জনেই লেখাপড়ার কাজ করছেন। আমি তরুণ ব্যক্তিটির সামনে দাঁড়াতেই তিনি আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—"কী চাই?"

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম—"ভারতবর্ষ সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

যুবকটি আর মাথা তুললেন না। আমার দিকে না চেয়েই বললেন—"লেখা এনেছেন? এইখানে রেখে যান, মনোনীত হ'লে ছাপা হবে।"

আমি বললাম—"আমি লেখাটেখা আনি নি। সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

মাথা না তুলেই তিনি বললেন—"লেখা পাঠিয়েছেন বুঝি?"

"না।"

যুবকটি এবারে বোধ হয় বিরক্তি বোধ করলেন। মাথা তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"আপনার লেখা কখনও ভারতবর্ষে বেরিয়েছে কি?"

বলার ভঙ্গীটি এমন অর্থবহ, যাতে মনে হ'লো তিনি বলতে চান, যদি কখনো আমার লেখা ভারতবর্ষে বেরিয়ে থাকে, তবেই সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে, নৈলে নয়। আমি বললাম—"এই আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষেই বেরিয়েছে।"

মুখ তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন—'কী নাম আপনার ?'

"নলিনীকান্ত সরকার।"

টেবিলের উপরেই একগাদা ভারতবর্ষ রাখা ছিল। একখানা তুলে নিয়ে সূচীপত্রটি দেখে তিনি বললেন—"না, নলিনীকান্ত সরকারের কোনো লেখা এ সংখ্যা ভারতবর্ষে নেই।"

আমি বললাম—"লেখাটি আছে আমার ছদ্মনামে। লেখাটির নাম 'সাহিত্য-সংস্কার' আর লেখকের নাম নিবিড়ানন্দ নকলনবিস।"

অনতিদূরে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কাজ করছিলেন, তিনি চেয়ার থেকে উঠে এসে আমাকে বললেন—"চলুন চলুন, আমিই আপনাকে জলধরদা'র কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

পরে জেনেছিলাম—এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি হচ্ছেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

হরিদাসবাবু আমাকে নিয়ে তেতলার একটি ছোট ঘরের সামনে গিয়ে হাজির করলেন। ঘরের মধ্যে বৃদ্ধ জলধর সেন। হরিদাসবাবু বেশ উঁচু গলায় জলধর-বাবুকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—"দাদা, এই নিন আপনার নিবিড়ানন্দ নকলনবিসকে।"

আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তিনি সস্নেহে 'এস ভাই, এস ভাই' বলে গ্রহণ করলেন আমাকে।

প্রথম কথা—"এসেছো যদি, ঐ রকম নকলনবিসী লেখা আরেকটি দিয়ে যাও।"

হরিদাসবাবুর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝেছিলাম, সম্পাদক মহাশয় কানে খাটো, একটু জোর গলায় কথা বলতে হয়। তাঁকে বললাম—"দেখবো চেষ্টা ক'রে।"

একেবারে পরম আত্মীয়তার সুরে বললেন—"ও-সব চেষ্টাচেষ্টা নয় ভাই। তুমি আজ লিখে কাল আমাকে দিয়ে যেয়ো। শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষ দু-একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে। ভাদ্র সংখ্যার লেখা এই সপ্তাহেই প্রেসে দেবো, তোমার লেখাও সেই সঙ্গে দিতে চাই।"

বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম সম্পাদকের দপ্তরে। অনেক কথাই হ'লো। কিন্তু বলি-বলি ক'রেও বলা হ'লো না একটি কথা। একবার মনে হয়েছিল যে, তাঁকে বলি দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তিনি যখন ভারতবর্ষের সম্পাদক হন, তখন আমার লেখা একটি গান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বলতে পারলাম না।

বাসস্থানে ফিরে এসে দেখি, কেবলই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে বৃদ্ধ জলধর

সেনের মূর্তি। আমার লেখা ছেপেছেন, আমার লেখা চেয়েছেন! এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু এবারে কী লিখি! কোনো কিছুই মাথায় আসে না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হ'লো একটা বিয়ের প্রীতি-উপহার কবিতার কথা। কিছুদিন আগে বহরমপুর কলেজের একটি ছেলে তার বন্ধুর বিয়েতে উপহার দেবার জন্যে আমাকে দিয়ে একটি কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিল। বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনাশৈলীর অনুসরণে একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলাম। দীর্ঘ হ'লেও মনে ছিল পুরো কবিতাটি। মনে হ'লো, এই কবিতার দু'এক জায়গা অদলবদল ক'রে দিলে কেমন হয়? তাই করলাম। উপহারটি ছিল বরকে সম্বোধন ক'রে। সেটি রূপান্তরিত হ'লো বাবুশ্রেণীর তরুণদের প্রতি সম্ভাষণে। কবিতার নামকরণ করলাম—'বাবু-বিলাস'। লেখক—ঐ নিবিড়ানন্দ নকলনবিস। কবিতার প্রথম স্তবকটি এইরূপ—

বাবু গো, কি দিন তোঁহার ভেল আজি।

মরম-মুরজ-মাঝে কত মধু-মূরছনে।
উঠতঁহি কত সুর বাজি।
যাকর দরশন পরশন বেয়াকুল
যাকর হাসটুকু আশে,
শৈশব কৈশোর বই-সনে গোঁয়াওলি
সোহি আওল তুয়া পাশে।
নিত্য নেহারলি নাটক নাভলক
নায়কনায়িকা সঙ্গ
যাকর সনে সখা হরখ পরখ লাগি
কত না রভস-রসরঙ্গ।
সো ধনি সুন্দরী থির বিজলী জনু
আওল তোঁহার সদনে—
নেট্‌-অবগুণ্ঠন- জলদক মাঝারে
গোপত করি বিধু-বদনে।

আগের দিনের মতোই বিকেলবেলায় ঐ কবিতা নিয়ে গেলাম সম্পাদক মহাশয়ের কাছে। এদিন আর কোনো বাধার সম্মুখীন হ'তে হ'লো না।

প্রণাম ক'রে বসতেই জলধর সেন মহাশয় বললেন—"লেখা এনেছো?"

কবিতাটি তাঁর হাতে দিলাম। প'ড়ে একটু হাসলেন। বললেন—"চমৎকার হয়েছে। আমি প্রেসে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাদ্রেই বেরোবে।"

ভাদ্রের ভারতবর্ষেই বেরোলো 'বাবু-বিলাস'।

৬৫

কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে দেখি লালগোলা থেকে লেখা বরদাবাবুর চিঠি। নিমতিতা স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক গৃহী যোগী বরদাচরণ মজুমদার তখন লালগোলা মহেশনারায়ণ অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক। নিমতিতায় থাকা কালে বরদাবাবু আমাদের বিকেলবেলার বৈঠকে প্রত্যহ যোগ দিতেন। চিঠি প'ড়ে দেখি—লালগোলায় বরদাবাবু আমার জন্যে একটি চাকরি যোগাড় করেছেন—লালগোলার পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। আহার, বাসস্থান এবং কিঞ্চিৎ মাসমাহিনার ব্যবস্থা। বরদাবাবুর ইচ্ছা আমি চাকরিটা গ্রহণ করি। গ্রহণ না করার কোনো কারণ নেই। বেকার ব'সে আছি—একটা কাজ পেলে তো বেঁচে যাই। বরদাবাবুকে জানালাম—আমি রাজি আছি এবং তাঁর নির্দেশমতো দু'চারদিনের মধ্যেই রওনা হচ্ছি।

লালগোলায় যাবার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন চলছে। মাসীমাই সব গুছিয়ে-গাছিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি বলে বসলেন—"বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে যা।"

মাসীমার মুখের উপরেই বললাম—"বিয়ে আমি করিনি, আপনি করিয়েছেন। বৌ নিয়ে আপনিই থাকুন।"

এই এক সমস্যায় সঙ্কুল হয়ে উঠলো আমার জীবনযাত্রাপথ। স্ত্রীর সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই, বিরাগ নেই, উপেক্ষা নেই ;—সহযোগও নেই, কারণ প্রয়োজনও নেই। এক এক সময় দুঃখও হয়, সহানুভূতি জাগে। মনে হয়, কেন বিয়ে করতে গেলাম, কেন ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছি একটি নির্দোষ মেয়ের জীবন। রাগ হয় মাসীমার উপর : কেন তিনি আমার পা জড়িয়ে ধরলেন। মাসীমাকেই এই সমস্যা সৃষ্টির জন্যে দায়ী করি। তবু দুশ্চিন্তা দূর হয় না।

লালগোলায় গেলাম। বরদাবাবু আমাকে সরাসরি নিয়ে গিয়ে তুললেন লাইব্রেরিতেই। লাইব্রেরির এক পাশে একটি বড় ঘরে আমার বাসস্থান। আহারের ব্যবস্থা স্কুলের বোর্ডিংএর ভোজনশালায়। অদূরেই বোর্ডিং হাউস।

লাইব্রেরিটি মূলত লালগোলার রাজার। তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরির সঙ্গে

কয়েক হাজার টাকার নতুন বই যুক্ত ক'রে এটিকে সাধারণ পাঠাগারে পরিণত করেছেন। লাইব্রেরি সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্যে শুনলাম, স্থায়ী আমানতরূপে কয়েক হাজার টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছেন।

বইএর আলমারিগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও চোখে পড়লো। বেশ ভালো লাইব্রেরি। পল্লীগ্রামে এ রকম লাইব্রেরি সচরাচর দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় বরদাবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। রাজার নাম যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়। পরে তিনি মহারাজা হয়েছিলেন। রাজা-মহারাজাদের বেশভূষা, চাল-চলন, কথাবার্তা প্রভৃতি বাহ্যিক রূপের চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত ছিল। কিন্তু লালগোলার রাজাকে দেখে বিস্মিত হলাম। এ রাজা, না সন্ন্যাসী? পরনে গেরুয়া, খালি গা, পায়ে খড়ম—ঠিক একটি সন্ন্যাসীর মূর্তি। যেমন নয় পোশাকী দেহ, তেমনি নয় পোশাকী মনও। দৃঢ়কণ্ঠে সাদাসিধে সুস্পষ্ট কথা। তাঁর সৌজন্যে, আন্তরিকতায়, কৃত্রিমতার কিছুমাত্র আভাস পেলাম না। মনে হ'লো, অভিভাবকতুল্য কোনো হিতৈষী আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলছি।

লালগোলা পাঠাগার-পরিচালনার ভার নিয়ে মহারাজের স্নেহলাভের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গ'ড়ে উঠলো মহারাজার পৌত্র কুমার (পরে রাজা) ধীরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে। ধীরেন্দ্রনারায়ণ তখন তরুণ—বাইশ-তেইশ বৎসরের যুবক। চার বৎসর পূর্বে তিনি উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যরসে প্রাণ ভরপুর। এই কাব্যপ্রাণতার জন্যেই তাঁর সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হ'লো। এমন কি সে বন্ধুত্ব রাজপরিবারের সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। পাঠাগার-সংলগ্ন আমার কক্ষটি ধীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর নিজস্ব আসবাবপত্র দিয়ে সজ্জিত ক'রে দিলেন। সেখানে সঙ্গীত আর সাহিত্যচর্চার ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হ'তো। তাঁর শিকারলব্ধ পক্ষীর মাংসের রন্ধন ও ভোজনক্রিয়া চলতো সেই কক্ষটিতে।

সন্ধ্যার পরে বরদাবাবু আসতেন। তাঁর সঙ্গ সাধুসঙ্গ। তিনি যতক্ষণ থাকতেন তাঁর সাধনার কথা, তাঁর সাধনার উপলব্ধির কথা। কোনো কোনো দিন দুজনেই গান করতাম। বরদাবাবু সুকণ্ঠ ছিলেন।

সাধুসন্ন্যাসীর কথা উঠতে বরদাবাবু একদিন আমাকে বললেন—"দক্ষিণখণ্ডে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন। যাবে একদিন তাঁকে দর্শন করতে?"

সাধুর নাম দ্বারকানাথ তপস্বী। দক্ষিণখণ্ডের সাধুবাবা নামে প্রসিদ্ধ। একদিন বরদাবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন সেই সাধুবাবার কাছে। দেখলাম —বরদাবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।

মনের মতো কাজ পেয়েছি, মনের মতো সঙ্গী পেয়েছি—আনন্দে কাটছে লালগোলায় দিনগুলি।

১৯২০ সনের জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে কাগজে একটা খবর বেরোলো —১৯১৯-এর ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার আইনসম্মত হওয়ার ফলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতারা কারামুক্ত হয়ে আন্দামান থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁরা এখন কলকাতাতেই অবস্থান করছেন। খুবই ইচ্ছা হ'লো তাঁদের দেখবার।

মাস দুই পরে দোলের সময় কলকাতায় গেলাম। বহরমপুর কলেজে যখন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় পড়তেন, তখনই তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলাম। শুনেছিলাম—এই সময় সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় এম্. এ. পড়েন ও উপাসনা মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন। মনে হ'লো, সাবিত্রী হয়তো বারীন্দ্রকুমারদের কলকাতার ঠিকানা বলতে পারেন। জানতাম এককালে বিপ্লবীদলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। অনেক চেষ্টার পর খুঁজে পেলাম কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের আস্তানা। তিনি থাকেন ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে একটি মেসে। গেলাম সেখানে। সাবিত্রী আমাকে দেখে খুবই খুশী। আমার কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য শোনামাত্র তিনি বললেন—"আমি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছি। থাকেন ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোডে। চলো, এখুনি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

সাবিত্রীর সঙ্গে গেলাম বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ছোট বাড়ি। দোতলার উপরে উঠে পেলাম বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে। দু'জনকেই প্রণাম করলাম। সাবিত্রী আমার পরিচয় দিলেন তাঁদের কাছে। ক্ষীণদেহ লোকটিকে দেখে মনে হ'লো—ইনিই বারীন্দ্রকুমার!

রোগা মানুষটি, মোটা খাড়া নাক, চোখে পুরু কাচের চশমা। এই চশমার ভিতর দিয়ে যেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখছেন। অথচ তিনি গুরুগম্ভীর নন, কথায় বেশ রসিকতার আভাস।

বারীন্দ্রকুমার আমাকে বললেন—"তুমি লিখতে পারো, গাইতেও পারো? সাবিত্রী তো তাই বললে।"

অবিনাশ ভট্টাচার্য বললেন, "একটা গান শোনাও না ভাই।"

বারীন্দ্রকুমার বললেন, "তোমার নিজের লেখা গান যদি থাকে, তাই গাও।"

নিজেরই গান গাইলাম। গানের গোড়ার দুটি চরণ এইরূপ—

আঘাতের পর আঘাত দিয়ে যন্ত্রটিরে মিলিয়ে নাও।
মিলিয়ে নাও, যন্ত্রী, তোমার আপন সুরে মিলিয়ে নাও॥

গানের পর বারীন্দ্রকুমার বললেন—"গানটি লিখে দাও, আমি 'নারায়ণে' ছাপবো।"

আন্দামান থেকে ফিরে আসার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর 'নারায়ণ' মাসিক পত্রখানির পরিচালন-ভার বারীন্দ্রকুমারকে দিয়েছেন। পরিচালনার জন্যে কিছু অর্থ দিয়েছেন তাঁকে।

আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমারকে আমার বিপ্লবী-জীবনের কথা সংক্ষেপে বললাম। সব শুনে বারীন্দ্রকুমার বললেন—"তুমি এখন কী করছো?"

"লালগোলার রাজার লাইব্রেরিয়ানের কাজ করছি।"

বারীন্দ্রকুমার বললেন—"তুমি রাজার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমাদের দলে ভিড়তে পারবে?"

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম—"বলেন তো এখনই ভিড়ে যাই।"

বারীন্দ্রকুমার বললেন—"শোনো। আমার একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বের করবার ইচ্ছা আছে। টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। মনে হয়, পেয়ে যাবো। টাকা যোগাড় হলেই তোমাকে জানাবো। রাজার চাকরি ছেড়ে দিয়ে চ'লে এসো।"

বারীন্দ্রকুমার ও অবিনাশচন্দ্রের কাছে কিছুক্ষণ আনন্দে কাটিয়ে সাবিত্রী ও আমি ফিরে এলাম সাবিত্রীর মেসে।

৬৬

লালগোলায় ফিরে এসে বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা সকলকেই বললাম, বললাম না কেবল বারীন্দ্রকুমারের প্রস্তাবের কথা।

পরের মাসের 'নারায়ণে' আমার গানটি বেরোল। লাইব্রেরিতে 'নারায়ণ' আসে। দেখে সবাই খুশী। খুশী বরদাবাবুও।

বারীন্দ্রকুমারের কাছ থেকে ডাক এলেই যে আমাকে লালগোলা ছেড়ে কলকাতায় চ'লে যেতে হবে, বারীন্দ্রকুমারদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবো, ভাবলে আনন্দ হয়। আবার সংশয়ও জাগে;—ডাক আসবে তো? খাদ্যো-

তেরো বছর আগেও তো এই বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে ডাক আসার কথা ছিল। কী জানি, এবারে কী হবে। এই সব ভাবনাচিন্তায় দিন কাটে। লাইব্রেরির বাঁধাধরা কাজ ক'রে যাই, ধীরেন্দ্রনারায়ণ এসে দু'এক ঘণ্টা কাটিয়ে যান। সন্ধ্যার পরে প্রত্যহ বরদাবাবুও আসেন।

এমন সময়ে বারীন্দ্রকুমারের চিঠি এল। তিনি লিখেছেন—টাকার আশ্বাস পেয়েছেন তিনি। টাকাটা হাতে এলেই আমাকে জানাবেন। সাপ্তাহিক কাগজটির নামকরণ নিয়ে আলোচনা চলছে। 'আকাশ প্রদীপ' আর 'বিজলী' —এই দুটি নামের একটি নেওয়া হবে। আমি কোন্ নামটি পছন্দ করি—জানতে চেয়েছেন।

এ ছাড়া আরো অনেক কথা লিখেছেন: শ্রীঅরবিন্দের কথা, তাঁদের আদর্শের কথা—ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথা। দীর্ঘ চিঠি। বড় ভালো চিঠি। চিঠিখানা বরদাবাবুকে না দেখিয়ে থাকতে পারলাম না।

সন্ধ্যার সময় বরদাবাবু এলে কলকাতায় বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছিল, সমস্তই জানালাম। বরদাবাবু সব শুনে চমকে উঠলেন। বললেন—"তুমি চ'লে যাবে!"

বললাম—"যাওয়াটা উচিত কি না আপনিই বলুন।"

বরদাবাবু একটু চিন্তা ক'রে বললেন—"যাও তুমি। তোমার জীবনের একটা নতুন দিক খুলে যাচ্ছে। যাবে বৈ কি?"

বরদাবাবুকে বললাম—"আজ বারীন্দ্রকুমারের চিঠি পেয়েছি।"

—ব'লে চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম।

বরদাবাবু বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে চিঠি পড়লেন। বললেন—"বারীন্দ্রকুমারের কথা খবরের কাগজেই পড়েছিলাম, এই চিঠির মধ্যে তাঁকে যেন দেখতে পেলাম। চমৎকার চিঠি। তুমি ভাগ্যবান।"

আমাকে আরো উৎসাহ দিলেন বরদাবাবু। আমি অভিভূত হয়ে শুনলাম। কিছুক্ষণ পরে বরদাবাবু চ'লে গেলেন।

বারীন্দ্রকুমারের এই চিঠির কথা গোপন রাখবার জন্য বরদাবাবুকে অনুরোধ করতে ভুলে গেলাম। ফলে যা হবার তাই হ'লো।

পরদিন দুপুরে ধীরেন্দ্রনারায়ণ এসেই উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি নাকি বারীন ঘোষের চিঠি পেয়েছেন?"

বললাম—"হাঁ।"

লাইব্রেরিতে তিন চার জন লোক ব'সেছিল। বারীন ঘোষের নাম শুনে তারা চমকে উঠলো। বারীন ঘোষের চিঠি তাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ কৌতূহলী হয়ে বললেন—"গোপনীয় চিঠি? আমাদের দেখাবার মতো নয়?"

বললাম—"গোপনীয় না হ'লেও, একজনের চিঠি দশজনকে দেখাবার দরকার কি? আমার পক্ষে গোপনীয় না হ'লেও তাঁর পক্ষে গোপনীয় হতে পারে।"

ক্ষুণ্ণ মনে ধীরেন্দ্রনারায়ণ চ'লে গেলেন। তিনি আমার কাছ থেকে ও-রকম উত্তর আশা করেন নি। লাইব্রেরিতে আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, চিঠির কথা শুনলেও, তাঁরা এ সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

বিকেলের দিকে প্রতিদিনই ধীরেন্দ্রনারায়ণ আসেন। এ-দিনেও আবার এলেন বিকেলবেলায়। আমার ঘরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বললাম—"দুপুরে আরও কয়েকজন লোক ছিল ব'লে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের চিঠিখানি আপনাকে দেখাতে পারিনি। দেখবেন চিঠি?"

চিঠিখানা এনে ধীরেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলাম।

চিঠি প'ড়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণ আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"আপনি চ'লে যাচ্ছেন?"

"আপনি তাই বুঝলেন? কোথায় যাওয়া? চিঠিতে আছে শুধু টাকা পাবার আশ্বাসের কথা। টাকা যদি মেলে, তখন তিনি তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবেন। সেই সময় আমাকে ডাকতে পারেন। আগে টাকার যোগাড় হোক, তারপর যদি বারীন্দ্রকুমার আমাকে ডাকেন, তখন এখান থেকে যাবার কথা চিন্তা করা যাবে।"

কিন্তু বেশি দিন অপেক্ষা করতে হ'লো না। মাসখানেক পরে—মনে হয় জুলাই মাসে আবার বারীন্দ্রকুমারের চিঠি পেলাম। এই চিঠিতে লিখেছেন, "টাকার যোগাড় হয়েছে। কাগজের নামকরণ করলাম—বিজলী। তুমি হবে 'বিজলী'র সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর। 'বিজলী'র সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে তোমার উপর। যথাসম্ভব সত্বর চ'লে এস। আর একটি দরকারী কথা। তুমি কলকাতায় এসে উঠো তোমার কোন বন্ধুবান্ধবের কাছে কিম্বা কোনো আবাসিক হোটেলে। সেই ঠিকানা থেকে তুমি বিজলী বের করতে ইচ্ছুক, এই মর্মে দরখাস্ত করতে হবে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। এখন কাগজ বের

করতে হ'লে সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হয়। পুলিস-রিপোর্ট দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সিকিউরিটি ডিপোজিটের অঙ্ক স্থির করেন। আমাদের সম্পর্ক আছে জানলে, 'বিজলী'র জন্যে সিকিউরিটি বাবদ অনেক টাকা ধার্য করবেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তুমি কলকাতা এসে গোপনে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। দেখা হ'লে অন্যান্য সব খবরই জানতে পারবে।" ইত্যাদি।

এবারে সত্য-সত্যই ডাক এল। নিশ্চিন্ত হলাম।

বরদাবাবু, ধীরেন্দ্রনারায়ণ ও অন্যান্য বন্ধুদের বললাম এই চিঠির কথা। বরদাবাবু খুশী, ধীরেন্দ্রনারায়ণ ক্ষুণ্ণ।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—"কত মাইনে দেবে?"

আমি বললাম—"মাইনের কোনো কথাই হয়নি। যাঁদের কাছে যাচ্ছি, তাঁদের সংসর্গে থাকাটাই আমার কাম্য। টাকার কথা আমি তুলিনি, তুলবোও না।"

ধীরেন্দ্রনারায়ণ আরো ক্ষুণ্ণ হলেন।

এদিকে স্কুলের শিক্ষকেরা ও ছাত্রেরা আমার বিদায়-সম্বর্ধনার আয়োজন করতে লাগলো।

বরদাবাবু আমাকে বললেন, "ভায়া, একবার রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করা উচিত। কাজে যোগ দেবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলে, কাজ ছেড়ে যাবার সময়ও জানিয়ে যাওয়া ভালো।"

"কী বলবো রাজাবাহাদুরকে?"

"চল তো, যা বলবার আমিই বলবো।"

সেবারের মতোই সন্ধ্যাকাল। রাজাবাহাদুরকে প্রণাম ক'রে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—"কী ব্যাপার?"

বরদাবাবু উত্তর দিলেন—"আমাদের এই লাইব্রেরিয়ান কলকাতায় একটা ভালো কাজ পেয়েছেন ব'লে এখান থেকে বিদায় নিতে চান।"

রাজাবাহাদুর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কী কাজ?"

আমার হয়ে উত্তর দিলেন বরদাবাবু। বললেন—"একটি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকের কাজ। এঁর একটু লেখাটেখার অভ্যাস আছে। এই কাজটি নিয়ে কলকাতায় থাকলে, উত্তরোত্তর উন্নতিও হ'তে পারে।"

রাজাবাহাদুর আবার আমার দিকে চেয়ে বললেন—"যত ভালো চাকরিই হোক, এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে যাবেন কেন? বছরখানেক বা ছ'মাসের ছুটি নিয়ে যান। সেখানে কোনো কারণে বনিবনাও না হ'লে আবার এখানে চ'লে আসবেন।"

তাই হ'লো। ছ'মাসের ছুটির দরখাস্ত করলাম, লাইব্রেরির পরিচালক-পরিষদের কাছে। ছুটি মঞ্জুর হ'লো। এক মাস থাকতে হলো লাইব্রেরিতে।

লালগোলার রাজার একটি ছাপাখানা ছিল। সেই ছাপাখানার ম্যানেজার তথা কম্পোজিটর নৃপেন্দ্রনাথ আমার পূর্বপরিচিত। আমি যখন দাদাঠাকুরের পণ্ডিত প্রেসে ছিলাম, নৃপেন তখন সেখানকার কম্পোজিটর। নৃপেন লাইব্রেরি থেকে বই দেয়া-নেয়া করতেন।

আমি চলে যাচ্ছি শুনে নৃপেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এ-কথা সে-কথার পর নৃপেন বললেন—"একটা মজার ব্যাপার আজ ঘটেছে। মজার ব্যাপার বলছি বটে, কিন্তু এই মজার ব্যাপারে আমার চাকরিটিও চ'লে যেতে পারে।"

"কেন, কী হ'লো?"

নৃপেন্দ্রনাথ বেশ গুছিয়ে ব'লে চললেন— "রংপুরের একজন সাহিত্যিকের একখানা বই বিনা খরচায় ছেপে দেবার জন্য রাজাবাহাদুর ভদ্রলোককে কথা দিয়েছিলেন। প্রায় ছ'মাস আগে ভদ্রলোক তাঁর বইএর পাণ্ডুলিপি রাজা-বাহাদুরের কাছে পাঠিয়ে দেন। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে আসে।

"বই ছাপা হবে স্মলপাইকা টাইপে। কিন্তু আমাদের প্রেসে অত স্মলপাইকা টাইপ নেই। রাজাবাহাদুর টাকা মঞ্জুর করলেন। আমি কলকাতায় টাইপের অর্ডার দিয়েছি, কিন্তু টাইপ এখনও আসেনি।

"রাজাবাহাদুর আজ নিজে ছাপাখানায় উপস্থিত। বললেন, রংপুরের সেই বইখানার গ্রন্থকার আমাকে চিঠি লিখে তাগাদা দিয়েছেন প্রুফের জন্যে। তুমি শিগগির তাঁকে প্রুফ পাঠিয়ে দাও। এই নাও তাঁর চিঠি। এতে তাঁর নাম-ঠিকানা আছে। আজকের ডাকেই প্রুফ পাঠিয়ে দিয়ো। দেরি ক'রো না।"

"আমি সবিনয়ে বললাম—প্রায় দেড় মাস হ'তে চললো কলকাতায় স্মল-পাইকা টাইপের অর্ডার দিয়েছি। এখনও টাইপ আসেনি। টাইপটা এলেই কম্পোজ ক'রে প্রুফ পাঠিয়ে দেবো।

"রাজাবাহাদুর আমার কথায় এবার বিরক্ত হয়ে বললেন—স্মলপাইকা না থাকুক, অন্য টাইপ আছে তো। তাই দিয়ে কম্পোজ ক'রে প্রুফ পাঠিয়ে দাও ভদ্রলোকের কাছে। তিনি তো বই চাইছেন না, তিনি চাইছেন প্রুফ। প্রুফের জন্যে তিনি তাগাদা দিয়েছেন। যেমন-তেমন ক'রে প্রুফ পাঠিয়ে দাও, তারপর কলকাতা থেকে স্মলপাইকা টাইপ এলে, তাই দিয়ে বই ছেপো।"

লোকে শুনে হাসলেও নৃপেন সত্যিই বিপন্ন বোধ করছে। আমি নৃপেনকে বললাম—"আপনি বরদাবাবুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন, তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন।"

লালগোলা স্কুলে সন্ধ্যায় সময় আমার বিদায়-সম্বর্ধনা সভা। স্কুলের শিক্ষকেরা ও ছাত্রেরা এসেছেন। এসেছেন কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোকও। অনেকে অনেক কথা বললেন। আমি বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম ব'লে বেশি বলতে পারলাম না। ২।১ মিনিট দুটি চারটি কথা ব'লে ব'সে পড়লাম।

রাত্রির ট্রেনেই রওনা হব। জিনিসপত্র গুছোচ্ছি। জিনিসও সামান্য। একটা ট্রাঙ্ক আর একটা বিছানা।

এমন সময় ধীরেন্দ্রনারায়ণ এসে হাজির আমার ঘরের মধ্যে। ধীরেন্দ্রনারায়ণকে বললাম—"আপনি এসে পড়েছেন, ভালোই হয়েছে। আপনার জিনিসগুলি চাকরকে পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন।"

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রাজি নন। বললেন—"ও সব জিনিস আমি আপনাকে দিয়েছি কি ফিরিয়ে নেবার জন্যে? আপনি ও-সব নিয়ে যান।"

দু'জনে ধস্তাধস্তি—আমিও নেবো না, উনিও দেবেনই। শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হ'লো, তাঁর দেওয়া জিনিসগুলির মধ্যে আমার পছন্দমতো কোনো একটি দ্রব্য স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমি নিয়ে যাবো।

আমি একটি অ্যাশট্রে তুলে নিলাম।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-সংস্কার*

শ্রীনিবিড়ানন্দ নকলবীশ

(১)

বাঙ্গালার সাহিত্যিক-ধুরন্ধরেরা যখন "সতী"র উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন, "বেহুলা"কে ভেলা-সমেত জলে ডুবাইতে উদ্যত, "শান্তি-নিকেতনে" অবিশ্রান্ত লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন স্বর্গের সাহিত্য-রথিগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে নন্দন-কাননের square field-এ একটি সাহিত্য-সভার অধিবেশন হইল; ও তথায় অমরার সাহিত্যিকবৃন্দ বাঙ্গালা-সাহিত্য-সংস্কার সম্বন্ধে কিংকর্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। (বলা বাহুল্য, দেবর্ষি নারদ উক্ত সভায় বীণাবাদন করিয়াছিলেন এবং opening ও closing song গাহিয়া সভার মর্যাদা সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন)। সভায় স্থিরীকৃত হইল যে, স্বর্গবাসী যে-কোন চারিজন সাহিত্য-সেবী বাঙ্গালা-সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা পরিদর্শন করিতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু কে কে আসিবেন, এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, ইন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কেহই সম্মত নহেন। কি জানি কি একটা নিগূঢ় কারণে সকলেই সশঙ্ক। বঙ্কিম ও হেমচন্দ্রের ত বিশেষ আপত্তি। পূর্ববঙ্গের দীন কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের মুখে তাঁরা বাঙ্গালার সংকটাপন্ন অবস্থার কথা সম্যক অবগত হইয়া অবধি বাঙ্গালার নামটি পর্যন্ত মুখে আনেন না।

বিষম গণ্ডগোল: কিছুতেই ইহার মীমাংসা হয় না। অবশেষে মাইকেল lotteryর প্রস্তাব করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন ইহাতেও আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু "ভোটে" তাঁহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। যথাকালে lottery-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। আশ্চর্যের বিষয় নাম উঠিল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন ও দ্বিজেন্দ্রলালের। সভা ভঙ্গ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ত পা চলে-চলে চলে না। আতঙ্কিত ছাত্রের পরীক্ষামন্দিরে প্রথম পাদক্ষেপের মত পা চলে-চলে চলে না; কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, স্খলপদ ব্যক্তি-বিশেষের মত পা চলে-চলে চলে না; 'কালাচাঁদ'-প্রেমোন্মত্ত, ঈষন্মুদ্রিত-নয়ন,

* ১৩২৩ আষাঢ় সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রিকা হইতে লেখক কর্তৃক ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত।

কালিমা-মণ্ডিত-বদন কংকালসারের গঙ্গাস্নান-গমনের মত পা চলে-চলে চলে না। হেমচন্দ্রের temperature 97-এ গিয়া দাঁড়াইল। দ্বিজেন্দ্রলাল ত স্পষ্টই মুখ ফুটিয়া বলিলেন—

একটা ভীষণ বিপদ বিভীষিকার মত হাঁ করে আমাদের অদূর ভবিষ্যতে দাঁড়িয়ে আছে। সে মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ, হিংসার চেয়েও ক্রূর, মড়কের চেয়েও নির্মম। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পার্চ্ছি না, এঁরা আমাদের এই চারজনকে মরু-বাঙ্গালায় পাঠিয়ে কি কাজই বা করাবেন, যে চারজনের ফেরবার আশাও খুব কম। এ যেন একটা উৎপীড়ন, একটা নিষ্পেষণ, একটা অত্যাচার।

দ্বিজেন্দ্রলালের কথাগুলি শুনিয়া হেমচন্দ্রের কথঞ্চিৎ জীবনী-সঞ্চার হইল। তিনি নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—

ধিক্ দীনবন্ধু, ধিক্ হে নবীন,
ধিক্ ইন্দ্রনাথ, হে জ্ঞানপ্রবীণ,
নিজেদের রাখি শান্তি-নিরাপদে,
মোদেরে ঠেলিছ বিষম বিপদে,
ইহা তোমাদের শত্রুতা শুধু।
প্রয়োজন হলে হেলায় মরিব,
কভু না ফিরিব, কারে না ডরিব,
কাপুরুষপ্রায় কুটিল বা ঋজু,
না বাছিব পথ, চল ভাই দ্বিজু,
এস হে বঙ্কিম, ওঠ না মধু?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় মধুসূদন তখন অর্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—

সত্য যা কহিলে বন্ধু, কিন্তু কি কুক্ষণে
হায়, প্রস্তাবিনু হেন, ভবিষ্য না ভাবি
তিল! লটারিয়া যদি ঘটিবে সংকট
হেন, সে প্রমাদ সাধি হানি কি কুঠার
আপনা হইতে কভু আপনার পদে
সুতীক্ষ্ণ? কি করিনু, উঃ, আপনি মজিনু
হায় সবে মজাইনু। হায়রে যেমতি
মজিলা কর্বুরকুল অর্বুদে অর্বুদে
নৈকষেয় অপরাধে একদা অকালে।

কবিবর ভারতচন্দ্র এতক্ষণ এক কোণে বসিয়া তাঁহার সদ্যপ্রসূত "উর্বশী-

সুন্দরী" কাব্যখানিকে কোন্ মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষের শ্রীকরে সমর্পণ করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। বঙ্গদেশ-যাত্রায় আদেশপ্রাপ্ত কবিগণের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে আসিলেন। বলিলেন—

বল ক্রন্দন ভাই কিসের তরে,
চলি যাহ সুখে সব গর্বভরে।
অতি তুচ্ছ ভয়ে ছিছি মূছিত হে,
সব সাহস-বঞ্চিত কুঞ্চিত হে?
জগবন্দন ভারত-নন্দন রে,
ঘন ক্রন্দন, নাহিক স্পন্দন রে!

আরও জনে জনে নানা উৎসাহ-বাণীতে সকলকে বুঝাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বসিয়া-বসিয়া এতক্ষণ শুক্লাম্বরা সর্বসন্তাপ-সংহারিণী শিক্ষকা-ধ্যাপক-ভৎর্সিত-জন-চিত্তবিকারবিনাশিনী সিগারেট-দেবীর সেবায় তন্ময় হইয়াছিলেন। কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি তাঁহার স্বর্গ-সমীর-সঞ্জাত গুম্ফগুচ্ছে লুক্কায়িত থাকিয়া বরেণ্যগণকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছিল।

(২)

যথাকালে তাঁহাদিগকে রওনা করিবার জন্ম মন্দাকিনী-তীরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। আজ আর অমরার বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির কাহারও আসিতে বাকী নাই। এই বিদায় সম্বর্ধনা সভায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমোদনে ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বিদায়কালে জলদ-নির্ঘোষে যাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

সহোদর-চতুষ্টয়! শুধু বাঙ্গালা বলে' নয়, সমগ্র ভারতটাই উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। সাহিত্যে বিষম আবর্জনা জমেছে; সমালোচকরা একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে। আপনারা অতি মহৎ ব্রত নিয়ে বাঙ্গলায় যাচ্ছেন। অনেক কবি আগাছার মত সাহিত্যক্ষেত্রকে ছেয়ে ফেলেছে, আপনারা সে সব বেছে-বেছে বের করবেন। ঢুকবেন মুদিমাল্লার দোকানে; গোলা-গঞ্জ-বাজারে, পাট-তেল-কল-কারখানার কুঠরীতে কুঠরীতে; ঢুকবেন—হাজার বাধা পদদলিত করে গভর্নমেন্ট অফিসের চেম্বারে-চেম্বারে; ঢুকবেন স্কুল-কলেজের মেসে-মেসে, হোস্টেলে-হোস্টেলে। ঢুকে এক-একটা রোদে-পাকা, টেঁসো কবি ও সাহিত্যিক টেনে টেনে বের করবেন। জানবেন—এ শুধু সাহিত্য-সংস্কার নয়, মা ভারতীকে

অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করা। যখন এই মহৎ ব্রত নিয়ে যাচ্ছেন, তখন গৌরবের সঙ্গে এর উদ্‌যাপন করতে হবে। যখন যাচ্ছেন, তখন একটা দাগ রেখে আসবেন।

(৩)

সমগ্র বাঙ্গালাময় হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। স্বর্গের সাহিত্যিক-চতুষ্টয় কলিকাতায়, আসিতেছেন। এই শুভ সমাচার লোকে-লোকে, মুখে-মুখে, তারে-তারে, খামে-খামে, কার্ডে-কার্ডে, দিকে-দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। স্কুলের ছাত্ররা শিক্ষকের বেত্রাঘাতকে তুচ্ছ করিল, কলেজের ছাত্ররা percentageকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিল, অফিসের বাবুরা বিলাতী বিনামার অনুভূতি একেবারে ভুলিয়া গেলেন। স্ব-দেশ-সেবায় যাঁহারা এতদিন মাতোয়ারা ছিলেন, তাঁহারাও এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কেবলমাত্র উকিলেরা কাছারীর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না আর চামারেরা রাস্তার "মোড়ে-মোড়ে" বসিয়া থাকিয়া অধোবদনে পথিকগণের পাদুকার প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

এদিকে ওয়েলিংটন-স্কোয়ারে সভা-মণ্ডপ তৈয়ারী হইতে লাগিল। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহারা মজুর দ্বারা কোনও কার্য করিতে দিতেছে না। নিজেরাই বুকের রক্ত দিয়া, বাহুর শক্তি দিয়া, উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। সভার কর্তৃপক্ষেরও মজুরের খরচ বাঁচিয়া গিয়াছে। কেবল "কাঁচি" মার্কা সিগারেটে যাহা কিছু খরচ হইতেছে মাত্র!

Bengal Literary Society এই উদ্যোগ-আয়োজনের বিশেষ ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। আগামী কল্য সভা। সুতরাং অদ্যই মফঃস্বলের কবিকুল দলে-দলে, পালে-পালে, যূথে-যূথে, কাতারে-কাতারে উপনীত হইলেন। এক-এক জন কবির এক-এক রকম ভাব। কাহারও উদাস-দৃষ্টি ঊর্ধ্বে উত্থিত, কাহারও ললাট চিন্তার প্রাবল্যে ত্রিরেখায় কুঞ্চিত, কেহ-বা চক্ষু দুইটিকে 'উপ-নয়নে' আবৃত রাখিয়া আদি-রসের plot খুঁজিতেছেন ও শিস দিতেছেন। অধিকাংশ কবিরই চাঁচর চিকুর তরঙ্গায়িত। আগামী কল্যকার সভায় পাঠ করিবার জন্য কবিবৃন্দ আপন-আপন কবিতা-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। কবিতা যাহাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তজ্জন্য সকলেই সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিলেন। কালরাত্রি প্রভাত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র সকলে সভামণ্ডপে উপনীত হইলেন। সকলেই ঊর্ধ্বমুখে

হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন। যেই গগন-মণ্ডলে সূর্যদেব প্রথম দেখা দিয়াছেন, তখনই অনেক দূরবীক্ষণ-লগ্নাক্ষ বাবু সোৎসাহে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঐ পুষ্পক রথ।" অমনি অযুত কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্" ও "Hip Hip Hurrah" ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। পুষ্পক-রথখানি যখন সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন উহা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রায় দুই মাইল উত্তরদিকে হেলিতে-দুলিতে আসিতেছে। দেখিবামাত্র সহস্র-সহস্র কবি ও সাহিত্যিক সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া, ছিন্নসূত্র ঘুড়ীর পশ্চাতে বালকবৃন্দের মত, "পুষ্পক" লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। "পুষ্পক" ব্যোমপথে হেলিতে-দুলিতে চলিতে লাগিল এবং কলিকাতায় রাজবর্ত্মে অসংখ্য ব্যক্তি ঊর্ধ্ব শ্বাসে তুরঙ্গ-গতিতে ছুটিতে লাগিল। "পুষ্পক" যখন হেদোর উপর দিয়া বীডন স্কোয়ারের উপরে, বিরাট জনমণ্ডলী তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া কেহ বা বলরাম দে ষ্ট্রীট দিয়া short-cut করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিডন ষ্ট্রীট দিয়া ঘুরপাক খাইতে-খাইতে চলিলেন, কেহ-কেহ সোজা মানিকতলা ষ্ট্রীট দিয়া দৌড়িতে লাগিলেন; পরিশ্রান্ত বৃদ্ধেরা হেদোর ধারেই বসিয়া পড়িলেন।

"পুষ্পক" নিমেষের মধ্যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে উপনীত হইল। স্বর্গবাসী সাহিত্যিক-চতুষ্টয় অবতরণ করিয়া দেখেন যে, সভামণ্ডপ জনশূন্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাকার ব্যাপার সন্দর্শনজনিত একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, হেমচন্দ্র "আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে" বসিয়া পড়িলেন, মধুসূদন "নিশার স্বপন সম" ব্যাপার দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ত স্থাণুর মত নিশ্চল, মৃতের মত নিস্পন্দ, স্তম্ভিতের মত নির্বাক্।

ক্রমশ লোক জুটিতে আরম্ভ করিল। কেহ ট্রামে, কেহ মোটরে, কেহ সাইকেলে ক্রমে-ক্রমে সকলেই আসিলেন। সমাগত সাহিত্যিক-চতুষ্টয়কে নব্য কবিকুল পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন।

(৪)

যথারীতি সভা আরম্ভ হইল। সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অশেষ-মণিমণ্ডিত-হারমধ্যস্থ-কৌস্তভবৎ সভাপতির সিংহাসন সমলংকৃত করিলেন। পুনরায় তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইল। সভাপতির দক্ষিণে হেমচন্দ্র ও মধুসূদন এবং বামে দ্বিজেন্দ্রলাল। সভারম্ভে আমাদের বর্তমান বাঙ্গালার অনেক শ্রেষ্ঠ কবির সাগরেদ রচিত একটি অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইল—

(গান)

কোন্ অচিন দেশের আলোক থেকে
এলে মোদের মাঝখানে।
ভরিয়ে দিলে পরাণ মোদের
কী যে মধুর তানে।
ওগো, কত কালের চেনা,
আজি চুকিয়ে দেব দেনা,
আজি নিবিড় হোয়ে উঠ্ ছে পুলক
আলোক-ছোঁয়া প্রাণে।
কী যে মধুর তানে।
আজি জোয়ার এল সাগর-বুকে,
পাগল হাওয়া বইলো রুখে',
আবেগভরে কইলে কথা
তটের কানে-কানে।
কী যে মধুর তানে।
আজি বিজলীঘন বাদল রাতে,
জাগিয়ে দিলে মূর্ছনাতে,
রাঙিয়ে দিলে অসীম-পটে
কোমল তুলির টানে।
কী যে মধুর তানে।

গান থামিল। চতুর্দিকে করতালি ও আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। যাঁহারা অনুপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের টেলিগ্রাম ও পত্র পঠিত হইল।

এইবার জনৈক উদীয়মান সাহিত্যিক "বাঙ্গালা সাহিত্যের অধোগতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তিনি মহা আস্ফালনপূর্বক ইতস্ততঃ তর্জনী-সঞ্চালন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

Gentlemen,

Bengali আমাদের mother-language, Bengal আমাদের mother-land। কিন্তু কি unfortunate আমরা, আমাদের এই জননী জন্মভূমির প্রতি for a moment দৃক্পাত করিনে। Moreover, Gentlemen, moreover আমরা তাঁর উপর একটা lawless conduct দেখিয়ে আসছি। সহজ কথায় বলতে গেলে, Gentlemen, আমরা যেন murder case-এর

accused হয়ে পড়েছি। সকল পাপের একটা expiation আছে, কিন্তু—কিন্তু Gentlemen, it is too gross an offence to be atoned for. To speak the truth আমাদের এই mother-language-এর প্রতি বড়ই oppression আরম্ভ হয়ে পড়েছে। Sanskrit হাজার হ'লেও আমাদের mother-language নয়, সে কেন Gentlemen, এই পবিত্র মন্দিরে tresspass করবে? মুসলমান ভ্রাতাদেরও mother-language বাঙ্গালা, তাঁরাই বা Persianকে কোন্ law অনুসারে allow করবেন।

হঠাৎ সভাপতি মহাশয় বক্তা মহাশয়কে এক টুকরা কাগজ দিয়া পাঠাইলেন। উহা পাঠ করিয়া তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায়, ক্ষুণ্ণ-মনে স্বস্থানে উপবেশন করিলেন।

এইবার কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন—

বাজ্ রে ভেরী, বাজ্ এই রবে,
পুরিয়াছে ধরা সাহিত্য-গৌরবে,
সবাই শীতল সে মহা সৌরভে
বাঙ্গালা শুধুই পিছিয়ে রয়।
আরবী, পারসী, ইংরাজী, লাতিন,
তারাও প্রধান, তারাও স্বাধীন,
হিব্রু, গুজরাটি, মারাঠি, উড়িয়া,
ফেলেছে জড়তা সুদূরে ছুঁড়িয়া,
বাঙ্গালা শুধুই পিছিয়ে রয়।
ধিক্ বঙ্গবাসী, ধিক বঙ্গকবি,
জাগে না কি প্রাণে অতীতের ছবি,
উদিবে না কি রে সে গৌরব-রবি
সে কি রে অলীক স্বপন-কথা?
ভুলিয়াছে সব চণ্ডীদাস গান,
ঈশ্বরচন্দ্রের নাহি রে সম্মান,
কাশী কৃত্তিবাস হয়েছে অতীত,
মুদি পসারীর দোকান ব্যতীত
কহিতে উপজে হৃদয়ে ব্যথা!
নবীনের কোথা সেই ভীম ভাব,
"কুরুক্ষেত্র" আর "পলাশী" "প্রভাস",

কোথা "অমিতাভ" কোথা "রৈবতক",
গিরিশের কোথা সে মহানাটক
কভু কি ফিরিয়া পাব না আর ?
"দীনবন্ধু"র সে সুললিত ছাঁদ,
সে "নীলদর্পণ" সেই "নিমচাঁদ"
ভাঙিয়াছে যেই সুকঠোর বাঁধ,
তুলনা খুঁজিলে বিরল যার।
"এখন তোরা যে শত কোটি তার"
পাদুকা-পীড়িত যত অফিসার,
পারিস ত খুব কলম পিষিতে,
খাইতে ঔষধ শিশিতে শিশিতে,
হিমাদ্রি অবধি কুমারী হইতে,
বদলী হইয়া চাকরি বহিতে,
বারেক তাহাতে হয় না ভুল।

এমন সময়ে শ্রোতৃবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—shame shame। কেহ বলিলেন—hear hear। বক্তৃতা চলিতে লাগিল—

তেমতি কবিতা ভাবছন্দোযুত,
বিশীর্ণ গোলাম-লেখনী-প্রসূত,
কবির দেহটি ম্যালেরিয়া ভরা,
কবিতায় তাই ঘিরিয়াছে জরা.
কাটিলে শিকড় ফুটে কি ফুল ?
ছিল বটে আগে উপদেশ-ফলে,
হইত কবিরা তৈয়ার সকলে,
কবিতা ব্যাখ্যায় আসিত সদলে
শান্ত শিষ্ট সমালোচকগণ।
"এখন সে দিন নাহিক যে আর",
শিষ্ট মিষ্ট বোলে সাহিত্য-সংস্কার
"হবে না হবে না খোল তরবার",
এসব কবিরা নহে তেমন।

হেমচন্দ্রের বক্তৃতা শেষ হইলে কতিপয় কবি পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

এইবার বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নবীন সেবক বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"খেয়া-ঘাটের ওপার থেকে যে চারজন আমাদের এই ভাঙা-ঘরের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েচেন, তাঁদেরকে আমরা বরণ কোরে তুলে' নিচ্চি। কোনো-কিছু যখন সীমার বাইরে গিয়ে পড়ে, তখনি তাকে অসীমের রাজ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই হয়। তাই, আমাদের ভাষা-মায়ের উপর এই যে অত্যাচার যখন সীমার বাইরে গিয়ে পড়লো, তখন ঈশ্বর পাঠিয়ে দিলেন অসীমের রাজ্য থেকে এই চারজন দেবদূত।

"কবিত্ব সেইখেনে নয়, যেইখেনে কবি শুধু শব্দসাগরের বেলায় বোসে-বোসে উপলখণ্ড সংগ্রহ করচেন। কবিত্ব যখন ঊর্মিমালার ফেনার মুকুট পোরে আমাদের সাম্‌নে এসে হাজির হয়, তখন আমরা কবির বাহাদুরি বুঝতে পারি। এইটে আমাদের দুর্ভাগা দেশের সমালোচকেরা বোঝবার যন্ত্রটার মধ্যে ভালো কোরে ধর্‌তে পারেন না।

"কবিতা হচ্ছে সাহিত্যের এসেন্স। বিলাসকে সন্ন্যাসীর বিভূতির মত গায়ে মেখে যাঁরা জীবন-মরণের যাত্রা-পথে টিকেট কোরে চলেছেন, তাঁরাও ভেতরকার রুমালখানায় দু'ফোঁটা মাখিয়ে নিয়েছেন। এমনি কোরে কবিতা-অপ্সরী গন্ধ ও অনুভূতি বিলিয়ে দিতে দিতে কোন্ অজানা দেশের উদ্দেশে ডানা মেলে চলেছেন। এইটে সকলকে বুঝে নিতেই হবে কবিতা নিয়ে আলোচনা করবার আগেকার মুহূর্তে।

"আমাদের দেশের কবিরা বড়ই নিরীহ, তাই সমালোচকদের অত্যাচার চোক বুঁজে স'য়ে আসচেন। এঁরা তরল খুব, কিন্তু সোডা ওয়াটারের মতো অতুল শক্তি বুকে কোরে এঁদের দেশ-মাতার কোলের বোতলে বোসে আছেন। এঁরা মায়ের কোলে বোসে আছেন, তাই কেয়ার করচেন না নিন্দুকদের এই ব্যবসা-চালানো বুলি। কিন্তু সবারি একটা সীমা আছে; যখন এই স'য়ে-যাওয়াটা সীমা অতিক্রম করচে, তখন এঁরা বেরিয়ে পড়চেন যে দিকে খুশী সেদিক দিয়ে। আর তখনি এঁরা এঁদের শক্তির পরিচয় দিচ্চেন, যখন আঘাত পড়চে এঁদের মাথার উপরে।

"আরেক কথা বল্‌তে হোতো বাংলা ব্যাকরণের অত্যাচার সম্বন্ধে। কিন্তু সভাপতি মহাশয় স্লিপ পাঠিয়ে দিয়েচেন, তাইতে আমি বোস্‌তে বাধ্য হলুম।"

টিফিনের জন্য আপাততঃ সভা বন্ধ হইল। বক্তৃবৃন্দ ও শ্রোতৃবর্গ স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

অপরাহ্ণে স্বল্পক্ষণের জন্য সভার অধিবেশন। কারণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে স্বর্গীয় সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ ছিল। পরিষদ পরিদর্শনের পর তাঁহাদের পানাহারের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা। এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত কয়েকজন সাহিত্যিক ছাড়া বেশি লোককে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার বলেন—"পানাহারের চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কর্তারা। যেমন আহার্য তেমনি পানীয়। পানীয় ছিল দু'রকমের, জলকে ধরিলে তিন রকম।"

* * *

পানাহারে বসিয়াছেন স্বর্গের সাহিত্যিকেরা। মর্ত্যের পানীয় ও আহার্য দেখিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। টেবিলের উপরে একটি হুইস্কির বোতল দেখিয়া মধুসূদনের প্রাণে কাব্যরস নিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি বোতলটির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া বলিলেন—

নমি তব পদাম্বুজে দেবী সুরেশ্বরি,
প্রতীচ্য-প্রদেশ-জাত দ্রাক্ষারসধারা
নিবসে স্ফটিকাধারে। হায় রে যেমতি
মলম্বা অম্বরে তাম্র, কিংবা ইরম্মদ
বিরাজিত জলদের পঞ্জর-পিঞ্জরে
প্রদীপ্ত। স্বাগত অয়ি দেবী সুরেশ্বরি!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেরিত কালিমুদ্দি মিয়া কর্তৃক রন্ধনীকৃত ব্যঞ্জনগুলি টেবিলের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। সকলেই আহার্য বস্তর যথাযথ সদ্ব্যবহার করিয়া পরম পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিতেছেন।

হঠাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রামকমল সিংহ ফোন ধরিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, একখানা বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকের অফিস হইতে একজন বাঙালী সহযোগী সম্পাদক বলিলেন, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন—লালবাজার পুলিস বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকে গ্রেপ্তার করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। ইহাদের বিরুদ্ধে নাকি বহুকাল পূর্ব হইতেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলবৎ ছিল।

সংবাদটি শুনিবামাত্র স্বর্গের সাহিত্যিকেরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তারা তাঁহাদের নিজ নিজ আবাসে পাঠাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন।

গাড়ি প্রস্তুত। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইতস্তত পাদচারণা করিতে করিতে বলিলেন তিনি পরে যাইবেন।

স্বর্গের সাহিত্যিকদের বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার জন্য যাঁহারা পরিষদের অভ্যন্তরে ছিলেন, তাঁহারা তো আসিলেনই, পথচারী লোকেরাও সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি চলিয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ গাড়িতে যান নাই। তাঁহার গন্তব্যস্থানে তাঁহাকে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ ভিড়ের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, বঙ্কিমবাবুর হদিস মিলিল না। পরিষদের সকলেই দুশ্চিন্তায় পড়িলেন : কোথায় গেলেন বঙ্কিমচন্দ্র!

পরদিন সকালবেলায় খবরের কাগজের Stop Press-এ অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদ—"হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গ্রেপ্তার।"

পুলিস সারা শহর তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, প্রতাপ চাটুজ্জের গলির ঘর-ঘর খানাতল্লাসী চালাইয়াছে, নৈহাটিতে গিয়া কাঁঠালপাড়ায় সন্ধান করিয়াছে, কোথাও পাওয়া যায় নাই বঙ্কিমচন্দ্রকে। একখানি সান্ধ্য দৈনিকে এই সব সংবাদ বাহির হইয়াছে। তবু পুলিস চেষ্টা ছাড়ে নাই। গোয়েন্দা বিভাগ বহু ইনফরমার পাড়ায় পাড়ায় নিযুক্ত করিয়াছে।

পরদিন সকালকার সংবাদপত্রে মোটা মোটা বড় বড় হরফে শিরোনামা দিয়া খবর বাহির হইল—"একটি স্ত্রীলোকের কুটিরে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রেপ্তার"।

বিশদ বিবরণে প্রকাশ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অদূরে একটি স্ত্রীলোকের কুটির হইতে স্ত্রীলোকটিসহ বঙ্কিমচন্দ্র গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

যথাবিধি বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল এবং স্ত্রীলোকটিকে চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইল। আসামীদের উপরে অভিযোগ রাজদ্রোহের। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। একজন রাজদ্রোহীকে নিজের ঘরে স্থান দিয়া স্ত্রীলোকটিও আইনের কবলে পড়িয়াছে।

বিচারক প্রথমে হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। এই দুইজনের প্রশ্নোত্তর শেষ হইবার পর স্ত্রীলোকটির জবানবন্দি আরম্ভ হইল।

সরকারী উকিল স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি?"

"প্রসন্ন"।

উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পেশা কি?"

স্ত্রীলোকটিকে নিরুত্তর দেখিয়া উকিল বলিলেন—"তোমার খাওয়া-পরা চলে কি উপায়ে?"

"দুধ-দই বিক্রি ক'রে। আমার গরু আছে।"

উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বঙ্কিম চাটুজ্জেকে ঘরে রেখেছিলে কেন?"

"কে বঙ্কিম চাটুজ্জে?"

উকিল বঙ্কিমবাবুর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া বলিলেন—"ইনিই বঙ্কিম চাটুজ্জে।"

স্ত্রীলোকটি নথনাড়া দিয়া বলিল—"ধুৎ! উনি তো কমলাকান্ত চক্রবর্তী।"

টিফিনের জন্য শুনানি স্থগিত হইল।

(৬)

পরদিন দেখা গেল "পুষ্পকে"র নিকট মাইকেল একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন—

"ছিল আশা ভ্রাতৃগণ, আসিয়া হেথায়
বন্ধুচতুষ্টয় মোরা, সংস্কারিয়া নব
বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্র, সংস্কারিয়া দেশ
চলি যাব মহাসুখে। সাহিত্য-কানন
ধরি শোভা অনুপম সদা উজলিবে
জন্মভূমি, প্রস্ফুটিবে কবিতা-কুসুম
বিতরি সুবাস দেশে; 'গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।
কিন্তু বৃথা আশা! চলি গেলা বন্ধুত্রয়
কোথা কোন অন্ধকারে, হায় রে যেমতি
পড়ি গেলা ক্রৌঞ্চকুল নিষাদের শরে
নিমেষে। শুনিবে যবে স্বর্গবাসী সব,
সান্ত্বনিব কোন ভাবে, হায় রে কেমনে?

"কোথা দ্বিজু, কোথা হেম, কোথায় বঙ্কিম"
সঘনে শুধাবে যবে অমর-নিকর
কি ক'য়ে বুঝাব সবে. হায় রে কি ক'য়ে ?
হা মিত্র, হা বীরশ্রেষ্ঠ, চিরজয়ী রণে,
হা মাতঃ, সাহিত্য-লক্ষ্মী, কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া, দারুণ বিধি, অভাগার ভালে ?"